শেখ আন্দু

(উপন্যাস)

সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত

শ্রীশৈলবালা ঘোষজায়া

আশ্বিন—১৩২৪

মূল্য ১॥০ টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,

"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,"

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
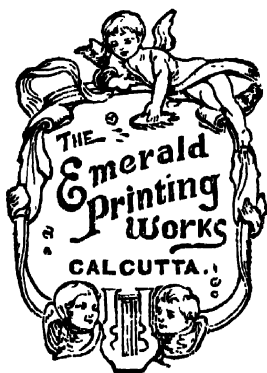
প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ

"এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"

৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা

উপহার

কল্যাণীয় দেবর—

শ্রীমান্ শচীন্দ্রমোহন ঘোষ, বি, এল

সমীপেষু

শুভাকাঙ্ক্ষিণী—

বৌঠান্।
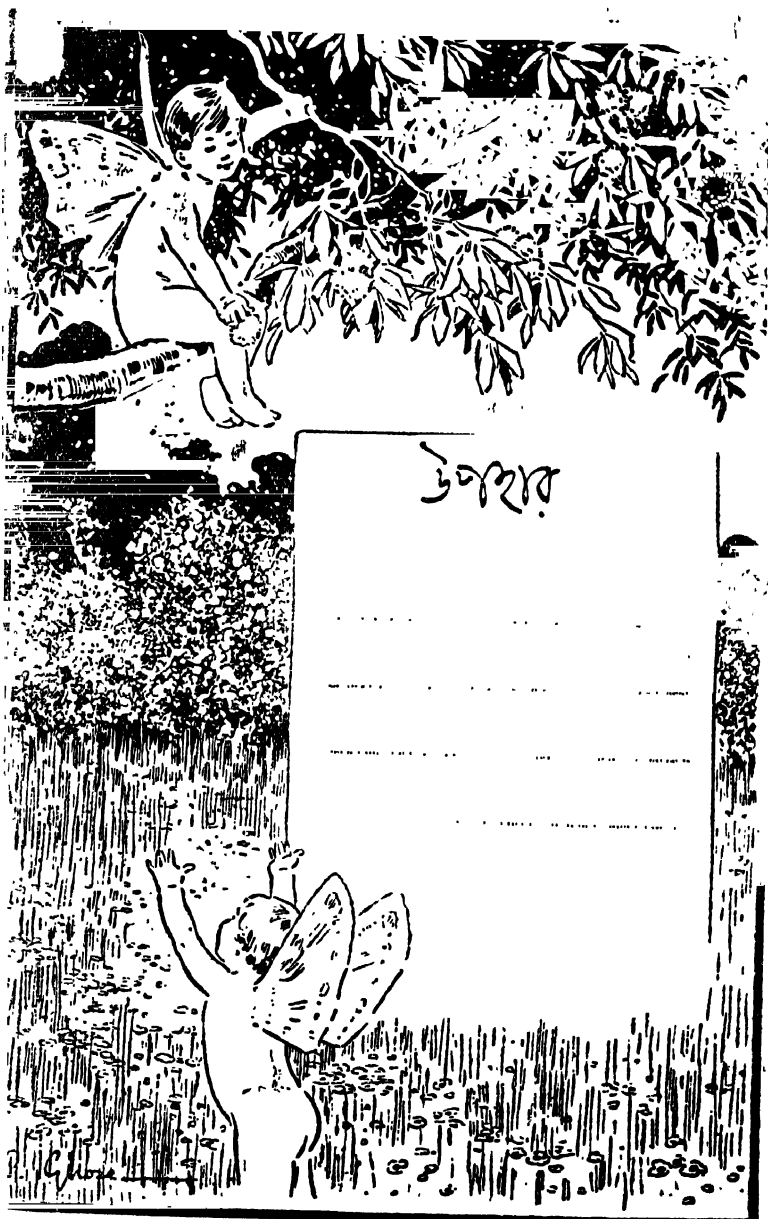
নমো নারায়ণায়

সবিনয় নিবেদন,

১৩২২ সালের প্রবাসীতে শ্রদ্ধেয় প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় "সেথ আন্দু" উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত করিয়া আমার আন্তরিক ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

যাঁহাদের উৎসাহ, সহানুভূতি, এবং যত্নানুকূল্যে আজ "আন্দু" সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে সাধারণে প্রকাশিত হইল, তাঁহাদের মহানুভবতার চরণে কৃতজ্ঞ আনন্দে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা সম্মান জানাইয়া,—জাতীয় উন্নতিকামী, উদারচেতা, হিন্দু-মুসলমান হিতৈষী সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণের হস্তে আমার স্নেহের "আন্দু" সাদরে অর্পণ করিলাম। ইতি

মেমারি, বর্দ্ধমান
১৩২৪, আশ্বিন।

বিনীতা
লেখিকা

সেখ আন্দু
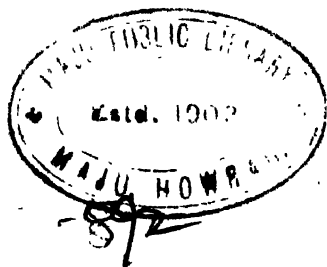
গ্রীষ্মকালের নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর। চারিদিক প্রচণ্ড রৌদ্রতেজে ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। পৃথিবীর বক্ষ ভেদ করিয়া একটা গভীর উত্তাপ ঠেলিয়া উঠিতেছে। চারিদিকের জমাট গ্রীষ্মের গাম্ভীর্য্য যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

ভাগলপুরের উকীল চৌধুরী-সাহেবের ইন্দ্রপুরী-বিনিন্দিত কলরব-মুখর অট্টালিকা এখন সম্পূর্ণ নীরব; গ্রীষ্ম-ক্লিষ্ট লোকজন সকলেই যে-যাহার ঘরে বিশ্রাম করিতেছে দ্বিতলে কর্ম্মনিরতা দুই একজন দাসীর বিরক্তিব্যঞ্জক উচ্চ চীৎকার মাঝে মাঝে শোনা যাইতেছে। পালিত কুকুর-বিড়ালগুলি, সাড়াশব্দ বন্ধ করিয়া, স্থানে স্থানে পড়িয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে।

কুঠীর বামদিকের সীমানায় চাকরদের একতলা গৃহশ্রেণী। চাকরেরা ছুটি পাইয়া সকলেই গৃহদ্বার ঠেসাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। ঘরগুলি সবই উত্তরদ্বারী, কাজেই বারান্দায় রৌদ্র না পড়িলেও ঘরগুলা রৌদ্রতাপে অতিশয় গরম হইয়া উঠিয়াছে।

বারান্দার প্রান্তে টুলের উপর সেলাইয়ের কল রাখিয়া একটা ছোট চৌকীতে বসিয়া গায়ে তোয়ালে জড়াইয়া চৌধুরী-সাহেবের মোটর-গাড়ী-চালক তরুণ যুবা আন্দু মিঞা কতকগুলি কাপড়ে লেশ্ বসাইতেছিল। পাশে বেঞ্চির উপর কয়েকটা লেশের পাকানো বাণ্ডিল ও কতকগুলা নূতন কাপড় ভাঁজ করা রহিয়াছে।

আন্দুর দৈহিক গঠন পৌরুষ-কঠিন,—কিন্তু লালিত্য-বর্জ্জিত নয়। প্রশস্ত ললাটে মমতা শীলতার চিহ্ন ফুটিয়া উঠিতেছে, চক্ষু দুটি নম্র স্নিগ্ধ, বিশাল বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, সর্ব্বশরীর পেশীসবল, পুষ্টসুন্দর, মনোরম লাবণ্যে উদ্ভাসিত।

অবিশ্রাম কলের শব্দের সহিত যুবা একমনে সেলাই করিতেছে। অনেকক্ষণ কাটিল। মধ্যাহ্নের খরতপ্ত বাতাস মাঝে মাঝে আগুনের হল্কা ছড়াইয়া, হু-হু করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কপালের উপর অবিন্যস্ত রেশমের মত কোমল মসৃণ কেশরাশি ঘামে ভিজিয়া উঠিল, টস্‌টস্ করিয়া ঘাম ঝরিল! যুবা তোয়ালে খুলিয়া, সর্ব্ব শরীরের ঘাম মুছিয়া তোয়ালে আবার কাঁধে ফেলিল। গ্রীষ্ম-ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস ছাড়িয়া মাথা তুলিয়া একবার রৌদ্রঝলসিত বহিঃপ্রকৃতির পানে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার সেলাই আরম্ভ করিল।

পাশের দ্বার খুলিয়া সুপ্তিরক্ত চক্ষু মুছিতে মুছিতে অশ্বচালক আকবর আসিয়া পাশের চৌকীতে বসিল। বারংবার চক্ষু মুদিয়া বাহিরের আলোটা চোখে ভাল করিয়া সহাইয়া লইয়া সশব্দে কণ্ঠের শ্লেষ্মা দূর করিয়া বিরক্ত স্বরে বলিল—"ইস্ গরমের চোটে জান জখম্ হয়ে উঠ্‌ছে, এ সময় কলের খ্যাচ্‌খ্যাচানি আওয়াজ!—তোমার এসব ভালও তো লাগে বাপু! উঃ ভারি অসহ্য।"

কলের সূচের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মৃদু হাস্যে আব্দু বলিল, "শুয়ে শুয়ে ছট্‌ফট্ করার চেয়ে একটা কাজে জোড়া থাকা মন্দ কি।"

আকবর সে কথার জবাব না দিয়া বলিল, "এসব হচ্ছে কি ?"

"দরজা জান্‌লার পর্দ্দায় হাতে-বোনা সুতোর লেশ্ বসানো হচ্ছে।"

"বরাৎ কার ? ফরমাস দিলে কে ?"

"খুকুমণি।"

"হুঁ ! তোমার যেমন খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তাই বাজে কাজের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে অনর্থক ভূতের ব্যাগার খেটে মর্‌ছ,—তুমি-সাহেব তাই পার, আমি হ'লে ঠিক্ হাঁকিয়ে দিতুম, সে দাদাই হোক্ আর দিদিই হোক্ !"

আকবরের বীরত্বগর্ব্বিত উক্তির উত্তরে আব্দু কিছু বলিল না, শুধু একটু হাসিল। আব্দু অন্য কথা পাড়িল।

উভয়ে বসিয়া কথা কহিতেছে, এমন সময়ে চৌধুরী-সাহেবের সপ্তদশ-বর্ষীয়া তনয়া লতিকাদেবী বারান্দায় আসিয়া দেখা দিল। লতিকা অবিবাহিতা ; কলিকাতায় বোর্ডিংএ থাকিয়া পড়াশুনা করে, এবারে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়া গ্রীষ্মের ছুটীতে বাড়ী আসিয়াছে।

লতিকার চেহারা মোটের উপর মন্দ নয়। তবে অস্বাভাবিক অহঙ্কারের আবরণে আপাদমস্তক আবৃত থাকায় তাহার রমণী-সুলভ সুকোমল সৌন্দর্য্য-শ্রীর উপর একটা উগ্রতা আসিয়া পড়িয়াছে। লতিকার বেশভূষা পরিচ্ছন্ন মার্জ্জিত, শুভ্র সুন্দর।

লতিকার হাতে একটা ফুটন্ত গোলাপ ফুল ; সেটাকে উঁচু করিয়া ধরিয়া, তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে আসিয়া, তাহাদের ঠিক সম্মুখে দাঁড়াইল। স্থানটা এসেন্সের তীব্র মধুর সৌরভে আমোদিত

হইয়া উঠিল। লতিকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আন্দুর মাথা অনাবশ্যকরূপে খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়া কলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

স্বভাব-সিদ্ধ চঞ্চল কটাক্ষে চারিদিকে চাহিয়া লইয়া লতিকা যথাসাধ্য গম্ভীর মুখে বলিল, "বাঃ! তুমি ত দর্জ্জির কাজ বেশ জান দেখ্‌ছি। এ কলটা কার? তোমার?"

আন্দু বিনীত ভাবে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমার আগে দর্জ্জির দোকান ছিল না?"

"আজ্ঞে আমার বাবার ছিল।"

আকবরের দিকে ফিরিয়া লতিকা বলিল—"আকবর, তোমার ছেলেদের দেশে পাঠিয়েছ অনেকদিন, আর আন না কেন? কেমন আছে তারা সব?"

আকবরের ছেলেদের জন্য লতিকার যে খুব গুরুতর আগ্রহ আছে, তাহার প্রশ্নের ভঙ্গীতে এমন কোন দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। আকবর একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, "তাদের সব অসুখ করেছে।"

"অসুখ করেছে? ওঃ কি অসুখ?"

আকবরের মুখপানে চাহিয়া কথা কয়টি জিজ্ঞাসা করিয়াই তাহার উত্তর শুনিবার অবকাশ হইল না, লতিকা আন্দুর দিকে চাহিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, তুমি দোকান ছাড়্‌লে কেন?"

আন্দু একটু হাসিল, বলিল—"সে নানা কারণে তুলে দিয়েছি।"

"তোমার কলটা বেশ ভাল, সরসী এটা কিন্‌ব বল্‌ছিল। আচ্ছা এ কাপড়গুলো কার? তারি কি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"উঃ কি গরম!" বলিয়া তুইহাতের মধ্যে সজোরে মুখটা ঘসিয়া বাঁ হাতের চুড়িগুলি লতিকা নাড়িয়া দেখিতে লাগিল। সে এবার কলিকাতা হইতে পছন্দ করিয়া রং মিলাইয়া এক হাত কাঁচের সরু সরু চুড়ি পরিয়া আসিয়াছে। চুড়ি দেখিতে দেখিতে মুখ তুলিয়া আকবরকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখনো কল্‌কাতা গিছ্‌লে?"

আকবর বলিল, "না।"

"কল্‌কাতা বেশ জায়গা, ভাগলপুরটা অতি বিচ্ছীরি গরম দেশ।"—কলিকাতার তুলনায় ভাগলপুর অত্যন্ত তুঃসহ হতশ্রী অনুভব করিয়া লতিকা বিরক্ত হইল। অতিশয় অস্থিরভাবে বারান্দার প্রান্তাবধি এক চক্র ঘুরিয়া আসিয়া তাহার পর আবার সেইখানে দাঁড়াইল। প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া কলের কাজ দেখিতে লাগিল।

হাতের ফুলটার পাপ্‌ড়ি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল, "আচ্ছা তুমি কতক্ষণে এগুলো সেলাই কর্ত্তে পার?"

আন্দু আনত দৃষ্টিতে বলিল, "ঘণ্টা দেড়েকের বেশী সময় লাগ্‌বে না বোধ হয়।"

ঠিক এই সময় বিলাতী বুটের মশমশানি শব্দে চারিদিক মুখর হইয়া উঠিল। তুপ্‌-দাপ্‌ শব্দে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া চৌধুরী-সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র কিরণচন্দ্র বারান্দায় উঠিলেন। কলেজে পড়াশুনার কিছু গোলযোগ হওয়ায় সেখানে কিঞ্চিৎ গুঁতা খাইয়া বেচারীর মেজাজ সেদিন নিতান্তই বিগ্‌ড়াইয়া গিয়াছিল। বারান্দায় উঠিয়াই নিশ্চিন্ত উপবিষ্ট আকবরকে দেখিয়া উগ্রস্বরে বলিল, "নবাবসাহেব, নতুন ঘোড়াকে টহল দেওয়া হয়েছে? না বয়ে গেছে?"

কিরণের অকারণ উগ্রতায় আকবরও অকস্মাৎ চটিল; সেও সমান স্বরে গলা চড়াইয়া জবাব দিল—"না।"

আর যায় কোথা! গুঁতার উপর বিষম হুঁচট্! অপমানিত কিরণচন্দ্র রুখিয়া দাঁড়াইয়া আকবরের উদ্দেশে সোজা বাক্যের উৎস খুলিয়া দিল। কলেজের ছাত্র কিরণের যুবক-জীবন যে মলয়ের বাতাস জ্যোৎস্নার আলো আর ফুলের গন্ধে ভরপুর ছিল না, তাহা অনেকে জানিত—সর্ব্বাপেক্ষা ভাল জানিত, চাকরেরা; আজ সে আহতচক্র ভুজঙ্গের ন্যায় তাহার প্রচণ্ড প্রমাণ বর্ষণ করিয়া আকবরকে পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিল—সে যে-সে লোক নহে। রুক্ষস্বভাব পুরাতন চাকর আকবরও চুপ করিয়া সহিবার পাত্র নহে, সেও সুস্পষ্টরূপে জানাইয়া দিল এত রৌদ্রে ঘোড়া ঘুরাইয়া আনা তাহার কর্ম্ম নহে।

কিরণচন্দ্র চাকরদের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দৃষ্টি রাখিত বলিয়া কেহই তাহাকে প্রসন্ন চক্ষে দেখিতে পারিত না। কিন্তু হইলে কি হয়? পিতৃব্যের অনর্থক অপব্যয়, সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র নীরবে দেখে কেমন করিয়া? কাজেই তাহাকে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, না হইলে তাহার কি মাথা-ব্যথা?

মাথা-ব্যথা যাহারই হোক্, আন্দুর কেমন অসহ্য বোধ হইল। উভয়ে বচসা চলিতেছে, মাঝখান হইতে সে কল, কাপড়, কাঁচি, সূচ, সূতা, সব গুটাইয়া তুলিয়া ফেলিল; সংযত স্বরে বলিল, "যান্ বাবু যান্, এত রাগারাগির দরকার কি,—আমি ঘোড়া ঘুরিয়ে আন্‌ছি।"

বাড়ীর সকলেই চাকরদের শ্রেণী হইতে আন্দুকে একটু স্বতন্ত্র চক্ষে দেখিত। কেননা সে লেখাপড়াও জানিত এবং রীতিনীতির জ্ঞানও তাহার যথেষ্ট ছিল। কঠোরপ্রকৃতি ছিদ্রান্বেষী কিরণচন্দ্রও তাহাকে অনেকখানি শ্রদ্ধা করিত। কিন্তু আজ ক্রোধের মুখে গর্জ্জনের মাত্রা সংবরণ করিতে পারিল না, বলিল—"তোমার তো করবার কথা নয়, তুমি কেন ফফরদালালি করতে এসেছ? যে নবাবজাদারা……"

পড়িল, আন্দু মুখ ফুটিয়া ভর্ৎসনা করিলে তাহার বুঝি সে লজ্জা হইত না। সে তাড়াতাড়ি চাবুক দিয়া নীরবে চলিয়া গেল।

কুঠীর সাম্‌নে ময়দানে দাঁড়াইয়া প্রকাণ্ড লাল ঘোড়ার গায়ে মাথা ঘসিয়া তাহাকে একটু আদর করিয়া প্রসন্নমুখে শীস দিতে দিতে আন্দু ঘোড়ার মুখে লাগাম কসিল। তারপর ঘোড়াশালা হইতে নিদ্রিত সহিস রহিম খাঁকে ডাকিয়া জাগাইয়া তুলিল। রহিম বাহিরে আসিলে বলিল, "চাচা, তুমি আর ঘুমিও না, আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ফির্‌ব। সাহেবের আফিস-ঘরখানা ঝাড়্‌তে হবে, হরিহরের শরীর ভাল নেই।"

লাফাইয়া ঘোড়ার অনাবৃত পিঠে চড়িয়া আন্দু ঘোড়া ছুটাইল। সচরাচর আন্দু ঘোড়ার মুখে লাগাম না দিয়া ঘোড়া ছুটাইত। ঘোড়ার ঘাড়ের কেশগুচ্ছ মুঠাইয়া ধরিয়া, কান ধরিয়া লাগামের অভাব সারিয়া লইত। বজ্জাত ঘোড়াকেই শুধু লাগাম কসিত; বিচিত্র কৌশলময় মোটর-কার ও দুরন্ত তেজস্বী অশ্ব, এই দুইটা তাহার জীবনের প্রধান কৌতুকের সামগ্রী ছিল।

রহিম খাঁ আড়ামোড়া দিয়া গা ভাঙ্গিল। এই দুপুর রৌদ্রে ঘোড়া লইয়া বাহির হওয়ায় আন্দুর উপর ভারি বিরক্ত হইল এবং এই বাহাদুরীর ফলে যে ছোকরাটি কোন দিন সর্দ্দিগর্ম্মি হইয়া মারা পড়িবে, সে সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় করিয়া অসন্তুষ্ট রহিম খাঁ বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

আন্দুর জীবনের অতীত অধ্যায়ের কাহিনী একটু বৈচিত্র্যরঞ্জিত, বিস্ময়াবহ। তাহার পিতার ভাগলপুরে একটি মাঝারি রকম দর্জ্জির দোকান ছিল। পিতা সচ্চরিত্র এবং অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু নিষ্ঠাপরায়ণ লোক ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে সবিশেষ শ্রদ্ধা করিত। অতি শৈশবে আন্দুর মাতৃবিয়োগ

হইয়াছিল, কিন্তু তিনি আর দারান্তর গ্রহণ করেন নাই। পুত্রকে তিনি অল্প বয়স হইতে দর্জ্জির কাজ শিখাইতে আরম্ভ করেন। পুত্রের কিন্তু সে কাজে মন বসিল না; লেখাপড়ার উপর তাহার অদম্য কৌতূহল দেখিয়া পুত্রবৎসল পিতা তেরো বছরের পর তাহাকে স্কুলে পাঠাইলেন।

নারীসম্পর্কশূন্য গৃহে, পিতার স্নেহে, পিতার আদর্শে আন্দু ঠিক পিতার মতই শুচিতা-সম্পন্ন, সুকোমলহৃদয় হইয়া উঠিয়াছিল। দরিদ্রের উপর তাহার করুণার সীমা ছিল না, পিতার সহানুভূতিতে তাহার দয়া প্রবৃত্তির যথেষ্ট অনুশীলন করিবার সুযোগও হইত। পিতা তাহার প্রায় কোন কার্য্যেই বাধা দিতেন না। ফলে ন্যায় অন্যায়ের মীমাংসার ভার নিজের উপর পড়ায়, সে বিকৃতবুদ্ধি স্বেচ্ছাচারী না হইয়া দৃঢ়প্রকৃতির স্বাবলম্বীরূপে গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল।

স্কুলে গিয়া, অখণ্ড অধ্যবসায়ী বালক শীঘ্রই প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হইল; তখন পিতা তাহাকে স্কুল ছাড়াইয়া জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতে অনুমতি দিলেন। আন্দুর উৎসুক শিক্ষা-পিপাসা নিবৃত্ত হইল না, সে পিতার অজ্ঞাতে এক অভিজ্ঞ লোকের কাছে আরবী-ফারসী শিখিতে লাগিল। কিছুদিন শিখিয়া সে বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিল। এই সময়ে সাধু সন্ন্যাসী ফকির মহলে তাহার গতায়াত অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। পিতা উদ্বিগ্ন হইয়া ভাবিলেন, পুত্র বুঝি বা দেওয়ানা হয়। কয়েকজন বন্ধুর পরামর্শে তাহাকে স্থানান্তর করিবার উদ্দেশ্যে আগ্রায় একজন বিশিষ্ট লোকের কাছে চিত্রবিদ্যা শিখিতে পাঠাইলেন। কিছুদিন সেখানে চিত্র-বিদ্যায় আন্দুর খুব ঝোঁক দেখা গেল। তাহার পর যেদিন শিক্ষক তাহার প্রশংসা করিয়া বলিলেন, "তুমি সময়ে মস্ত নামজাদা হইবে"—সেই দিন তাহার সমস্ত উৎসাহের স্রোত নিঃশেষিত হইল, যাহা দুষ্প্রাপ্য তাহার

উপরই আন্দুর আগ্রহ,—যাহা অনায়াস-লভ্য, তাহার আর বিশেষত্ব কি? আন্দুর চিত্রবিদ্যা শিক্ষা ঐখানেই শেষ হইল।

এই সময় তাহার পিতা তীর্থ দর্শনে বাহির হইলেন। আন্দুর উপর দোকানের ভার পড়িল; আন্দু ভাগলপুরে আসিয়া দোকান চালাইতে লাগিল। সেই সময় কুস্তির উপর তাহার ঝোঁক পড়িল, সঙ্গে-সঙ্গে গান বাজনাতেও মাতিল। পিতার দোকানের কাজ করিয়া যেটুকু সময় পাইত, ঐ সব চর্চ্চায় কাটাইত। একদিন এক সাহেবের সহিত ঘুসি লড়িয়া তাহাকে চমৎকৃত করিল। সাহেবের সহিত আলাপ হইলে আন্দু তাঁহাকে ধরিয়া মোটর-গাড়ী পরিচালনের কৌশল সব শিখিয়া লইল, সাহেবটি নিজেও একজন গাড়ী-চালক। আন্দুর কার্য্যদক্ষতায় সন্তুষ্ট হইয়া সাহেব কলিকাতায় উচ্চ বেতনে তাহার একটি চাকরী ঠিক করিয়া দিলেন, কিন্তু পিতার দোকান ছাড়িয়া আন্দু কলিকাতায় গেল না।

যথাসময়ে মক্কায় গিয়া তীর্থ দর্শন শেষ করিয়া পিতা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া দেশে ফিরিলেন। পুত্র যথেষ্ট ধার ফের করিয়া, প্রাণপণে পিতার সেবা-শুশ্রূষা করিল। কিন্তু বৃথা, কিছুদিন ভুগিয়া পিতার মৃত্যু হইল।

পিতৃশোক আন্দুর বড় লাগিল। কিছুদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত কাটাইয়া অবশেষে দেনা পরিশোধে মনোযোগী হইল। দোকান বিক্রী করিয়া দেনা শুধিয়া হাতে কিছু টাকা জমিতেই, সে নিশ্চিন্ত হইয়া কলিকাতায় গিয়া মোটরকারের সবিশেষ তত্ত্ব শিক্ষা করিল। উচ্চ বেতনে চাকরীও জুটিল। কিন্তু সেই সময় ভাগলপুরে চৌধুরী-সাহেব নূতন গাড়ী কিনিয়াছেন শুনিয়া, সে কলিকাতার চাকরী ছাড়িয়া এখানে আসিয়া অল্প বেতনে ঢুকিল। তদবধি এইখানেই আছে। সে প্রায় এক বৎসরের কথা।

তাহার পর কার্য্যগুণে সন্তুষ্ট হইয়া চৌধুরী-সাহেব তাহার বেতনও কিছু

বাড়াইয়াছেন। বে-হিসাবী দানবাহুল্যে মাসান্তে তাহার হাতে কিছুই জমিতে পায় না,—দেখিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী চৌধুরী-সাহেব তাহার বেতনের অর্দ্ধাংশ কাটিয়া রাখিতেন। আন্দু এখন পর্য্যন্ত অবিবাহিত, হিতৈষী প্রভুর ইচ্ছা, তাহার কিছু অর্থ জমিলেই, বিবাহ দিয়া গৃহস্থালী পাতাইয়া দিবেন। আন্দু শুনিয়া নীরবে হাসিত।

২

আন্দু ঘোড়া লইয়া ফিরিয়া আসিয়া রহিম খাঁকে ঘোড়া দিল। রহিম ঘোড়া লইয়া আস্তাবলে যাইতে আন্দুও পিছু পিছু গেল। এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিল, "চাচা, আমার দুধটা এসেছে কি?" প্রভুর গৃহ হইতে আন্দুর দেড় সের দুগ্ধ বরাদ্দ ছিল।

রহিম খুঁটায় ঘোড়ার দড়ি পরাইতেছিল, মাথা তুলিয়া মুখ ফিরাইয়া বিরক্ত স্বরে বলিল, "কি?"

আন্দু ক্লিষ্টস্বরে বলিল, "দুধটা এসেছে কি?"

"হাঁ, কারুর চাই নাকি?"

আন্দু অপ্রতিভ হইয়া হাসিল—"গুরুদয়ালের বড় অসুখ—"

"সে ত সবাই জানে। দুধ তাকে দিতে হবে?"

"হাঁ, চুপ কর, একটু আস্তে, কেউ শুনতে পাবে—"

"তোমার তো নিত্যি খয়রাতি কারখানা, বিলুতেই সব যায়, এর আর ঢাকঢাক কি? নিয়ে যাও, ওঘরে কাঁচা দুধ আছে। সবটা চাই?"

"না, তুমি একটু খেয়ো—" বলিয়া আন্দু ঘর হইতে দুগ্ধের পাত্র লইয়া তখনি বাহির হইয়া গেল।

রহিম রাগ করিয়া বলিল, "ঘোড়া টহল দিতে যাওয়া তো নয়, রাজ্যির লোকের খোঁজ নিতে যাওয়া। বাদ্শা-জাদার ব্যাটা, না খেয়েই মর্বে! আরে বাপু, তুই যখন মর্বি, তখন কে তোর খবর নেবে!"

ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা ভাবিবার সময় ছিল না, আন্দু তখন বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত। অল্পক্ষণ পরে শূন্য দুগ্ধপাত্রটি পুকুর হইতে ধুইয়া মুছিয়া আনিয়া রহিমের ঘরে উপুড় করিয়া রাখিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তনের জন্য নিজের ঘরে গেল। আন্দু রহিমের কাছে আহারাদি করিত।

আন্দু নিজের ঘর হইতে গায়ের ঘাম মুছিয়া জামা বদলাইয়া তোয়ালে কাঁধে ফেলিয়া হরিহর খানসামার কাজ করিতে উপরে চলিল। বাহিরের সিঁড়ি দিয়া বৈঠকখানায় যাইতে হয়। অর্দ্ধেক সিঁড়িতে উঠিয়াছে এমন সময় দেখিল, লতিকার সহিত জ্যোৎস্না দেবী সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে। জ্যোৎস্না লতিকার সহাধ্যায়িনী, পিতার বন্ধুকন্যা। জ্যোৎস্নার পিতা হাইকোর্টের উকীল। জ্যোৎস্না লতিকার সহিত ছুটীতে ভাগলপুরে বেড়াইতে আসিয়াছে, শীঘ্রই চলিয়া যাইবে। জ্যোৎস্না লতিকা অপেক্ষা বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট। সে বিবাহিতা। তাহার স্বামী বিবাহের পরই আমেরিকায় ইঞ্জিনীয়ারি শিখিতে গিয়াছে।

তাহাদের দেখিয়া আন্দু সিঁড়ি হইতে নামিয়া নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। লতিকা নামিতে নামিতে হাই তুলিয়া বলিল, "তুমি কি বাবাকে আন্তে যাবে কাছারী থেকে?"

নত দৃষ্টিতে আন্দু বলিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

"এলে গাড়ীখানা ঠিক করে রেখ, আমরা রোদ পড়্লে বেড়াতে যাব।"

"যে আজ্ঞে।"

জ্যোৎস্না মৃদুস্বরে বলিল, "বাগানে যাচ্ছ বটে, কিন্তু যে রোদ, পুড়ে মরতে হবে।"

লতিকা বিদ্রূপের হাসিতে বলিল, "পুড়েই তো মরছ।"

অর্থ বুঝিয়া জ্যোৎস্না ঈষৎ হাসিল। আন্দু সসঙ্কোচে আরো একটু সরিয়া দাঁড়াইল। তরুণীদ্বয় নামিয়া বাগানের দিকে বেড়াইতে গেল। আন্দু হাঁপ ছাড়িয়া, সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া, ঘরে ঢুকিল। প্রসন্ন চিত্তে শীস্ দিতে দিতে ঘরের কাজ আরম্ভ করিল।

ক্ষিপ্র হস্তে ঘর দ্বার টেবিল চেয়ার ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সমস্ত পরিপাটী রূপে সাজাইয়া গুছাইয়া, আলমারির পুস্তকরাশির পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আলস্য ভাঙ্গিল। সমস্ত পৃথিবীর কোন জিনিসের দিকে তাহার দৃষ্টি নাই, তাহার যত লোভ ঐ বইগুলির দিকে; মাঝে মাঝে দুই একখানা বই লইয়া গিয়া লুকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিত, দুরূহ শব্দার্থ অভিধান দেখিয়া বুঝিয়া লইত; বিষয় লইয়া আইনের মারপ্যাঁচ তাহার অত্যন্ত নীরস ঠেকিত, তবু তাহাও পড়িতে ছাড়িত না। যাহা জানে না, তাহাই জানিবার জন্য তাহার দুর্জ্জয় ঝোঁক! সামান্য বিদ্যা হইলেও সেক্স্পীয়ারও তাহার হস্তে পরিত্রাণ পান নাই। সে গভীর রাত্রে দ্বার রুদ্ধ করিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ঐসব করিত। কোন কোন দিন পড়ার ঝোঁকে সারারাত্রি কাটিয়া যাইত; পরদিন তাহার নিদ্রাহীন শুষ্ক ক্লিষ্ট মুখ দেখিয়া কেহ যদি জিজ্ঞাসা করিত, "তোমার কি জ্বর হইয়াছে?" তাহা হইলে আন্দু তৎক্ষণাৎ জবাব দিত, "আজ্ঞে হাঁ, সমস্ত রাত, ভোঁর বেলা ছেড়েছে!"

বইগুলির দিকে চাহিয়া নিজের দুর্ব্বুদ্ধিজাত ছেলেমানুষীর কথা ভাবিতে ভাবিতে আন্দুর হাসি পাইল। তাহার বন্ধুরা তাহার আচরণে বিরক্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিত—"আমাদের পড়ে কি হবে?"—কি যে

হইবে, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে আন্দু আকুল হইয়া উঠিত, অনেকগুলা উত্তর হুড়াহুড়ি করিয়া ঠোঁটের কাছে ঠেলিয়া আসিলে, হঠাৎ সব কটাকে নিরস্ত করিয়া অপরাধীর মত কুণ্ঠিত হাসি হাসিয়া বলিত, "কি যে হয় তা জানি না, ভাল লাগে তাই পড়ি!"

বন্ধুরা মন্তব্য প্রকাশ করিত, "যাকে গাড়ী চালিয়ে খেতে হবে, তার আবার লেখাপড়া কেন?"

আন্দু কোমল ভাবে বলিত, "কি জানি দাদা, মনে করি পড়্‌ব না, কিন্তু ছাড়্‌তে পারি না! ও যেন নেশার মত আমায় পেয়ে বসেছে!"

অনেকে ইহাতেই চুপ করিয়া যাইত, অনেকে বিদ্রূপ ব্যঙ্গ করিত, আন্দু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিত, "আরে চুপ, চুপ, এইবার সব ছেড়ে দেব, আর পড়্‌ব না!"—

নিজের নিষ্ফলা বিদ্যার জন্য, সে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের কাছেই মাথা হেঁট করিয়া থাকিত। দর্জ্জির ছেলে হইয়া কেন সে ঐটুকু লেখাপড়া শিখিয়াছিল! পরিতাপের মধ্যে সন্তোষ টানিয়া সে আপনার মনকে আপনি সান্ত্বনা দিত,—সে ত তোতা-পাখীর মত মুখস্থ কোটেশুন কাটিয়া বিদ্যার প্রাণহীন বড়াই করিতে চায় না, সে ত শুধু চায় পাঁচজন ভাল লোকের কাছে উপদেশ! মনকে একটু উন্নত করিতে! ইহাতে কি খুব বেশী দোষ আছে?

ভাবিতে ভাবিতে বন্ধুদের "কি হয়?" প্রশ্নের একটা নূতন উত্তর আন্দুর মনে সদ্য জন্মলাভ করিল। "কি হয়?" উত্তর "কি হইবে? কিছুই না, অন্ততঃ পৃথিবীর তো কোন অপকার নাই!"

নিজের মনের মধ্যে ঝগড়া-ঝাঁটিতে খানিক সময় অন্যায় ভাবে কাটিল দেখিয়া, আন্দুর অনুতাপ হইল। ঘরের ধূলাগুলা তুলিয়া বাহিরে ঝাঁটাইয়া

ফেলিয়া, সিঁড়ি ঝাঁট দিতে দিতে নীচে নামিয়া আসিল। সমস্ত জঞ্জাল তুলিয়া বাহিরে ফেলিয়া যখন সে মুখ তুলিয়া চাহিল, তখন দেখিল, বাগানে দাঁড়াইয়া তরুণীরা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে। কুণ্ঠিত আন্দু তাড়াতাড়ি ঝাঁটা তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। ঘরে গিয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হাস্যমুখে ভাবিল, হোক, পরের জন্য ঝাঁটা ধরিয়াছে, তাহাতে যাহার খুসি উপহাস করুক, অবজ্ঞা করুক, তাহাতে দুঃখ করিলে চলিবে না! নিজের সখের জন্য অনেকেই 'বার্ডসাই' টানে, কিন্তু পরের সুখের জন্য কেহ কি আগুনে ফুঁ দিতে যায়? এও তাহার নিজের সখের উৎকট আমোদ!

আন্দু মুখ ফুটিয়া হাসিয়া ফেলিল। ঘরে অন্য কেহ ছিল না, থাকিলে তাহার অকারণ হাস্য দেখিয়া কি মনে করিত?

খানিক পরে গা হাত মুছিয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা জুতা পরিয়া সে আবার ঘর হইতে বাহির হইল। মোটর-কার লইয়া বাহির হইয়া, রাজপথে গাড়ী ছুটাইয়া, নিজের পানে চাহিয়া সে হাসিল, এই সেই ঝাড়ুদার আন্দু!

৩

লতিকা নিজের ঘরে আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চুলগুলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গুছাইয়া লইতেছিল। পাশে হেলান কেদারায় লাবণ্যময়ী জ্যোৎস্না শুইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। উভয়েই বেড়াইবার বেশভূষায় সজ্জিতা।

লতিকার রূপরাশি রৌদ্রালোকের ন্যায় তীব্র উজ্জ্বল, জ্যোৎস্নার সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধ পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় মনোরম; লতিকা ঈষৎ খর্ব্ব ও স্থূল, জ্যোৎস্না একহারা অথচ অল্প দীর্ঘাকার; জ্যোৎস্নার মুখভাব রমণীয়

কোমলতাব্যঞ্জক, লতিকার মুখভাব নারী-দুর্লভ দম্ভমণ্ডিত ; জ্যোৎস্না শান্ত, লতিকা চঞ্চলা।

কেশপ্রসাধন সমাধা করিয়া লতিকা ফিরিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের ফুলদানী হইতে মালা-ছড়াটি তুলিয়া হাতে জড়াইতে লাগিল। জ্যোৎস্না কাগজখানা রাখিয়া সহাস্যে বলিল, "স্বয়ম্বরে নাকি ?"

বক্রহাস্যে লতিকা বলিল,—"স্বয়ং আছি, বর কই ?"

দ্বারের পর্দ্দা সরাইয়া পরিমল ঘরে ঢুকিল, "গাড়ী হয়েছে !" পরিমল লতিকার ভ্রাতা। জ্যোৎস্না হাসিল, "রথও তৈরী !"

লতিকা গম্ভীর হইয়া বলিল, "অভাব যা, রথীর !" চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক, তাহাদের রহস্য বিদ্রূপের মর্ম্ম বুঝিল না, পরিমল নিজের জামার সাম্‌নেদিকটা ঝাড়িয়া দিয়া, নিশ্চিন্ত মুখে বলিল—"আন্দু সাহেব রয়েছে" —জামাটা টানিয়া পুনরায় সোজা করিল।

পরিমলের নির্বুদ্ধিতায় জ্যোৎস্না হাসিল। লতিকা সকোপ কটাক্ষে বলিল, "হতভাগা ছেলে !"

জ্যোৎস্না বলিল,—"আহা, গাল দিও না, ও সারথি মনে করেছে। চল, এস।"

গালি খাইয়া পরিমলের রাগ হইল, বলিল,—"আমি যাব না—" জ্যোৎস্না তাহাকে অনেক করিয়া ভুলাইয়া লইয়া চলিল ; সিঁড়িতে নামিতে নামিতে জ্যোৎস্না বলিল,—"সরসী কই ?"

লতিকা পশ্চাৎ হইতে ডাকিল, "খুকি আয়।"

"যাই"—বলিয়া খুকি ওরফে সরসী, একাদশবর্ষীয়া ক্ষীণকায়া সুন্দরী বালিকা এলোচুলে ফিতা বাঁধিয়া, সাদা ফ্রক ইজের পরিয়া, পড়িবার ঘর হইতে ছুটিয়া আসিল। সরসী চৌধুরী-সাহেবের মধ্যমা কন্যা, ভাগল-

পুর ইস্কুলে পড়ে। বেশ শান্ত শিষ্ট মেয়েটি। সরসীর পিছনে পিছনে জামা জুতা পরিয়া টুপী হাতে সমীরণও ছুটিয়া আসিল, সমীরণ চৌধুরী-সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র, সপ্তমবর্ষীয় বালক।

সমীরণকে দেখিয়া লতিকা দাঁড়াইল, বিরক্ত হইয়া বলিল "এই হয়েছে! তুমিও! তোমায় আমি নিয়ে যাব না, যাও ফিরে যাও।"

দিদির ধমকে থতমত খাইয়া সে দাঁড়াইল; দিদিকে সবাই ভয় করিত। সরসীর ইচ্ছা তাহাকে লইয়া যায়, কিন্তু দিদির মুখের উপর প্রতিবাদ করিবার সাহস তাহার ছিল না, সে করুণদৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার পানে চাহিল। জ্যোৎস্না কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বলিল, "আহা আসুক আসুক, জামা জুতো পরে এসেছে।"

লতিকা তাড়না করিয়া বলিল, "আসুক প'রে। এক পাল ছেলে নিয়ে আবার বেড়াতে যায়!"

জ্যোৎস্না সমীরণের হাত ধরিয়া টানিয়া অগ্রসর হইল, মৃদুস্বরে বলিল, "আমরা তো কারো বাড়ীতে যাব না, শুধু গঙ্গার ধারে ধারে একটু বেড়িয়ে আস্‌ব, একে নিয়ে যেতে দোষ কি?"

লতিকা আর কথা কহিল না। সকলে গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। ফটকের সামনে প্রাঙ্গণে, মোটর-গাড়ী রহিয়াছে! গাড়ীর ও-পাশে, মাটিতে জানু পাতিয়া আন্দু একটা লোহার ভারি রেঞ্জ লইয়া গাড়ীর স্ক্রুগুলা কসিয়া, ঠুকিয়া, দেখিয়া লইতেছিল। গাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া মঙ্গল খানসামা গদী ঝাড়িতেছে; এবং বালক চাকর দেবীদীন্, গাড়ীর এপাশে দাঁড়াইয়া চাকার ধূলা ঝাড়িয়া, চাকার রবারে ভ্যাসিলিন ঘসিলে তাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয় কি না, একমনে তাহাই পরীক্ষা করিতেছিল। অদূরে বাবালোকদের আসিতে দেখিয়া মঙ্গল খানসামার মনে সহসা নিজের সততা

প্রচারের সাধু সংকল্প জাগিয়া উঠিল, সে তৎক্ষণাৎ উচ্চকণ্ঠে দেবীদীনের নষ্ট-বুদ্ধি-সম্ভূত ব্যাপারটিতে আব্দুর মনোযোগ আকর্ষণ করিল। দন্তে অধর চাপিয়া, রুদ্ধহাস্যে কৌতুকোজ্জ্বল মুখে আব্দু ঘাড় উঁচাইয়া উঁকি দিয়া দেবীদীন্‌কে দেখিতে গিয়া দেখিল—ছেলেদের লইয়া সৌন্দর্য্যের সাগরে শোভার হিল্লোল তুলিয়া অদূরে ত্রিদিবের জ্বলন্ত রূপের চলন্ত প্রতিমাদ্বয়! আব্দু চট্ করিয়া মাথা নামাইয়া প্যাচ্ কসিতে বসিল, দেবীদীন্‌কে কিছু বলা হইল না।

সকলে গাড়ীতে উঠিল। লতিকা ও পরিমল একদিকে বসিল, অপরদিকে সরসী ও জ্যোৎস্নার স্থান নির্দ্দেশ হইল। সমীরণ গাড়ীতে উঠিতেই লতিকা ঈর্ষিতনেত্রে সরসীর পানে চাহিয়া বলিল, "একে তো বাহাদুরী করে নিয়ে এলে! এবার বসে কোথা?—চলুক দাঁড়িয়ে!"

এ তিরস্কারের প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু জ্যোৎস্নার গায়ে বাজিল। সে তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি ওকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছি।"

আব্দু মাথায় টুপী তুলিয়া গাড়ীতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছিল, ছোট ভাইটির প্রতি লতিকার রূঢ়তা দেখিয়া তাহার বড় অস্বস্তি হইল, একটু রাগও হইল, শিক্ষিতা লতিকার—অন্ততঃ সাংসারিকতা হিসাবে, এটুকু বুঝা উচিত, যে সে বড় হইয়া সামান্য সামান্য কারণে ছোট ভাই বোনদের প্রতি যেরূপ বিদ্বেষ ব্যবহার করিতেছে, উহারাও ইহার পর তাহারই দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইয়া অমনই বিদ্বেষপরায়ণ, নির্ম্মম হইয়া উঠিবে। আব্দু মোটর-কারের চাকায় জুতার ঠোক্কর মারিয়া বলিল,—"ছোট সাহেব, তুমি আমার কাছে এস, জায়গা হবে।"

ছোটসাহেবের পূর্ব্বেই বড়সাহেব লাফাইয়া উঠিল, পরিমল বলিল,—"আমি যাচ্ছি।"

কিন্তু তাহার যাওয়া হইল না। লতিকার ধমকে চঞ্চল বালককে পুনরায় যথাস্থানে বসিতে হইল। সমীরণ আন্দুর ক্রোড়ে উঠিয়া হাওয়া খাইতে চলিল।

৪

পরদিন কিসের উপলক্ষে আদালত বন্ধ থাকায় সকালে আন্দুর ছুটী ছিল। সমস্ত সকালটা এর ওর তার সংবাদ লইতে কাটাইয়া,—ফিরিবার সময় আন্দু বাল্যের সুহৃদ্, বর্ত্তমানের কুস্তির আখ্‌ড়ার ক্রীড়াসঙ্গী, ভবতারণ চাটুজ্যের সংবাদ লইতে গেল, সে কয়দিন কুস্তির আখ্‌ড়ায় যায় নাই। আন্দু বাল্যকাল হইতে তাহাদের বাড়ীতে যায়, সুতরাং একেবারে বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল,—"মা—"

ভবতারণের বর্ষীয়সী বিধবা ভগিনীকে আন্দু "মা" বলিয়া ডাকিত, তাহার কারণ ভবতারণ আন্দুর সহিত 'শ্বশুরজামাই' সম্পর্ক পাতাইয়াছিল। ভবতারণ আন্দুর হৃষ্টপুষ্ট সুগৌর সুঠাম চেহারায় মুগ্ধ হইয়া তাহাকে আদর করিয়া জামাই বলিয়া ডাকিত; ভবতারণের অবশ্য কন্যা নাই, সেও আন্দুরই সমবয়স্ক, এবং সদ্য বিবাহিত মাত্র।

আন্দু 'মা' বলিয়া ডাকিতেই ভবতারণের জ্যেষ্ঠা ভগিনী রান্নাঘরের রোয়াক হইতে উত্তর দিলেন,—"বাবা—"

তিনি তখন বঁটী পাতিয়া কুট্‌না কুটিতেছিলেন, আজ একটু বেলায় রান্না চড়িয়াছে, কেননা ভবতারণের আফিস বন্ধ; ভবতারণ আদালতের একজন ৪৫৲ টাকা বেতনের কেরাণী। ভবতারণ অমায়িক উদার প্রকৃতির যুবা।

আন্দু অগ্রসর হইয়া, দূর হইতে মুষ্টির উপর মাথা নত করিয়া,

মাতৃসম্বোধিতাকে হিন্দুয়ানী-ধরণে প্রণাম করিল। এ ধরণে অভিবাদন সে শুধু এই পরিবারের রমণীদেরই করিত, অন্য কাহাকেও নয়। ভবতারণের বৃদ্ধা জননী রান্নাঘর হইতে হাত ধুইয়া বাহিরে আসিলেন। আন্দু তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি সস্নেহে বলিলেন, "আমি আজই ভাবছিলুম, যে, নাৎজামাই আমার অনেকদিন আসেনি কেন? তারপর, ভাল তো ভাই?"

আন্দু বলিল, "শ্বশুর কোথায় দিদিমা?"

হাসিয়া ভবতারণের দিদি বলিলেন, "তোমার নতুন শ্বাশুড়ী এসেছে যে, শুনেছ?" বলিয়াই ওদিকের বারান্দায় ক্রীড়ারত সপ্তমবর্ষীয় পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে হরু, মামাকে ডেকে দে, আন্দু দাদা এসেছে।"

"হরু এতক্ষণ আন্দুকে দেখে নাই, এখন দেখিয়া উচ্চ চীৎকারে "মামা" বলিয়া ডাক দিয়াই খেলা ছাড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া আন্দুকে জড়াইয়া ধরিল, আন্দু একটু সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "এই যাঃ কাপড় জামা শুদ্ধ ছুঁয়ে ফেল্লে!"

সাম্প্রদায়িক পার্থক্যের অনুরোধে বাহ্য-ব্যবহার-রীতির স্থূল-স্বাতন্ত্র্য বিধানটা যতই নীরস যতই কঠিন হউক,—চরিত্র-মাধুর্য্যে সর্ব্বজনপ্রিয় আন্দু, স্বাভাবিক সরল-সৌহৃদ্যে সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিয়া বেশ বুঝিয়াছিল,—ঐ ব্যবধানের বিধানটা নিতান্তই বহিঃসীমাবদ্ধ বাহিরের লৌকিক ব্যাপার মাত্র! মানুষের অন্তরে পবিত্র নির্ম্মল অন্তরঙ্গতার অসীম মিলন ক্ষেত্রে,—প্রাণবন্ত মানুষের প্রাণ-শক্তির গতি চির অপ্রতিহত! অন্ধ পার্থক্যের 'গোঁড়ামী'ই মানুষকে মর্ম্ম-পীড়িত করে। কিন্তু জগতে, মানুষের সহিত মানুষের যে নিত্য-সত্য সহজ সম্বন্ধটা আছে তাহা যদি অবিকৃত ঔজ্জ্বল্যে মানুষের মনে জাগিয়া থাকে, তবে বাহিরের এই সামান্য

ব্যাপার লইয়া মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিবার কি প্রয়োজন? কি আসে যায় উহাতে? লৌকিক সংস্কারের মূল্য থাক না থাক, যিনি রুচি পূর্ব্বক তাহা পালন করিতে চাহেন, সহৃদয় আন্দু তাঁহার সহায়তায় কার্পণ্য করিতে চাহে না। কেননা, স্থান, কাল, পাত্র, ভেদে এই ক্ষুদ্র কার্পণ্যই একটা বৃহৎ বিরোধের স্রষ্টা হইয়া দাঁড়ায়! অন্ধ বিশ্বাসে দৃপ্ত-আঘাত বাজিলেই উদ্ধত উত্তেজনা জাগিয়া উঠে, সঙ্কীর্ণতা—সঙ্কীর্ণতম হইয়া উঠে! অন্তরের উন্নত ঔদার্য্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, আন্দু নীরব সহানুভূতিতে তাই হাসিমুখে বিরোধ এড়াইয়া চলিত। দুর্ব্বল অসহিষ্ণুতায়,—রুক্ষ ঔদ্ধত্যে মানুষের অন্তরে আঘাত করিতে সে বেদনা বোধ করিত। এই উদার সহৃদয়তা গুণেই,—শুধু এই পরিবারের নয়, আরও অনেক নিঃসম্পর্কীয় নরনারীর নিকট অবাধ আত্মীয়তায় সে স্নেহের সন্তান, আদরের ভাই, অন্তরঙ্গ—বিশ্বস্ত সুহৃদ্ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আন্দুর কথায় হরুর জননী বাৎসল্য-স্মিত নয়নে আন্দুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "তা হোক বাবা, ব্যস্ত হোয়ো না, ও কাপড় জামা ছাড়্‌বে এখন।"

হাসিতে হাসিতে ভবতারণ গৃহ হইতে বাহির হইল। ভগিনীকে লক্ষ্য করিয়া অনুযোগের স্বরে বলিল, "যা হোক 'মা' বটে! ছেলেটি রৌদ্রে টিটুচ্ছে আর মা দিব্বি বঁটীতে বসে আছেন!"

ভবতারণের দিদি কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আন্দু মুখ ফিরাইয়া জবাব দিল, "মার কাছে আবার ছেলের আসন কি?"—সে হরুকে পৃষ্ঠে তুলিয়া লইল।

ভ্রাতাকে লক্ষ্য করিয়া ভবতারণের দিদি বলিলেন, "তোর যে জামাই এসে উঠোনে দাঁড়িয়ে রইল, তুই ঘরে ছিলি কোন হিসেবে?"

অপ্রতিভ ভবতারণ যুক্তিসঙ্গত হিসাব খুঁজিয়া যথারীতি দাখিল

করিবার পূর্ব্বেই, আন্দু তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "বউমা কি সত্যি এসেছেন ?"

ভবতারণের জননী বলিলেন, "হাঁ এই কদিন হ'ল এনেছি, যারে ভব, বাছাকে বসাগে যা।"

হরু দেখিল, বেওয়ারিশ আন্দু দাদার উপর যথেচ্ছ ভোগ দখলের ক্ষমতাটা মাতুল এবার নিঃশেষে বাজেয়াপ্ত করিলেন। অতএব—বুদ্ধিমান্ বালক আন্দুর পিঠের উপর হইতে নিঃশব্দে নামিয়া সঙ্গীর সহিত খেলা করিতে ছুটিল। ভবতারণ আন্দুর পিঠ ঠুকিয়া নানা কথা কহিতে কহিতে, শয়ন গৃহের দাওয়ায় আসিল। ঘর হইতে তুইটি বেতের মোড়া বাহির করিয়া, আন্দুকে একটায় বসাইল, তারপর নিজে পান আনিতে ঘরে ঢুকিল। আন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "বউমা কি এই ঘরে আছেন ?"

ভবতারণ গৃহমধ্য হইতে উত্তর দিল, "হাঁ, শাশুড়ীকে কুর্নিশ কর্‌বে না কি ?"

আন্দু হাসিল, বলিল, "না, আমার পৈত্রিক বাসস্থান চব্বিশ পরগণা, আমি চব্বিশ পরগণার লোকেদের প্রণাম কর্‌তে জানি,—" আন্দু চৌকাঠের উপর মুষ্টি রাখিয়া তাহাতে মাথা ঠেকাইল।

ভবতারণ গৃহমধ্য হইতে বলিল, "তোমার শাশুড়ী জিজ্ঞাসা কচ্ছে, কি ব'লে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌ব ? বিয়ে হয়েছে কি ?"

আন্দু বলিল, "না মা, বিয়েটুকু বাদ দিয়ে যা খুসী তাই ব'লে আশীর্ব্বাদ করুন।"

ভবতারণ বলিল, "আশীর্ব্বাদ কচ্ছে, তুমি বুদ্ধিমান্, জ্ঞানবান্, চরিত্রবান্ 'মানুষ' হও,—"

আন্দু পুনরায় নত হইয়া বলিল, "মার আশীর্ব্বাদ সফল হোক্।"

ভবতারণ পান লইয়া হাসিতে হাসিতে বাহিরে আসিল, বলিল, "শাশুড়ী জামাইকে প্রতিনমস্কার কচ্ছে, কিছু আশীর্ব্বাদ কর—"বল সাধা সুরে বাঁধা বোল,—চুপ কেন, বল—ছেলে হোক্।"

আন্দু বলিল, "হাঁ ঐ আশীর্ব্বাদই মেয়েদের শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ। কিন্তু এখন নয়, ওঁর বয়স কত ?"

"চৌদ্দ।"

"তবে আমি এরই মধ্যে ছেলে হবার আহাম্মুখী আশীর্ব্বাদ কর্‌ব না। ছেলেমানুষের ছেলে! সে আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ!—আমি ভগবানের নামে প্রার্থনা কর্‌ছি নিজেরা আগে 'মানুষ' হোন্,—ছেলেকে আগে 'মানুষ' কর্‌বার ক্ষমতা হোক্, তার পর যেন হয়, আরো বছর পাঁচ ছয় পরে।"

ভবতারণ প্রীত মুখে তাহার পিঠ ঠুকিয়া বলিল, "ঠিক্ কথা! বুদ্ধিমান্ জামাই বটে"—তাহার পর সহসা বলিল, "ভাল কথা মনে পড়েছে আন্দু, সেদিন আখ্‌ড়ায় শুন্‌ছিলুম, তুমি নাকি পল্টনে ঢোক্‌বার চেষ্টা-চরিত্র কর্‌ছ ?—"

আন্দু অপ্রভিত হইয়া হাসিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া মৃদুস্বরে সুধাইল, "কাজটা কি মন্দ ?—"

উৎসাহিত ভাবে ভবতারণ বলিল, "খুব ভাল, পল্টনের কাজ!—সাহসের চর্চ্চা, শক্তির চর্চ্চা, উদ্যমের চর্চ্চা!—বেশ কর্‌ছ তুমি চেষ্টা কর,—তোমার কাজে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। জীবনের সঙ্গে মরণের ঝগড়া বরাবরই চল্‌ছে।—যুদ্ধ!—সে না হয় জীয়ন্ত মরণের সঙ্গে লড়াই;—কিন্তু তাতে কতখানি তেজস্বিতা, কতখানি নির্ভীকতার উদ্বোধন, সেটাও ভেবে দেখা উচিত; শুধু মরণের ভয়ে সমস্ত জীবনটা কাবু করে রাখা ঠিক নয়।"

উত্তেজনার আবেগে ভবতারণের কণ্ঠস্বর ক্রমে উচ্চে উঠিতেছিল, আন্দু মৃদু হাস্যে বলিল, “একটু আস্তে—মায়েরা ওখানে রয়েছেন—”

ভবতারণ হাসিয়া বলিল, “মিছে নয়। ওঁরা শুন্‌লে এখনি পা ছড়িয়ে কাঁদ্‌তে বস্‌বেন। দেখ্‌বে একটু রগড় কর্‌ব?” ভবতারণ উঠিতেছিল, আন্দু অসহিষ্ণুভাবে তাহার হাত ধরিয়া বসাইল, বলিল, “আঃ কি কর, মেয়েমহলে বীরত্ব ফলিয়ে ছেলেমানুষী কর্‌তে হবে না।”

ভবতারণ সহাস্যে বলিল, “ঐ দেখ, বাঙ্গালীর ছেলে জাতীয় পৌরুষ কি ভুল্‌তে পারি, অভ্যাসের দোষে মুখের আস্ফালনটা মেয়েমহলেই বেশী রাষ্ট্র কর্ত্তে ইচ্ছে হয়!”

আন্দু মৃদুস্বরে বলিল, “পুরুষত্বের সাধনা চাই, মন্দ অভ্যাস জয় কর্‌তে হবে।”

ভবতারণ বলিল, “এ কর, ও কর, তা কর, বল্‌বার লোক ঢের পাচ্ছি, কিন্তু কর্‌বার শক্তি যে খুঁজে পাচ্ছি না।”

ভবতারণ ক্রীড়াচ্ছলে আন্দুর হাতে হাত দিয়া প্যাঁচ লড়িতে লাগিল। কিছু বলিল না। আন্দু উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিল, “আচ্ছা ভাল কথা, আমাদের আখ্‌ড়ায় একটু গোলমাল চল্‌ছে, আখ্‌ড়ার নামে একটা বদ্‌নাম উঠেছে, শুনেছ?”

ভবতারণ বলিল, “সে ত শুন্‌লুম, ঐ লক্ষ্মীছাড়া লছ্‌মী ভকতকে নিয়ে যত গোল বেঁধেছে,—”

আন্দু ক্ষণেক নীরবে রহিল, তাহার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিতভাবে বলিল, “এঃ! ছি ছি ছি! লছমী ভকত, আমাদের চেয়ে ছেলেমানুষ, বেচারী এই বয়সে এমন করে উচ্ছন্ন গেল, ভারি আপশোষের কথা। সত্যি কথা বল্‌ছি, তার ছেলেমানুষী রঙ্গ দেখে আমি তার ওপর এত খুসী

ছিলুম, যে, বল্‌তে পারি না, আমি নিজের ভাইয়ের মত তাকে ভালবাসতুম। আহা, হতভাগা এমন করে বয়ে গেল!"

ভবতারণ বলিল, "বাপের পয়সা আছে, বড়লোকের ছেলে—"

সকাতরভাবে আন্দু বলিল, "আহা ও যদি লেখা পড়া শিখে সচ্চরিত্র হ'ত, তা হ'লে কত উপকারে লাগ্‌ত! ওকে নষ্ট হ'তে দেওয়া হবে না।—"

"ওকে শোধরায় কার সাধ্য?"

"কেন, তোমার, আমার। তোমাকেই এই ভারটি নিতে হবে।"

ভবতারণ বলিল, "ওসব আমার চেয়ে তোমার মাথায় কিন্তু পরিষ্কার খেলে আন্দু, ওসব বিষয়ের ভার তুমি নাও।"

আন্দু হাসিল, "আমি যে অস্থিত-পঞ্চানন, ভাগলপুরের অন্নজল যে কোন্ মুহূর্ত্তে আমার ফুরিয়ে যাবে, তার ত ঠিক নেই। অবশ্য যতদিন থাক্‌ব ততদিন তোমার উপলক্ষ আছি, কিন্তু তার পরে—"

ভবতারণ বিস্ফারিত চক্ষে আন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা আন্দু, সত্যি বল ত তোমার জীবনের লক্ষ্যটা কি?"

"আমার জীবনের লক্ষ্য!"—শান্তভাবে হাসিয়া আন্দু বলিল, "আমার জীবনের লক্ষ্য?—সকলের সঙ্গে আমার জীবন জড়িয়ে রয়েছে, সকলের শুভ ভিন্ন আমার শুভ নাই, এই মোটা ধারণাটা মনের মধ্যে পুষে ভগবানের নাম নিয়ে সকল ভাল চেষ্টায় হাত দেবো, তার পর ঈশ্বরের ইচ্ছা!"

ভবতারণ হাসিয়া বলিল, "গাড়ী চালান, গুলি চালান, তোমার চোখে একই কথা,—আচ্ছা একটা ছেড়ে আর একটায় ঝুঁক্‌ছ কেন তবে?"

"দুটি মত্‌লবে। গুলির নামে সকলেরই একটা গুরুতর আতঙ্ক আছে, অনেকে ইচ্ছা সত্ত্বেও তাই এ কাজে এগুতে পারে না। আমার

কেউ কোথাও নাই, কাজেই নির্ভাবনা, সুতরাং গুলিটা ঠিক আমারই উপযুক্ত—" একটু হাসিয়া বলিল, "আর এক-কথা,—আমার চাকরীটার একটী বেকার উমেদার জুটেছে, সে এখানকারই বাসিন্দা, মা আছে, স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, সুতরাং এইখানেই একটি কাজ পেলে তার ভারি উপকার হয়, তাই খস্‌বার চেষ্টায় আছি।"

"কে লোকটা ?"

"আখ্‌ড়ার পিয়ারী সাহেব।"

"তোমার মুনীব তোমায় ছাড়্‌বেন ?"

"না ছাড়েন, নিজেই খস্‌ব।"

ভবতারণ চুপ। স্থির দৃষ্টিতে মুগ্ধ নয়নে আন্দুর গর্ব্বলেশশূন্য সরল হাস্যস্মিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, "আমি তবে আসি, অনেক বেলা হয়েছে,—" আন্দু স্ত্রীলোকদের পুনরায় প্রণাম করিয়া বিদায় লইল। ভবতারণ দ্বার পর্য্যন্ত আসিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিল, ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "আন্দু, তুমি চলে যাবে শুনে মনটা ভারি দমে গেল।"

আন্দু কোমল হাস্যে বলিল, "ভালবাসা কি চোখে ? ভালবাসা প্রাণে।"

রাস্তায় নামিয়া চাদরে মাথা ঢাকিয়া, রৌদ্রে ঝলসিত দ্বিপ্রহরের পথ অতিবাহন করিতে করিতে আন্দু মনের আনন্দে গান ধরিল,—

"নয়নের নেশা নহে ভালবাসা—"

৫

কলহপীড়াক্রান্ত ব্যক্তির স্বভাব, সে বাহিরে কাহারো সহিত কলহের কোন উপকরণ খুঁজিয়া একান্ত না পাইলে বাতাসকে ধরিয়া ছিদ্র খুঁজিয়া দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয়; কেহ শুনুক না শুনুক, ব্যাধি বিকারের তাড়নায়, তাহাকে অন্ততঃ ঐটুকু করিতেই হইবে, না হইলে নিস্তার নাই। আমাদের জীবনের অতৃপ্তি-রাগিণীর সুরও সেই ভাবে বাঁধা। তাহার সহস্র সুখেও শান্তি নাই, সহস্র সৌভাগ্যেও স্বস্তি নাই,—তাহার জগতে সবই আছে, নাই শুধু সন্তোষ!

বিকালে চৌধুরী-সাহেব নিজের বসিবার ঘরে চটি-পায়ে ইজের পরিয়া গ্রীষ্মাধিক্য-হেতু অনাবৃত দেহে কৌচে বসিয়া নথী দেখিতেছিলেন। পিছনে দাঁড়াইয়া একজন খানসামা হাতপাখায় বাতাস করিতেছিল। এমন সময় লতিকার পশ্চাতে জ্যোৎস্না আসিয়া ঘরে ঢুকিল। বৈকালিক ডাক বিলি হইয়া গিয়াছিল, উভয়েই চিঠির তদন্তে আসিয়াছে।

সোনার চশমার ভিতর হইতে চক্ষু তুলিয়া উভয়কে দেখিয়া চৌধুরী-সাহেব নথীটা পাশে রাখিয়া কৌচে কনুইয়ের ভর দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, সাদরে বলিলেন, "এস মা এস, কেমন আছ? কোন কষ্ট হয় নি ত?—" লতিকার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "কই মা, তোমরা আজ বেড়াতে যাওনি?"

লতিকা অপ্রসন্ন মুখে সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল,—"না।"

চৌধুরী-সাহেব পাশের বেতের চেয়ারটা টানিয়া জ্যোৎস্নাকে ব্যগ্র-ভাবে বলিলেন, "বস মা বস,—" খানসামাকে বলিলেন, "ওরে ওটা থাক্, বড় পাখাটা টান।"

পাখা চলিতে লাগিল, জ্যোৎস্না নম্রভাবে আসন গ্রহণ করিল। লতিকা নিতান্ত উদাসীন ভাবে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া দাঁতে আঙ্গুল কাম্‌ড়াইতে লাগিল। সরল-হৃদয় নিয়তকর্ম্মচিন্তাশীল চৌধুরী-সাহেব, তাহার সে ভাব-বৈলক্ষণ্য বুঝিতে পারিলেন না, আপন মনে এদিক ওদিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। লতিকা কথা কহিল না, জ্যোৎস্না মৃদুভাবে উত্তর প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। হঠাৎ অন্য কথার মাঝখানে লতিকা অসহিষ্ণুভাবে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবা আমাদের চিঠিপত্র কিছু এসেছে ?"

চৌধুরী-সাহেব হঠাৎ বিস্মৃতি-স্মরণে, প্রৌঢ়ত্ব-কুঞ্চিত ললাটে চক্ষু তুলিয়া মাথা উঁচাইয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "হাঁ হাঁ, তোমাদের খানকতক চিঠি আছে, ভুলে গেছি, টেবিলে আছে, নাও,—জ্যোৎস্নাকে বলিলেন, "তোমার দাদাবাবুর চিঠি পেলুম মা, তিনি দিন চার পাঁচ পরে মুঙ্গেরে আস্‌বেন, সেখান থেকে তোমায় নিতে এখানে আস্‌বেন লিখেছেন—তোমারও চিঠি আছে দেখে নাও।"

চৌধুরী-সাহেব নথীখানা আবার তুলিয়া দেখিতে লাগিলেন। জ্যোৎস্না টেবিলের কাছে আসিয়া দেখিল তাহার পিতার পত্র ; তিনি দাদাবাবু অর্থাৎ জ্যোৎস্নার মাতামহের সহিত তাহাকে কলিকাতায় যাইতে আদেশ করিয়াছেন, এবং বন্ধুপরিবারের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। লতিকাকে তাহার দুইজন শিক্ষয়িত্রী দুইখানা পোষ্টকার্ডে সংক্ষিপ্ত মঙ্গলাশীষ প্রেরণ করিয়াছেন, এবং আর-একখানা রঙীন্ পুরু খাম বোম্বের ছাপ দেওয়া তাহার নামে আসিয়াছে, সেখানা লতিকা মুঠায় পূরিল। সেখানা লতিকার ভাবী পতি ডাঃ চক্রবর্ত্তীর পত্র। চক্রবর্ত্তী এম্, বি, পাশ করিয়া বোম্বের মেডিকেল কলেজে এম, ডি, পড়িতেছেন। এই

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেই তিনি বিবাহ করিয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হইবেন। দুঃখের বিষয় দুইবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হওয়ায় চৌধুরী সাহেবের আদেশে পুনরায় পরীক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু পরীক্ষার অপেক্ষা পত্র লেখার উৎসাহ তাঁহার এতই গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে, যে, পরীক্ষায় কৃতকার্য্যতার আশা অভিজ্ঞগণের মনে সুদূরপরাহত বলিয়া বোধ হয়। চিকিৎসক শরীরতত্ত্ব অপেক্ষা মনস্তত্ত্বে বিশেষ মনোযোগী হইলে তাহা যে নিতান্তই দুর্লক্ষণ এবং তাহা যে মোটেই কল্যাণকর নহে, এ কথা অনেকে তাঁহাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তাহার কারণ অভিভাবক তাঁহার খরচ যেরূপেই হউক নিয়মিত জুটাইতেন, এবং তিনিও সময় এবং অর্থ, এ দুটির অযথা অপব্যয়ে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত ছিলেন না। অভাব যে মানুষের শুধু অবনতি করে, তাহা নহে, উন্নতিও করে।

নিজের চিঠি লইয়া জ্যোৎস্না গৃহত্যাগ করিল। কারণ চিঠিখানির উত্তর এখনই লিখিতে হইবে। লতিকাও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তিনী হইতেছিল, গোপনে নির্জ্জনে বোম্বের চিঠিখানা দেখিবে বলিয়া—কিন্তু সেই সময় চৌধুরীসাহেব নথী পড়িতে পড়িতে খানসামাকে বলিলেন, "ওরে আব্দুকে একবার ডাক্ তো!"

লতিকা উদ্যতচরণ সংবরণ করিয়া টেবিলের উপরে একখানা খোলা বই ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে লাগিল।

খানিক পরে আব্দু আসিয়া জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিল। চৌধুরী-সাহেবকে অভিবাদন করিতেই তিনি ঘাড় তুলিয়া সহাস্যে বলিলেন, "তোমার যে কাজ পড়েছে বাবা।"

আব্দু সবিস্ময়ে বলিল, "হুকুম করুন।"

"কাল বেলা দশটার মধ্যে আমায় হাইকোর্টে পৌঁছে দিতে হবে, একটা আপীলের মামলা আছে।"

"বেশ ত।"

"ভোর চারটের সময় এখান থেকে ছাড়্‌বে, বেলা সাড়ে ছটায় আসানসোলে পৌঁছে আমায় চা খাওয়াবে, তারপর সেখান থেকে ছেড়ে বেলা সাড়ে আট্‌টার মধ্যে আমায় ব্যাণ্ডেলের হোটেলে পৌঁছে দিতে হবে, ঘণ্টাখানেক পরে সেখান থেকে ছেড়ে হাইকোর্ট—বুঝ্‌লে, পার্‌বে তো?"

তৎক্ষণাৎ মাথা নাড়িয়া সেলাম দিয়া আব্দু বলিল,—"বহুৎ খুব।"

আব্দু প্রস্থানের উপক্রম করিতেই চৌধুরী-সাহেব বলিলেন,—"দেখ, ভোর বেলা উঠ্‌তে হবে বলে' তুমি যেন সমস্ত রাত শ্মশান জাগিয়ে বসে থেক না। আমি নিজে তোমাদের ভোর বেলা উঠিয়ে দেব। রাত্রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ঘুমিও, বুঝ্‌লে!"

কোন প্রয়োজনীয় কাজে নির্দ্দিষ্ট সময়ে চৌধুরী-সাহেবকে স্থানান্তরে পৌঁছাইয়া দিতে হইলে, কর্ম্মোৎসাহী আব্দু রাত্রে ঘুমাইতে পারিত না। চৌধুরী-সাহেবের কাজ উৎরাইলে তবে সে নিশ্চিন্ত হইত। তাহার প্রশংসনীয় কর্ম্মদায়িত্বজ্ঞান, চৌধুরীসাহেবকে বিস্মিত ও উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিত, পাছে অনিয়মে আব্দুর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তাই তিনি পূর্ব্বাহ্ণে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিতেন।

হাসিয়া সসম্ভ্রমে মস্তক নত করিয়া আব্দু চলিয়া গেল।

একটা উৎকট উত্তেজনায় লতিকার ধমনীতে রক্তস্রোত দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। টেবিলটা দৃঢ়ভাবে চাপিয়া, সে বুক পর্য্যন্ত নুইয়া বইখানা দেখিতে লাগিল।

সেও কি এই সঙ্গে একবার কলিকাতা ঘুরিয়া আসিতে পারে না?—প্রস্তাবটা কি পিতার কাছে অসঙ্গত বিবেচিত হইবে?

হঠাৎ বিদ্যুতের মত অন্য একটা চিন্তা তাহার মনে ঈর্ষার তীব্র ঝিলিক্ হানিয়া গেল! জ্যোৎস্না যদি যাইতে চায়! কি ভয়ানক!—সে আন্দুর প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছে,—তাহার পবিত্র সুন্দর দৃষ্টি সর্ব্বদাই নত বটে, কিন্তু কে জানে কেন জ্যোৎস্নাকে দেখিলেই তাহার সেই দৃষ্টি অতিমাত্রায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। আন্দু যে জ্যোৎস্নার সহিত মুখ তুলিয়া কথা কহিবে, কিংবা তাহার মাধুর্য্যস্মিত টানা চক্ষু দুটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভাবিবে—"সুন্দর বটে!"—সেটি লতিকা কিছুতেই হইতে দিবে না। চৌধুরী-সাহেবের কলিকাতা যাওয়ার সংবাদটাও জ্যোৎস্নাকে জানান হইবে না। ভাগ্যে তাহার সমক্ষে পিতা একথা বলেন নাই!

কঠিনভাবে ওষ্ঠ চাপিয়া লতিকা অত্যন্ত শক্ত হইয়া চলিয়া গেল।

চৌধুরী-সাহেব দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের কূট সমস্যার মীমাংসায় মাথা ঘামাইতে লাগিলেন। কন্যার ভাবের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিলেন না।

৬

পরদিন প্রাতে নির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত অনুসারে চৌধুরী-সাহেব দুইজন ভৃত্য ও আন্দুকে লইয়া মোটরকারে কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

একটু বেলা হইলে, লতিকাকে না দেখিতে পাইয়া জ্যোৎস্না তাহার শয়নকক্ষে খুঁজিতে গেল; দেখিল লতিকা চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে, একজন হিন্দুস্থানী দাই তাহার পা টিপিতেছে, লতিকা খুব ছট্‌ফট্ করিতেছে। লতিকার কপালে হাত দিয়া জ্যোৎস্না জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর হ'ল কখন?"

লতিকা প্রথমতঃ কথা কহিল না। দুই তিনবার জিজ্ঞাসিত হইয়া বিরক্তস্বরে বলিল,—"কাল রাত্রে।"

থার্ম্মমিটার ঝাড়িতে ঝাড়িতে সরসী ঘরে ঢুকিল। দাই পা ছাড়িয়া সরিয়া বসিল। সরসী বলিল, "দিদি ফিরে শোও।"

দিদি কথা কানে তুলিল না। আপন মনে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া 'উঃ আঃ' করিতে লাগিল! সরসীর কথা লতিকা আদৌ গ্রাহ্য করিতেছে না দেখিয়া জ্যোৎস্না নিজে থার্ম্মমিটার লইয়া লতিকার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহময় স্বরে বলিল—"ফিরে শোও না ভাই।"

বারংবার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে লতিকা ত্যক্ত হইয়া সবেগে ফিরিয়া শুইয়া সতেজে বলিল,—"দাও।"

জ্যোৎস্না যেন থতমত খাইয়া গেল। কয়দিন হইতে লতিকার ক্রূর দৃষ্টি এবং কঠোর আচরণগুলা ক্রমাগত তাহার চিত্ত অপ্রসন্ন করিয়া তুলিতেছিল। ধৈর্য্য ধরিয়া নির্ব্বিবাদে সহিষ্ণু জ্যোৎস্না তাহার ব্যবহার-গুলা সহ্য করিয়া চলিতেছে, দাম্ভিকা লতিকা সকলের উপরই যেন সপ্তমে চড়িয়া আছে! বিশেষতঃ কয়দিন হইতে জ্যোৎস্না বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছে যে লতিকা তাহার প্রতি একটা বিদ্বেষময় স্বাতন্ত্র্যভাব গাম্ভীর্য্যের অন্তরালে গোপন রাখিয়াছে, কার্য্যক্ষেত্রে অতর্কিতে সেটা চোখে বেশ ধরা পড়িতেছে। জ্যোৎস্না শান্তভাবে থার্ম্মমিটার দিয়া দেওয়ালের বড় ঘড়ীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া গায়ে হাত দিয়া মৃদুভাবে বলিল,—"একটু শান্ত হয়ে শোও।"

লতিকা জ্বলিয়া উঠিল! "আমি কি সাধ করে চ্যাঁচাচ্ছি! আমার যা হচ্ছে, তা কে জান্‌বে!"—সজোরে জ্যোৎস্নার হাত ঠেলিয়া দিয়া, নিজেই থার্ম্মমিটার চাপিয়া ধরিয়া উঠিয়া বসিল। চক্ষু মুদিয়া সঘন

নিশ্বাসের সহিত দুলিতে লাগিল, জ্বরের ঘোরে সে যেন আর ঠিক থাকিতে পারিতেছে না! ক্ষণ পরে চোখ খুলিয়া ভ্রূকুটি করিয়া সরসীকে বলিল,— "তোকে মা কেন আমার কাছে পাঠান,—তুই আসিস্ না!"

লতিকা সশব্দে আবার বিছানায় শুইয়া পড়িল। জ্যোৎস্না স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, সরসীর প্রতি তীব্র ভাবে বর্ষিত তিরস্কারের গোপন ইঙ্গিত, জ্যোৎস্না দেখিল সম্পূর্ণ ই তাহার উদ্দেশে! তাহার আত্মসম্মানে বিষম আঘাত লাগিল। অম্লানবদনে নীরবে সহ্য করিবার শক্তি—তাহার আজন্মের অভ্যাস, তাই নীরবে রহিল। তিরস্কৃত সরসী সভয়ে বলিল, "পারাটা উঠে গেছে বোধ হয়।"

ঝাঁঝিয়া লতিকা বলিল, "যাক্ উঠে, যা হবার আমার হবে তোমার তে নয়?" কথাটা যুক্তিসঙ্গত দেখিয়া সরসী চুপ করিয়া রহিল। গায়ে পড়িয় ছেলেমানুষের সহিত ঝগড়া করিতে দেখিয়া জ্যোৎস্না বিমর্ষ-করুণ দৃষ্টিতে সরসীর পানে একবার চাহিল। তাহার পর থার্ম্মমিটার তুলিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে দেখিতে সবিস্ময়ে বলিল, "এ যে অনেক হয়েছে, এত হবে!"

মাথা তুলিয়া লতিকা বলিল,—"কত হয়েছে?"

"এক শো পাঁচ, কিন্তু গায়ের উত্তাপে—"

"ঐ রকমই হবে," বলিয়া লতিকা আশ্বস্তভাবে মুখ ফিরাইয়া শুইল অসুখটা বাড়িলেই সে যেন আরাম পায়! বলিল, "আমার এ সাধারণ অসুখ নয়, বোধ হচ্ছে আমার প্লেগ হবে।"

দাসীটা এতক্ষণ বুকে হাঁটু গুঁজিয়া, হাত দুটি গুটাইয়া নীরবে বসিয় ছিল। প্লেগের নামে চমকিয়া বলিল, "আহো মায় পিল্‌কি!"

সরসীর দুর্ভাগ্য! সে আবার কথা কহিল, "না না অত জ্বর হবে না নাড়া চাড়া পেয়ে নিশ্চয়—"

লতিকা গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ আমি ঠাট্ করে অসুখ বাড়াচ্ছি, যত দোষ সবই আমার। বেশ তাই তাই, তোমরা আমায় জ্বালিও না, চলে যাও সব।—দে দাই পা-টা টিপে দে,—উঃ, আঃ! বাবা!—" লতিকা ফিরিয়া শুইল।

মাতা আসিয়া গৃহদ্বারে দেখা দিলেন। হৃষ্টপুষ্ট স্থূলকায়া দিব্য সুন্দরী রমণী অতি নিরীহ রকমের ভালমানুষ; উচ্চশিক্ষিতা নহেন, সংসর্গগুণে অনেকটা উন্নত হইয়াছেন, স্বভাব অতি ধীর। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া খাটে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল। মা বলিলেন, "কত জ্বর দেখ্‌লি রে?"

সরসী উত্তর দিবার পূর্ব্বেই লতিকা বলিল, "এক শো পাঁচ! মা তুমি বাবাকে টেলিগ্রাম কর, আমি আর বাঁচ্‌বো না।"

মাতা অবাক্ হইয়া জ্যোৎস্নার পানে চাহিলেন। জ্যোৎস্না অনিচ্ছা সত্ত্বেও গোপন ইঙ্গিতে জানাইল তেমন কিছু নহে। মাতা আশ্বাস পাইয়া লতিকার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন,—"ডাক্তার বাবুকে ডেকে পাঠাই, তিনি আগে দেখুন, তারপর টেলিগ্রামের ব্যবস্থা কচ্ছি,—"

সরসী বলিল,—"বড়দাকে ডাক্‌ব মা, ডাক্তার বাবুর কাছে যেতে?"

কটমট করিয়া চাহিয়া লতিকা বলিল, "ডাক্তার কি বল্‌বে? কতক্ষণে মর্‌ব?"

এ কথার কোন সদুত্তর না দিয়া সরসী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে মাতা ব্যথিতভাবে হাসিয়া বলিলেন, "তুই বাছা, দুরন্ত রাগী।"

ঝঙ্কার দিয়া লতিকা বলিল,—"আমি দুরন্ত রাগী! তোমার মেয়ে চিপটেন কেটে কথা কইবে, তাতে দোষ নেই, সে যে আদুরে মেয়ে!"

কথা কহিলেই কথা বাড়িবে। কাজেই মাতা চুপ করিলেন। এই বিসদৃশ রৌদ্রাভিনয়ের মধ্যে তাহার কি করা কর্ত্তব্য ঠিক করিতে না পারিয়া জ্যোৎস্না অদূরে একটা চৌকী টানিয়া লইয়া বসিল। লতিকার আপত্তি টিকিল না। যথাসময়ে ডাক্তার আসিয়া নিজে থার্ম্মমিটার দিলেন, জ্বর উঠিল এক শো দুই। ডাক্তার চলিয়া গেলে, কিরণ বলিল, "পাঁচ জ্বর কে বল্লে, এ ত মোটে দুই—"

লতিকা মুখ বাঁকাইয়া বলিল, "কে জানে ওরাই তো বল্লে!"

জ্যোৎস্নার কানে কথাটা গেল, সে ক্ষুব্ধ হইল! কাহারো সহিত বাদানুবাদ করিতে সে বড় ভয় পাইত। তাই নির্দ্দোষী হইলেও তাহার ঘাড়ে অকারণ অনেক দায় পড়িত, কিন্তু সে মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে পারিত না। সে স্বভাবতঃই ভীরু, তাহাতে পরের বাড়ী আসিয়া ক্রমাগত অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহার লাভ করিয়া করিয়া সে যেন বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছে! তাহাতে সে জানিত না, যে, লতিকার দুটী মূর্ত্তি আছে!—সে এক মূর্ত্তিই লতিকার বরাবর দেখিয়াছে। বোর্ডিংয়ের হাস্য-মুখরিতা, চাঞ্চল্য উচ্ছ্বসিতা, অনর্গল তীক্ষ্ণকণ্ঠের দন্তময় পরিহাস-বচনবিস্ফুরিতা, অত্যন্ত সৌহৃদ্যশালিনী, প্রিয়সখী ঠাকুরাণীকে, বোর্ডিং ছাড়িয়া স্থানান্তরে আসিয়া অকস্মাৎ অদ্ভুত ভাবান্তরে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়া সে যেন মহাফাঁপরে পড়িয়াছে। যে পরের কাছে অত হাসি হাসিতে পারে,—সে যে আত্মজনের নিকটে ক্রমান্বয়ে এমন রুক্ষ মূর্ত্তি কি করিয়া ধরিয়া থাকে, তাহা সে মোটে বুঝিতে পারিতেছিল না।

যাহাই হউক নিজে যথেষ্ট জ্বালাতন হইয়া এবং সকলকে যথেষ্ট জ্বালাতন করিয়া সে-যাত্রা লতিকার ব্যাধি-পর্ব্ব শেষ হইল। পরদিন বিকালে ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়িয়া গেল!

কন্যার সংবাদ লইতে ঘরে আসিয়া মাতা দেখিলেন জ্যোৎস্না ও সরসী সেখানে বসিয়া আছে। মা আসিয়া মেয়ের বিছানায় বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কেন জানি না লতিকার মেজাজ তখন একটু ভাল ছিল, মাতার সহিত কথাবার্ত্তা সরলভাবে কহিতে লাগিল। কিছু-ক্ষণ পরে মাতা বলিলেন, "আহা জ্যোচ্ছনার বড় কষ্ট হয়েছে। তুই পড়ে রয়েছিস্, বাছার আমার কথা কবার লোকটি নাই।"

লতিকা চোখ চাহিয়া শান্তভাবে বলিল,—"যা না খুকি, তোরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আয়।"

মৃদু আপত্তি করিয়া জ্যোৎস্না বলিল,—"থাক আজ ; তুমি ভাল হও, কাল বেড়াতে যাব।"

হঠাৎ ঝঙ্কার দিয়া লতিকা বলিয়া উঠিল, "আর যাবেই বা কিসে ? গাড়ী-টাড়ী ছাই আছে,—"

কথাটা কেহ বুঝিল না, নির্ব্বোধ সরসী বলিল,—"কেন ? ব্রুহাম, ফিটন, ওগুলো তো রয়েছে।"

প্রতি পদে ছুতা ধরিতে ব্যগ্র, ঘোরতর অসন্তোষময়ী লতিকা তীব্রস্বরে বলিল, "তা যা না রে বাপু, আমোদ করে নেচে বেড়াতে কে তোদের বারণ কচ্ছে ?—আমার কাছে বসে থাক্‌তে কে তোদের মাথার দিব্যি দিচ্ছে ?—"

দাসী সাগুর বাটী লইয়া ঘরে ঢুকিল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল। লতিকা মনের যতটা ঝাল এক করিয়া অকস্মাৎ তাহাকে এমনি তাড়না করিয়া উঠিল, যে, সে বেচারী পড়িয়া গিয়া ঘরময় সাগু ছড়াইল ! লতিকা তো ক্রোধে খুন ! মাতা অনেক সাধ্য সাধনায় বহু কষ্টে তাহাকে খানিক শান্ত করিলেন। কিন্তু সে আর কিছুতেই কিছু খাইল না,

মাথা নাড়িয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমায় ত্যক্ত কোরো না, আমি কিছু খাব না।"

অসহ্য বিরক্তিতে জ্যোৎস্নার সারা চিত্ত ভরিয়া উঠিল। নীরবে দাসীর হাত ধরিয়া তুলিল, কিন্তু তাহাকে আহা বলিতে পারিল না, কেননা তাহাদেরই অপরাধে নির্দ্দোষের এ শাস্তি; নিজেকে সে অত্যন্ত অপমানিত জ্ঞান করিল। লতিকা কি মনে করে, যে, জ্যোৎস্না নিতান্ত নিরাশ্রয়, গলগ্রহ হইয়া তাহাদের বাড়ীতে বাস করিতে আসিয়াছে; তাই প্রতিপদে এমন নির্দ্দয়, দম্ভপূর্ণ তাচ্ছিল্য ব্যবহার করে! ইহা ত স্বভাবজাত অভ্যাস নয়, ইহা যে ইচ্ছাকৃত অগ্নি-উদ্বোধন! জ্যোৎস্নার মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল, তাহার কপালে ঘর্ম্মবিন্দু দেখা দিল।

কন্যার ক্রমাগত কর্কশতায় মাতাও মনে মনে কেমন সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িতেছিলেন। নিজের মেয়ের ব্যবহারের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহার নিস্তার নাই অথচ পরের মেয়েটির নিঃশব্দে উৎপীড়ন সহ্য করাতেও তাঁহার প্রবল উৎকণ্ঠা বাড়িতে লাগিল। জ্যোৎস্নাকে সরাইবার জন্য তিনি বলিলেন, "সরসী যা মা, তোরা ফুলবাগানে একটু বেড়িয়ে আয়, আমি এখানে বস্‌ছি।"

সরসী তৎক্ষণাৎ জ্যোৎস্নাকে টানিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "আসুন—" দিদির সান্নিধ্য হইতে পলাইতে পারিলেই সে বাঁচে! জ্যোৎস্না নীরবে তাহার সঙ্গে চলিল।

সরসী বাগানে গিয়া জ্যোৎস্নাকে অনেক দুষ্প্রাপ্য ফল ফুল লতা পাতা দেখাইয়া তাহাদের পরিচয় সবিস্তারে বর্ণনা করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না তাহাকে উৎসাহ দিয়া বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়া সে-সব কথা শুনিতে লাগিল। আসলে কিন্তু সে বড় মর্ম্মাহত হইয়াছিল, তাহার কিছুতেই

তৃপ্তি হইতেছিল না। শুধু সরসী মনঃক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে তাহার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিল।

ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা উভয়ে বাগানের মাঝে টিনের ছাউনিতে ঘেরা বিশ্রাম-কক্ষে আসিয়া সবুজ রং দেওয়া লোহার বেঞ্চিতে বসিল। সরসী গোটা কতক গাঁদা ফুল তুলিয়া আনিয়াছিল, সেগুলো দুহাতে লুফিতে লুফিতে বলিল, "দিদিকে নিয়ে আপনারা যে কি করেই সেখানে বাস করেন তা জানি না। আমি হলে একদিনও ওঁর কাছে টিক্‌তে পার্‌তাম্ না, বাবাঃ! খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে আমায় মেরে ফেল্‌ত, নাকে কানে খৎ!" সে নাক কান মোচড়াইয়া উদ্দেশে নমস্কার করিল। জ্যোৎস্না হাসিয়া ফেলিল।

উৎসাহিত হইয়া সরসী বলিল,—"দেখ্‌ছেন তো কেমন নারা-কাতুরে মানুষ, একটু যদি অসুখ হ'ল, তা হ'লেই বাড়ী মাথায় করেছে। দিদি ছুটীতে বাড়ী এলে আমি ত কাঁটা হয়ে থাকি, মনে হয় কত দিনে যাবে।"

একটি বড় গাঁদা ফুল লইয়া জ্যোৎস্নার জামায় গুঁজিয়া দিতে দিতে বলিল, "আপনি বেশ মানুষ, আপনাকে আমার বড় ভাল লাগে। বাড়ীর মধ্যে শুধু আপনাকে, আর মাকে ভালবাসি, আর কাউকে নয়!"

সরসীর সরলবুদ্ধিতে জ্যোৎস্না নিজেকে তাহাদের বাড়ীর সামিল হইতে দেখিয়া আবার হাসিল। বলিল, "আচ্ছা, দাদাদের?" সবেগে মাথা নাড়িয়া সরসী বলিল, "উহুঁ ছোট্‌দাকে তো মোটেই নয়, ভারি খুনসুটি করে, বরং বড়দাদাকে একটু ভালবাসি। আর বাড়ীর মধ্যে সব চেয়ে ভালবাসি, সক্কলের চাইতে বেশী—আব্দুকে!"

দীর্ঘটানে শেষের কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া সে জ্যোৎস্নার পানে এমনিভাবে চাহিল, যেন জ্যোৎস্না তখনই তাহাকে পরীক্ষার পূরাসংখ্যা

দিবে, কারণ সে এমনি একটা মস্ত প্রশ্নের অভ্রান্ত উত্তরের সমাধান করিয়াছে! জ্যোৎস্না কিন্তু তাহার পরিবর্তে একটু দ্বিধায় পড়িয়া বলিল, "আন্দু কে?"

বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া সরসী বলিল, "কেন, আমাদের ড্রাইভার আন্দু!—ওর নাম আন্দু নয়, আনোয়ার উদ্দীন, সবাই তাই আন্দু বলে—"

"ওঃ!" জ্যোৎস্না হাসিয়া ফেলিল, "সে বুঝি খুব ভাল?"

"খুব ভাল! একদিন আকবরের সঙ্গে বাজি রেখে এই লোহার বেঞ্চিখানা একলা ঘাড়ে ক'রে সমস্ত বাগানটা ঘুরে আবার বেঞ্চিখানা এখানে এনে রেখে দিয়েছিল! গায়ে খুব জোর! কুস্তির আখ্ড়ায় কুস্তি কর্তে যায় কি না—" সে সোৎসাহে তাহাদের আন্দুর অদ্ভুত চরিত্রের ও অদ্ভুত পরাক্রমের কাহিনী বলিতে লাগিল। সে তাহাদের আখ্ড়ার ওস্তাদকে আনিয়া একদিন দাদাদের কিরূপ ভয়াবহ লাঠিখেলা, মল্ল-কৌশল ইত্যাদি দেখাইয়াছিল; এক-একটা কাজে আন্দুর কিরূপ বিস্ময়াবহ জেদ; তাহার গল্প করিতে লাগিল। একদিন তাহার 'ডলি' পুতুল, ডেজী নামক কুকুরটা মুখে করিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে সে কিরূপ কান্না কাঁদিয়াছিল, এবং পরিশেষে আন্দু যখন সেটা সাঁতার দিয়া পুকুর হইতে তুলিয়া আনিল, তখন বাটীস্থ সকলে কিরূপ চমৎকৃত হইল তাহা বলিল। সে কত লোকের কত উপকার করে, পিতা তাহাকে কিরূপ ভালবাসেন, সেইসব গল্প সবিস্তারে দীর্ঘকাল ধরিয়া অক্লান্ত উৎসাহে সরসী আবৃত্তি করিয়া চলিল। জ্যোৎস্না অন্যমনস্ক ভাবে হুঁ হাঁ দিতে লাগিল।

সরসী আনন্দোজ্জ্বল মুখে মাথা নাড়িতে নাড়িতে ঈষৎ চুপে চুপে জ্যোৎস্নাকে বলিল, "সে আবার এমন সুন্দর গান গায়, একদিন আড়াল

থেকে শোনাব আপনাকে, ভারি চমৎকার! আবার নিজে নিজে কেমন গান তৈরী করে, জানেন!"

বিস্মিত ভাবে জ্যোৎস্না বলিল, "তাই নাকি, লেখাপড়াও জানে ?—"

ঘাড় কাত করিয়া সরসী সজোরে বলিল, "ওঃ! খুব।" সে আবার নূতন গল্প-স্রোত আবিষ্কার করিল। জ্যোৎস্নার সত্মলব্ধ অন্তর্দ্দাহের জ্বালা কথাবার্ত্তার মাঝখানে ডুবিয়া গেল, সে সকৌতুকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে সরসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ সরসী চুপ করিল। জ্যোৎস্না সবিস্ময়ে দেখিল একখানা কালো শাল গায়ে জড়াইয়া লতিকা ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে আসিতেছে। জ্যোৎস্না ব্যস্ত হইয়া বলিল, "ওকি! জ্বর ছাড়্‌তেই উঠে এসেছ?"

লতিকা বলিল,—"হোক্‌গে যাক্, শুয়ে থাক্‌তে আর ভাল লাগে না, তাই বাগানে একটু বস্‌তে এলুম, বসনা, তুমি বস।"

লতিকার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর শুনিয়া জ্যোৎস্না আশ্বস্ত হইল। কিন্তু সরসী শঙ্কিত প্রাণে ভাবিল, এতটুকু ত্রুটী হইলে এখনই দিদির ঘাড়ে ভৈরব চাপিবে। অতএব তাহার আগে পলায়নই শ্রেয়স্কর। সে উঠিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল, জ্যোৎস্না হাসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "পালাচ্ছ কেন? বসনা, তোমার আন্দুর গল্পটা বলে যাও।"

দিদির সামনে আন্দুর গল্পের কথা প্রকাশ হইয়া পড়াতে, সে ভারি ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইল; দিদি কিন্তু খুব প্রসন্ন সদাশয় ভাবে বলিল, "বস্ না, যাচ্ছিস্ কেন?"

সে বসিল, কিন্তু দিদির আগমনে তাহার উৎসাহের আগুন একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং বচনের খই আর ফুটিল না, সে নীরব রহিল।

তাহাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া লতিকা দয়া করিয়া নিজেই কথার সূত্র আবিষ্কার করিল। বলিল, "হ্যাঁরে তোদের টীচারের বে হবার কথা ছিল, হয়ে গেছে ?"

সে মাথা হেলাইয়া বলিল,—"হুঁ।"

"বে'র সময় তোরা গেছ্‌লি ?"

"হুঁ, স্কুলের সব মেয়েই।"

"টীচারের সাহেবটা দেখ্‌তে কেমন ?"

"বেশ ফরসা।"

লতিকা হাসিয়া উঠিল, "ফরসা তা জানি। বলি, মুখটা কেমন ? বাঁদরের মত, না উল্লুকের মত ?"

ক্ষুণ্ণ হইয়া সরসী বলিল, "না, বেশ।" ভয়ে সে বেশী কথা কহিতে পারিল না।

লতিকা বলিল, "আমাদের সময় মিসেস্ হুইলার ছিল, মেম নিজে দেখ্‌তে বেশ ছিল, কিন্তু তাঁর সাহেবটা যা ছিল, মেগ্যেঃ !—একেবারে হতকুচ্ছিত !"

এই সময় বাগানের উড়ে মালী সুন্দরীদের জন্য দুইটি তোড়া আনিয়া সাম্‌নে ধরিল। জ্যোৎস্না তোড়া লইয়া মালীকে কিছু বখ্‌শীস দিল। যোড় হাতে ঝুঁটিসুদ্ধ মাথা নোয়াইয়া মালী চলিয়া যাইতেছিল, সরসী বলিল, "মালী, আমাকে অর্কিড ফুল টুল দিয়ে একটা ভাল রকম তোড়া বেঁধে দেবে চল, কাল টীচারকে সকাল বেলা দিয়ে আস্‌ব।"

জরুর তাগাদায় তোড়া আদায় করিবার অভিপ্রায়ে সে মালীর সহিত চলিয়া গেল। তোড়ার ফুলগুলিতে সন্তর্পণ কোমল অঙ্গুলী সঞ্চালন করিয়া করিয়া সরাইয়া সরাইয়া দেখিতে দেখিতে জ্যোৎস্না বলিল, "ডাক্তার সাহেবের চিঠির জবাব দিয়েছ ?"

মুখ ফিরাইয়া লতিকা বলিল, "না।"

"কেমন আছেন? ভাল আছেন তো।"

"না, লিখেছেন স্বাস্থ্য বড় খারাপ।"

চিন্তিতভাবে জ্যোৎস্না বলিল, "তাই তো, একজামিনেরও তো খুব বেশী দেরী নেই। ডাক্তার-সাহেবের তো প্রায়ই অসুখের কথা শুনতে পাই। তিনি নিজে ডাক্তার অথচ তাঁরই শরীর এত খারাপ!"

বেঞ্চিতে ঠেস্ দিয়া সোজা হইয়া বসিয়া লতিকা বলিল, "স্বাস্থ্য ভাল থাকবে কোত্থেকে, ব্যায়াম-চর্চ্চা যে মোটে করেন না, একটু হাঁট্‌তে, একটু খাট্‌তে মোটে চান না, কুড়ের বাদশা যে, শুয়ে শুয়ে দিনরাত পড়্‌ছেন আর ঝুড়ি ঝুড়ি নোট লিখে আলমারি বোঝাই কচ্ছেন, কিন্তু হাঁসপাতাল এ্যাটেণ্ড্ কর্‌বার সময়, হাতে কলমে কাজ শেখ্‌বার সময়, একেবারে বেবাক্ ফাঁকি। তাঁর পছন্দ শুধু পুঁথিগত বিদ্যে তাই করেই তো বছর বছর ফেল হচ্ছেন—" বিরক্তিভরে লতিকা ঠোঁট দুটা বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইল।

জ্যোৎস্না নিস্তব্ধ রহিল। লতিকা উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তোমরা বল শিক্ষিত শিক্ষিত,—শিক্ষিত কি?—শিক্ষার ভারে মনুষ্যত্বটুকু রোলারের চাপে খোয়ার মত, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে,—তাঁরা শিক্ষিত! স্বাধীনচিন্তাশক্তি, স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি,—সবই পরস্ব মতের মোমজামায় মুড়ে এক কিম্ভূত-কিমাকার হয়ে দাঁড়াচ্ছেন,—এই তো শিক্ষার সার্থকতা! ঝাঁটা মার! তোতা-পাখীর মত খানকতক বই মুখস্থ কর্‌লেই মানুষ হয় না, মনুষ্যত্ব আলাদা জিনিস।"

লতিকার রুচিবৈচিত্র্য এবং মত পরিবর্ত্তনের অদ্ভুত বৈষম্যের কথা জ্যোৎস্না জানিত। সুতরাং প্রতিবাদ না করিয়া জ্যোৎস্না মৃদু মৃদু হাসিতে

হাসিতে বলিল, "শিক্ষিতদের ওপর তোমার আজন্মের ভক্তি হঠাৎ এমন মূর্ত্তিমান্ নাস্তিক হয়ে দাঁড়াল কেন ?"

লতিকা গম্ভীর স্বরে বলিল, "শিক্ষিতদের অপদার্থতা দেখে।"

অদূরে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষাচ্ছন্ন স্থানে—সমাগত সন্ধ্যার ঘনীভূত অন্ধকার-রাশির পানে জ্যোৎস্না নীরবে চাহিয়া রহিল।

৭

পরদিন প্রত্যূষে চৌধুরী-সাহেব নিজ কার্য্য সমাধা করিয়া ভৃত্যবর্গসহ বাটী ফিরিলেন।

আন্দু গাড়ী যথাস্থানে রাখিয়া ঘরে ঢুকিয়া জামাজুতা ছাড়িয়া ঘর দ্বারে ঝাঁট দিতেছে, এমন সময় লছমী ভকতের দ্বারবান আধখান নূতন কাপড় লইয়া ঘরে ঢুকিল। আন্দু তাহাকে বসিতে বলিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিল। দ্বারবান ধনুকধারী বলিল, "দর্জ্জি সাহেবের কি এত বেলায় ঘুম ভাঙ্গ্‌ল ?"

আন্দু তাহাকে কলিকাতা গমনের কথা বলিল। শুনিয়া ধনুকধারী অপ্রস্তুতভাবে তাড়াতাড়ি উঠিতে উদ্যত হইল, বলিল, "আমি বিকালে আস্‌ব এখন !"

আন্দু তাহাকে ধরিয়া ফের বসাইল। বলিল, "তোমার দেদার সময় নেই সে আমি জানি। কি দরকারে এসেছিলে, কাজটা সেরে যাও দাদা।"

ধনুকধারী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না না, সে এখন থাক, তুমি এই এক জায়গা থেকে আস্‌ছ, এখনো বস্‌তে দাঁড়াতে সময় পাওনি, সে এখন থাক।"

আন্দু বলিল, "কিছু দরকার নেই, এতক্ষণ দিব্বি বসে এসেছি; এখনো

নেহাৎ ঘানি টেনে কাবু হচ্ছিনে, আরামে দাঁড়িয়ে আছি। কি কাজ বলো দেখি ?"

ধনুকধারী বগলদাবা হইতে নতুন কাপড়টি বাহির করিয়া আন্দুর খাটের উপর রাখিল ; বলিল, "আমায় গোটাচার জামা সেলাই করে দিতে হবে, কাপড়খানা এখন থাক, এর পর ধীরে সুস্থে মাপ দিয়ে যাব।"

আন্দু হাসিয়া বলিল, "এই জন্যে ! তা মাপটা এখনই দিয়ে যাও, ধীরে সুস্থে বরং আমি সেলাই করে নেব যখন হোক। তোমার তো অন্য কাজ ঢের আছে।"

ধনুকধারী আপত্তি করিল, আন্দু শুনিল না, গজ বাহির করিয়া মাপ জোক করিয়া তাহাকে বিদায় দিল। তাহার পর চারিটি জামার কাট-ছাঁট ঠিক করিয়া রাখিয়া বাহিরে আসিল।

সেদিন রবিবার। সুতরাং আদালত বন্ধ। আন্দু মনে করিল জামা-গুলা যতটা পারি সেলাই করিয়া রাখি, কিন্তু রাত্রে অর্দ্ধজাগরণের জন্য এবং একাক্রমে বহুক্ষণ গাড়ী চালাইয়া আসিয়াছে বলিয়া শরীর কিছু অবসাদ-গ্রস্ত বোধ হইল। বলিষ্ঠ কর্ম্মঠের শরীর, বলের কাজেই স্ফূর্ত্তিলাভ করে,—আন্দু বাগানে আসিয়া দেখিল, মালী ফুলগাছের জমী তৈয়ারী করিতেছে। আন্দু বিনাবাক্যে আর-একখানি কোদাল লইয়া আসিয়া মালকোঁচা মারিয়া মালীর সহিত জমী কোপাইতে লাগিল! কিছুক্ষণ পরে জমীটা শেষ হইল ; মালী তামাক দোক্তা খাইতে বসিল ; আন্দু কোদাল ফেলিয়া গায়ের ঘাম মুছিতেছে ; এমন সময় বাগানের ধারে, মেহেদীর বেড়ার ওপাশে রাস্তায় একখানা টম্‌টম্ আসিয়া দাঁড়াইল। আরোহী শ্রীরাম ভকতের পুত্র ঊনবিংশ বর্ষীয় বালক, অথবা যুবক, লছমী ভকত, আন্দুকে দেখিয়া গাড়ী থামাইল।

আন্দু তস্‌লীম দিয়া বেড়া ডিঙ্গাইয়া গাড়ীর কাছে আসিল। লছমী ভকত দূর হইতে তাহাকে কোদাল চালাইতে দেখিয়াছিল, কাছে আসিতেই হাসিয়া বলিল, "বাকী আর কিছু রাখ্‌লে না, কোদাল ধরেছ?"

আন্দু হাস্যমুখে জবাব দিল, "সবই ধর্‌তে হয়, বাকী কিছু না রাখাই তো মঙ্গল। তারপর আপনি কেমন আছেন?"

আন্দুর ঘর্ম্মাক্ত শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া লছমী ভকত বলিল, "এঃ! একি হয়েছে, নেয়ে উঠেছ যে।"

আন্দু মালকোঁচা খুলিয়া কাপড়টা কোমরে জড়াইয়া ফাঁশ দিয়া টানিয়া বাঁধিল, গামছায় সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া বলিল, "কোদাল চালান স্ফূর্ত্তির কাজ বটে।"

লছমী ভকত অবজ্ঞার স্বরে বলিল, "তোমার সবতাতেই স্ফূর্ত্তি! চুপ করে থাক্‌তে পার না, তাই বল।"

আন্দু মৃদু হাসিয়া বলিল, "চুপ করে থাক্‌তে না পারাকেই ত স্ফূর্ত্তি বলে। আপনি কি বেড়াতে বেরিয়েছেন?"

লছমী ভকত বলিল, "হাঁ এই দিকে একটু। তোমায় কদিন দেখিনি তাই জান্‌তে দাঁড়িয়েছিলুম কেমন আছ, আসি।"

সে চাবুক উঠাইয়া অশ্বকে তাড়না করিল। আন্দু তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল, পা-দানে পা দিয়া গাড়ীর পাশে বসিল। এই অভাবনীয় আচরণে লছমী ভকত সীমার অতিরিক্ত বিস্মিত উৎকণ্ঠায় বলিল, "একি! খালি গায়ে এ বেশে যাবে কোথায়?"

আন্দু তাহার হাত হইতে চাবুক ও অশ্ববল্গা লইয়া ঘোড়া হাঁকাইতে হাঁকাইতে বলিল, "চলুন বেড়িয়ে আসি,—আপনি সঙ্গে সহিস নেন্‌নি কেন?"

কুণ্ঠিতভাবে লছমী ভকত বলিল, "আমি একলাই সে জানে, সবই

আন্দু আয়ত-নেত্রের বিস্ফারিত দৃষ্টি তাহার মুখের. ক. এই গুলা স্থিরভাবে রাখিল। সে দৃষ্টির মর্ম্ম কি, তাহা লছমী ভকত বুঝিল, সে চক্ষু নামাইল। আন্দু ধীরভাবে বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে, কথা কটা শুন্‌তে হবে আপনাকে, মাঝখানে ধমক দিয়ে, কি তর্ক করে থামাতে পার্‌বেন না, আগে শুনুন—"

মুহূর্ত্তে লছমী ভকত বুঝিল আন্দু এবার তাহাকে কি বলিতে চাহে। তাহার মনটা অত্যন্ত দমিয়া গেল, লজ্জায় তাহার মুখ তুলিতে ইচ্ছা হইল না, কিন্তু পরক্ষণে জোর করিয়া সে আত্মসংবরণ করিল, আক্রমণের আরম্ভেই পরাভব স্বীকারে উদ্যত মনটাকে তীব্র ধাক্কায় সোজা করিয়া উগ্র স্বরে বলিল, "এ আমি অন্য কোথাও যাইনি ত, আমি একটু সোজা রাস্তায় বেড়াতে যাচ্ছি!"

আন্দু শান্তভাবে বলিল, "সে ত জানি। আমি আপনাকে কিছু বল্‌তে চাই। আপনার মা আছেন, ভাই আছেন, বাপ আছেন; মনে করুন, আপনার আন্দুও তাদের সামিল আজ একজন আপনার নিজের লোক।—হয়ত যে কথাটা আমি আপনাকে বল্‌তে চাই সেটা আপনি বুঝেছেন, আর এও নিশ্চয় যে, আমার মত অনেকে আপনাকে এই কথাটা এর আগে অনেকবার বলেছে, কিন্তু সে কথা নয়! আমি অন্য দিক দিয়ে কথাটা আরম্ভ কর্‌ছি। দেখুন আমি বাক্যযুদ্ধ জিনিষটা মোটে পছন্দ করি না, তাই কারো সঙ্গে ইচ্ছা করে তর্ক করি না, আপনার সঙ্গেও কর্‌ব না, সে শুধু আপনাকে বেশী জ্বালাতন করা হবে আমি জান্‌ছি। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন, মন্দচরিত্র লোক কখনো দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না, সৎকার্য্যের

আন্দু তস্‌লীম দি মত খুব অল্প লোকেই জানে, তবু আপনি একি ভকত দূর হুইছেন?"

লছমী ভকত মস্তিষ্কটা ঠিক করিয়া লইল। আন্দুর মন্দ মন্দ ভর্ৎসনায় সে কিসের জন্য কাবু হইবে? তাহার কার্য্যাকার্য্যের সমালোচনা—সমালোচনা? না না আন্দু যে আগেই আত্মীয়তার পথ দেখাইয়া রাখিয়াছে, তাহার ঐ মৃদু গভীর আক্ষেপের উপর তো ক্রোধ অভিমান চলিবে না; চলিত শুধু নিষ্ফল বাক্যাড়ম্বর; তাহাও ত আন্দুর বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু সে ত হটিবার পাত্র নহে, লছমী ভকত প্রাণপণে হাসিয়া জবাব দিল, "তুমি আমার চরিত্র নিয়ে তর্ক কর্‌তে চাও? বেশ! কর। আমরা মানুষ—"

বাধা দিয়া আন্দু বলিল, "হাঁ, আমরা মানুষ, আমরা কেন মদ খেয়ে, মন্দ সংসর্গে পড়ে, বাপ মা বিষয় আশয় কার-কারবার পাঁচরকম বাজে কাজে পাঁচরকম অমানুষিক ব্যাপারে সব বিসর্জ্জন কর্ত্তে পার্‌ব না? কেমন এই ত বল্‌তে চান আপনি?"

এই কথাটাই বটে, এই রকমই সে বলিতে চাহিতেছিল। কিন্তু আন্দু যখন তাহার মুখ হইতে কথাটা লইয়া আপনিই তাহার জবানী তাহাকে শুনাইল, তখন সেটা যেন লছমী ভকতের কানে অত্যন্ত অস্বাভাবিক লাগিল। সে সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আহা! কেন? একটু আমোদ করা কি এতই দোষ?"

আন্দু বলিল, "আমোদ কই? আমোদ কাকে বলে? একি আমোদ? এযে সর্ব্বনাশ!"—আন্দু ক্রমশঃ উত্তেজিত হইয়া উঠিল, সে যে-তর্ক যে-যুক্তি লছমী ভকতের উপর বর্ষণ করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিল, সেই গুলা সবই আবেগের মুখে তাহার রসনা হইতে উৎসারিত হইতে লাগিল,

লছমী ভকত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ ত সবই সে জানে, সবই তাহার মনে আছে, নাই শুধু—আন্দু যে জোরে তাহাকে এই গুলা শুনাইতেছে, সেই জোরটুকু!—পুরাতন কথাগুলাই তাহার কানে নূতন সুরে নূতন করিয়া বাজিতে লাগিল। কিছুই নয় বলিয়া সেগুলা উড়াইবার চেষ্টা করার চেয়ে আমি কিছুই নই এইটুকু প্রতিপন্ন করা বরং সহজ মনে হইল,—কথাগুলা এমনই তেজস্বী, এমনই প্রাণবন্ত।

ভকতজী মাথা হেঁট করিয়া রহিল, আন্দু ইচ্ছামত পথে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল, সে প্রতিবাদ মাত্র করিল না, তাহার মনের ভিতর যে তখন কি হইতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। ভকত যেন অভিভূত জড় হইয়া বসিয়া রহিল। এই আন্দু সেই আন্দু! যে কুস্তির আখ্‌ড়ায় ধূলা মাখিয়া, সরল শিশুর মত হাসিয়া খেলা করে? এ সেই লোক? ভকতের সারা মনটা যেন কেমন বিকল হইয়া আসিল।

গঙ্গার ধারের নির্জ্জন রাস্তা দিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে, আন্দু মাত্র রাশটি ধরিয়া আছে, আর রোখের সহিত প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতেছে, ভকত কিন্তু একেবারে নিঝুম।

রাস্তার ধার হইতে একজন লোক ডাকাডাকি করিয়া গাড়ী থামাইতে বলিল। আন্দু চাহিয়া দেখিল, শম্ভু মাড়োয়ারী। শম্ভু মাড়োয়ারী এখানকার একজন প্রসিদ্ধ আড়তদার। বিষয়সম্পত্তি একসময় যথেষ্টই ছিল, কুসংসর্গে পড়িয়া সবই খোয়াইয়াছে, এখন আছে শুধু ঠাটটুকু। বয়স প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছে, তবু নেশা এখনো ছুটিল না। আন্দু শুনিয়াছিল, বালক লছমীভকত ইহার সঙ্গে মিশিয়াই এমন দ্রুতবেগে উৎসন্নে চলিয়াছে। তাহাকে মধ্যপথে দেখিয়া এখন সে লছমীভকতের সোজাপথে ভ্রমণের

অনাবশ্যক কৈফিয়ৎটার মর্ম্ম স্পষ্ট বুঝিল। গাড়ী থামাইল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতেছে, তথাপি সে মাথা নোয়াইয়া নমস্কার করিল।

শম্ভু মাড়োয়ারীর কপালে রক্তচন্দনের প্রকাণ্ড ফোঁটা, মাথায় টিকির উপর জরিব ফুলকাটা মখমলের টুপী, পায়ে জরির লপেটা, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, কাঁধে বেনারসী চাদর, হাতে আবলুশ কাঠের সৌখীন ছড়ি। মাড়োয়ারী গাড়ীতে উঠিয়া আন্দুকে বলিল, "এ্যাকি সাহেব, তুমি যে বড় এ রাস্তায় এলে।"

আন্দু বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, বুঝ্‌তে পারিনি, বাঁকা রাস্তায় এসেছি।"

লছমীভকত কোন উচ্চবাচ্য না করিয়া একটু সরিয়া তাহাকে বসিতে জায়গা দিল। মাড়োয়ারী এই নাবালকটির আসন্ন অভিভাবকের মত সদম্ভে জাঁকিয়া বসিল। গাড়ী পুনশ্চ ছুটিল।

মাড়োয়ারী বুঝিল গাড়ী আজ ঠিক গন্তব্যপথে ছুটিতেছে না। সঙ্গে আন্দু রহিয়াছে, সুতরাং কথাটা খোলসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেও দ্বিধা বোধ করিল। অগত্যা পকেট হইতে চাম্‌ড়ার সিগার-কেস বাহির করিয়া দুটি সিগারেট লইয়া একটা লছমী ভকতকে দিল, দ্বিতীয়টি নিজ মুখে ধরিল; কি ভাবিয়া পুনরায় আর-একটি সিগারেট লইয়া আন্দুর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, "নাও, তুমি একটা নাও, জন্মটা সার্থক কর।"

চাবুকসুদ্ধ মুষ্টি কপালে ঠেকাইয়া আন্দু বলিল, "সিগারেট আমি খাই না, কালে ভদ্রে কখনো এক আধ টান সখ করে খেয়েছি। এখন সখ চুকে গেছে।"

মাড়োয়ারী জেদের সহিত বলিল, "আহা খেয়েই দেখনা একটা।"

আন্দু হাসিয়া বলিল, "খেয়ে আর দেখ্‌ব কি? সে ত পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, দেখ্‌ব শুধু চমৎকার ধোঁয়া! ও আপনি রেখে দিন।"

ভকত একদৃষ্টে আন্দুর মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাড়োয়ারী অগত্যা সিগারেট যথাস্থানে রাখিয়া, দেশলাই জ্বালিয়া নিজের মুখে অগ্নিসংস্কারে প্রবৃত্ত হইল। ভকত সিগারেট হাতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে দেখিয়া ঠোঁটে সিগারেট চাপিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "কই খেলে না ?"

ভকত শুষ্ক মুখে বলিল, "না, বড় মাথা ধরেছে।"

মাড়োয়ারী বলিল, "রোদে রোদে কোথায় ঘুর্‌বে ? বেলাও তো হ'ল, কোথাও জিরুবে চল।"

আন্দু ভকতের মুখপানে চাহিল। ভকত ত্রস্তস্বরে বলিল, "না না, যে রাস্তায় যাচ্ছ সেই রাস্তাতেই চল।"

মাড়োয়ারী যেন বিষম ধাঁধায় পড়িল। সে একবার ভকতের মুখপানে একবার আন্দুর মুখপানে বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চাহিতে লাগিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। ইহারা উভয়েই যেন নিজেদের অগোচরে কি একটা কিছু করিয়া বসিয়াছে, উভয়েরই এমনিতর ভাবখানা। ভকতের প্রতিবেশী খোঁচাখুঁচি যুক্তিসঙ্গত নহে দেখিয়া চুপ করিয়া রহিল।

হঠাৎ আন্দু ভকতের হাতে অশ্ববল্গা ও চাবুক দিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়িল। ভকত ব্যগ্র ব্যাকুলতায় বলিল, "কোথায় যাচ্ছ ?"

আন্দু মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বলিল, "চলে যান গাড়ী হাঁকিয়ে, আমি আমার কাজে চল্লুম।"

আন্দুর সেই শান্তমুখের সহজ কথাটি দেবতার আদেশের মত ভকতের বক্ষে যেন মহা নির্ভীকতার বর্ম্ম পরাইয়া দিল। তাহার অন্তরের মধ্যে এতক্ষণ যে অনুতাপ পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, এতক্ষণে তাহাতে যেন পরম সান্ত্বনা আসিল ; স্পর্দ্ধা ও গ্লানির দ্বন্দ্বের এতক্ষণে বিবেকের বিচারে নিঃসংশয় মীমাংসা হইয়া গেল ; তাহার মনে হইল আন্দু তাহার জীবন-সূত্র

লইয়া এতক্ষণ জট ছাড়াইতেছিল, এবার তাহার সমস্ত গ্রন্থি নির্ম্মুক্ত করিয়া তাহার হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে সমর্পণ করিয়া ভকত আদেশ দিল, "চলে যাও!"

ভকত আশ্বস্তচিত্তে সোৎসাহে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিয়া তীরবেগে গাড়ী ছুটাইল। পিছুদিকে মুখ ফিরাইয়া একবার চাহিল, দেখিল আন্দু একটি নবজাত ছাগশিশুকে বুকে করিয়া লইয়া যাইতেছে, ছানাটি এতক্ষণ রাস্তার ধারে মাতৃহারা হইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিয়া ফিরিতেছিল। ভকতের স্মরণ হইল, তাহারা খানিক আগে, এক ছাগীকে পথের ধারে ঐরূপ একটি শাবক লইয়া বিশ্রাম করিতে দেখিয়াছে, আন্দু বোধ হয় সেইখানেই যাইতেছে। ভকতের চক্ষু অশ্রুসজল হইল, ধন্য আন্দুর কোমলপ্রাণ, একটা ছাগশিশুর কাতরতাও তাহার কর্ণ অতিক্রম করিল না!

মাড়োয়ারী একটা অভাবনীয় বিপ্লবের স্পষ্ট সূচনা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইল, খানিকদূর গিয়া বলিল, "গাড়ী থামাও, আমি পাঁড়ের সঙ্গে দেখা করে যাব।" ভকত দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাকে নামাইয়া দিয়া, গাড়ী ঘুরাইয়া ফিরিয়া চলিল। মাড়োয়ারী বুঝিল ভকত আর তাহার হাতে নাই। আন্দুকে অভিশাপ দিয়া সে পাঁড়ের বৈঠকখানায় চলিল।

ভকত আসিয়া দেখিল, আন্দু মিঞা ছাগমাতার নিকট পথের ধূলির উপর জানু পাতিয়া বসিয়া হাস্যসুন্দর মুখে ছাগশিশুকে ধরিয়া মাতৃদুগ্ধ পান করাইতেছে। কাছাকাছি হইয়া ভকত রাশ টানিয়া গাড়ী থামাইল। আন্দু মাথা তুলিয়া বলিল, "ফিরে এলেন?"

ভকত বলিল, "ফিরেই চলেছি, গাড়ীতে এস।"

আন্দু বলিল, "না, আপনি চলে যান। কার ছাগল খোঁজ করে বাড়ী দিয়ে যাব—"

ভকত শান্তমুখে বলিল, "আন্দু সাহেব, তোমায় বল্‌তে এসেছি, আমি আজই মামার বাড়ী যাব, এখানে থাক্‌লে ঐ সব বদ্‌সঙ্গীর টান হয়ত এড়াতে পার্‌ব না; লক্ষ্মীছাড়ার মত আবার বদ্‌খেয়ালীতে মাতব, কিন্তু আর নয়।"

ভকত ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষিল। আন্দু 'আদাব' দিয়া, বিহ্বল-ভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিল।

৮

আন্দু যখন স্নানের জন্য গামছা আনিতে রহিমের কাছে আসিল, তখন অনেক বেলা হইয়াছে। রহিম রাগ করিয়া তাহার উপর অনেক কটু-কাটব্য বর্ষণ করিয়া যখন নবাবের পৌত্র বলিয়া তাহাকে অভিহিত করিল, তখন আন্দু হাসিয়া বলিল, "আমি যদি নবাবের নাতী হই, তা হলে আমার চাচা নবাবের কে হয়?"

রাগের মাথায় রহিম বলিল, "ব্যাটা হয়!"

"কেয়াবাৎ!" বলিয়া আন্দু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। "দেখ্‌লে চাচা, তাই তোমার মেজাজে এত নবাবীর গন্ধ পাই। নবাবের সঙ্গে তোমার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তা কি জানি—"

অপ্রস্তুত লইয়া রহিম বলিল, "যাও যাও, ঢের বেলা হয়েছে, চান্-টান্ করে এস। কোথাকার ছেলেমানুষ জানি না, রাত্রে খাওয়া নেই, ঘুম নেই, তা খেয়ালই নেই। সাহেবের সঙ্গে যারা গেছ্‌ল, তারা খেয়ে দেয়ে

এক ঘুম ঘুমিয়ে উঠ্‌ল, আর তুমি টো টো করে কোথায় ঘুর্‌ছ তার ঠিক নেই। যাও শীঘ্রি—"

আন্দু মিনতি করিয়া বলিল, "চাচা, তুমি ভাত বেড়ে খেতে বস, আমি নিশ্চিন্দি হয়ে নাইতে যাই।"

রহিম অসম্মতি প্রকাশ করিল। কিন্তু আন্দুর মিষ্ট মুখের পীড়াপীড়ি এড়ান বড় শক্ত কথা, অগত্যা আন্দুর অন্নব্যঞ্জন রাখিয়া নিজে আহারে বসিল। খাইতে খাইতে রহিম বলিল, "পিয়ারী সাহেব তোমায় খুঁজ্‌তে এসেছিল।"

আন্দু বলিল, "কেন ?"

"কেন আর, টাকা চাই। আমি ফেরৎ দিয়েছি, বল্লুম আন্দুরই এখন টাকার টানাটানি,—গেল মাসে যে টাকা ধার নিয়েছে তাই শোধ কর্‌তে পার্‌ছে না, আবার টাকা। পিয়ারী সাহেবকে আর টাকা দিও না।"

আন্দু কথা কহিল না। অন্যমনে পায়চারি করিতে লাগিল। সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, "চাচা, পিয়ারী সাহেবের কোন কাজ কর্ম্মই জোটে নি ?"

রহিম বলিল, "কই আর জুট্‌ল ? খালি দেনার মাথায় সংসার আর কতই চলে ? অনেকগুলি পুষ্যি, লোকটা যেন হ্যাঙ্গারী হয়ে পড়েছে !"

"হুঁ"—বলিয়া আন্দু নীরবে চিন্তান্বিত মুখে গামছাখানি গলায় ফেলিয়া পুষ্করিণীর উদ্দেশে চলিল। দ্বারবানের ঘর পার হইয়া গেটের বাহিরে যেমন আসিয়াছে, অমনি পশ্চাৎ হইতে দুইটা লৌহকঠিন হস্ত অকস্মাৎ তাহার হাত দুইটা পিছন দিকে টানিয়া সবলে টিপিয়া ধরিল। হাসিয়া পিছনদিকে চাহিয়া আন্দু বিস্মিত হইল, একি ! এ তো পরিচিত লোক নয় ! এ যে জুল্পিবহুল প্রকাণ্ডপাগড়ীওয়ালা দীর্ঘাকৃতি বিশাল মূর্ত্তি ! আন্দু বলিল, "আপনি কাকে খুঁজছেন, আমি অন্য লোক।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া লোকটা প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে বলিল, "না, তোমাকেই খুঁজ্‌ছি, পিছমোড়া করে বাঁধ্‌ব।"

দৃপ্ত স্বরে আব্দু বলিল, "কেন?"—সে হাতটা ছাড়াইবার জন্য ঈষৎ টানিল। লোকটা তৎক্ষণাৎ আরও জোরে হাতটা টিপিয়া ধরিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "গায়ে জোর কত? ছাড়াও দেখি!"

অপরিচিত লোকটার ধৃষ্টতা আব্দুর আর সহ্য হইল না। সে আড় হইয়া ভূমি পর্য্যন্ত নুইয়া এক প্রচণ্ড হ্যাঁচ্‌কা মারিল। চর্ব্বি-থল্‌থলে্ বিপুল-চেহারা লোকটা সে নিরেট আকর্ষণ প্রতিরোধ করিতে না পারিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, মল্লবীর আব্দু চক্ষের নিমিষে হাঁটুর গুঁতায় বাঁ হাত ছাড়াইয়া লোকটার মোটা ঘাড় ধরিয়া রীতিমত ধাক্কায় ভূমে পাড়িল, লোকটা হাঁফাইয়া তাহার ডান হাতখানা ছাড়িয়া দিল, আব্দু ঘুসি পাকাইয়া শূন্যে উঠাইল,—অমনি হাঁ হাঁ করিয়া কয়েকজন লোক ছুটিয়া আসিল, বিস্মিত আব্দুর উদ্যত বজ্রমুষ্টি শিথিল হইয়া গেল! দেখিল তাহার আখ্‌ড়ার ওস্তাদের সহিত দুইজন খেলওয়ার বন্ধু!—আব্দু প্রতিদ্বন্দ্বীকে ছাড়িয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। ওস্তাদ হাসিতে হাসিতে বলিল, "কেমন সিংহজী, কেমন পালোয়ান দেখ্‌লেন? সখ মিট্‌ল তো?"

আব্দু অবাক্ হইয়া একবার ওস্তাদের মুখপানে একবার সেই লোকটার মুখপানে তাকাইতে লাগিল। সে ওস্তাদকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল। ভূপতিত লোকটা ধূলা হইতে উঠিয়া জামা-টামাগুলো ঝাড়িয়া-ঝুঁকিয়া লইল। আব্দুর কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, "সাবাস্ যোয়ান, আমায় এক লহমায় ফেলেছ, বাহাদুর বটে!"

অপ্রতিভ আব্দু কিছুমাত্র উৎসাহিত না হইয়া মাথায় একবার হাত

ঠেকাইল মাত্র। ঘন ঘন ব্যগ্র দৃষ্টিতে ওস্তাদের পানে চাহিতে ওস্তাদ বলিলেন, "এঁকে চিন্‌তে পার্‌লে না? এঁরই আস্‌বার কথা ছিল, ইনিই আমাদের শিখ ভাই হরকিষণ সিং বাহাদুর।"

আন্দু সসম্ভ্রমে ভূমিস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা চাহিল। হরকিষণ সিং গভর্ণমেণ্টের বেতনভোগী একজন সৈন্য; ওস্তাদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব বলিয়া, ছুটিছাটা পাইলে মাঝে মাঝে ভাগলপুরে বেড়াইতে আসে, ও এখানকার বাছা বাছা পালওয়ানদের সহিত লড়াই দিয়া আমোদ করিয়া যায়। আন্দু ইহাকে চিনিত না, শুধু নাম শুনিয়াছিল মাত্র। আন্দু ক্ষমা চাহিতে হরকিষণ হাসিল। স্ফূর্ত্তিদীপ্ত মুখে ওস্তাদজী আন্দুর বিস্তৃত পরিচয় পাড়িয়া বসিল, আর ওস্তাদের সঙ্গী দুটি বক্ষ-সন্নদ্ধ করে হরকিষণের প্রতি গোপনে ব্যঙ্গরঞ্জিত কটাক্ষপাত করিয়া হাসিতে লাগিল। তাহাদের রঙ্গ দেখিয়া আন্দু জ্বলিয়া গেল, একে ত নিজের অসহিষ্ণুতার দোষে সামান্য রহস্যের উত্তরে এত বড় মর্ম্মান্তিক জবাব পাঠাইয়া সে মহালজ্জায় পড়িয়াছিল, তাহাতে হরকিষণের আচরণে ক্ষুণ্ণতার চিহ্নমাত্র না দেখিয়া সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া গেল। হরকিষণ ওস্তাদের সমস্ত কথা শুনিয়া আন্দুকে হাসিতে হাসিতে বলিল, "নয় দোস্তসাহেব, আমি তোমায় 'নেওতা' কর্ত্তে এসেছি, কাল বল-খেলার মাঠে আমাদের দুঘণ্টা খেলা হবে, ম্যাজিষ্টার সাহেবের কাছে পাশ নিতে লোক গেছে, অনেক সাহেবলোক্ খেলা দেখ্‌তে আস্‌বে, তোমায়ও খেল্‌তে হবে।"

আন্দু প্রমাদ গণিল, বুঝিল এ সব ওস্তাদের চাল,—আন্দু প্রকাশ্যস্থলে মল্লযুদ্ধ করিয়া নাম জাঁকাইতে ভয় খায় বলিয়া, ওস্তাদ কত কৌশলে তাঁহাকে কতবার খেলাইতে লইয়া গিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছেন; তাই এইবার বুঝি এই বিদেশীকে পাকড়াইয়াছেন? আন্দু ওস্তাদের দিকে

চাহিল, ওস্তাদ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমি সে ওঁকে বলেছি। উনি বলেন, না খেল্‌লে আমি ছাড়্‌ব না। তাইত তোমায় অমন করে আট্‌কেছিলেন। তুমি নেহাৎ হারালে······তাই!"

আন্দুর হাত দুইখানা নিজের প্রকাণ্ড হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া প্রীতিপূর্ণ স্বরে হরকিষণ বলিল, "বল, তুমি আমার কথা রাখ্‌বে?"

আন্দু হাসিয়া বলিল, "কি মুস্কিল!"

সে একটু আবেগভরে আন্দুর হাতটা নাড়া দিয়া বলিল, "না; তোমার সঙ্গে ভাল করে আলাপ কর্‌তে হবে, তোমায় আমি ভালরকম জান্‌তে চাই!"

আন্দু সসম্ভ্রমে শুষ্কহাস্যে বলিল, "আমার সৌভাগ্য"—কিন্তু মনে মনে সেই সৌভাগ্যের কবল হইতে মুক্তিলাভের জন্য বিলক্ষণ শঙ্কিত হইয়া উঠিল, নাম জাঁকাইতে যাহারা ব্যতিব্যস্ত তাহাদের সংসর্গ আন্দুর কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর!

ওস্তাদের অনুচর শীতলচাঁদ আন্দুকে জ্বালাইবার অভিপ্রায়ে নষ্টামি করিয়া বলিল, "জানেন সিংহজী, এই পালওয়ানের ভারি সখ আপনাদের লড়ায়ে কাজ নেয়!"

উৎসাহিত হরকিষণ বলিল, "সত্যি নাকি?"

হাসিহাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া ওস্তাদজী বলিলেন, "হ্যাঁ কথাটা মিছে নয়, কিন্তু এখন সে সব খেয়াল চুকে গেছে, না আন্দু?" আসল কথা স্নেহবৎসল ওস্তাদ, আন্দুর এসব খেয়াল মোটে পছন্দ করিতেন না, যুদ্ধোৎসাহ ওস্তাদের বাঞ্ছনীয় নহে, তিনি চান আন্দু আন্দুই থাকিবে।

শীতলচাঁদের উপর কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া আন্দু বলিল, "শোনেন কেন? এটা মহা পাজি।"

চোখ টিপিয়া শীতল বলিল, "শোনেন কেন ?—সেই জন্যে তুমি আজও বিয়ে কর্‌লে না, লড়ায়ে যাবার মতলব তোমার নেই ?"

মহাদেব মিশ্র আর একটু রসান লাগাইয়া বলিল, "তুমি ত এতদিন কানপুর চলে যেতে, তোমার সাহেব শুধু তোমায় আটকে রেখেছেন বইত নয় !"

আন্দু মহা বিরক্ত হইয়া বলিল, "আঃ থাম না।"

হরকিষণ একদৃষ্টে আন্দুর মুখপানে চাহিয়া ছিল, এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি সত্যি লড়ায়ে যেতে চাও ?"

অকস্মাৎ সঙ্কোচের পর্দা সরাইয়া পূর্ণ আশায় আন্দুর চক্ষুদুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আন্দু আবেগের সহিত কি বলিতে উদ্যত হইল, কিন্তু আসন্ন বিপদ বুঝিয়া ওস্তাদ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিল, "আরে না না ভাই, ও ছেলেমানুষের কথায় কান দিও না, আমাদের আন্দু আমাদেরই থাক, বাপ পিতামো'র নাম খুইয়ে, কি ছাই হানাহানির ব্যবসা শিখ্‌তে যাবে ? আন্দু লড়াই কর্‌তে গেলে আমাদের রোগে-শোকে সেবাশুশ্রূষা কর্‌বে কে ? না কাজ নেই, এই ভাল।"

অনেকগুলো মনের কথা, একসঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া, আন্দুর ঠোঁটের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু পিতৃস্থানীয় ওস্তাদের ব্যগ্র আপত্তির উপরে সেগুলা ব্যক্ত করা অসঙ্গত বিবেচনায় সব কটাকে দমন করিয়া আন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "লড়ায়ের কাজে কি বাপদাদার নাম খোয়া যায় ? মরণ তো আছেই, আমি নামের জন্যও লড়ায়ে যেতে চাই না, টাকার জন্যও যেতে চাই না, আমি শুধু যেতে চাই—" আন্দু থামিল।

হরকিষণ উৎসুক হইয়া বলিল, "তুমি শুধু কি জন্যে যেতে চাও ?"

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া, আন্দু একটু জোরের সহিত বলিল, "আমি ?—আমি লড়ায়ে যেতে চাই শুধু লড়াইয়ের জন্যে !"

উৎসাহভরে আন্দুর পিঠ ঠুকিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে হরকিষণ বলিল, "ঠিক ঠিক, লড়ায়ে ঢুক্‌তে হয় ত শুধু লড়াইয়ের জন্যে। লড়াই ধনেরও নয় মানেরও নয়,—লড়াইয়ের দাম শুধু লড়াই ! এই ধরগে কুস্তি, কুস্তি কি ব্যবসার জিনিস ? না সখের জিনিস ? যে ব্যবসার জন্যে, পয়সার খাতিরে কুস্তি শিখ্‌তে আসে, তার উচিত আলু পটল বিক্রির কসরৎ শেখা !..."

হরকিষণ ঝোঁকের মাথায় অনেক কথা বলিয়া চলিল। ওস্তাদের সারা চিত্ত কিন্তু ঐ সর্ব্বনেশে লড়াইয়ের উৎসাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তিনি এ অভিনয়ের যবনিকা এইখানেই পতন করাইবার জন্য—আন্দুর :ধূল্যবলুণ্ঠিত গামছাখানির প্রতি অকস্মাৎ অচিন্তনীয় সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, সুগভীর করুণায় বলিলেন, "আহা আন্দু, তোমার গামছাটা যে ধূলোয় লুটোপুটি খাচ্ছে, তুমি চান কর্‌তে যাও।"

গামছাটা তুলিয়া আন্দু বলিল, "এই যে যাই।"—তাহার পর হরকিষণের পানে ফিরিয়া একটু আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি কদিন এখানে থাক্‌বেন ?"

হরকিষণ বলিল,—"বেশী নয়, দিন-চার।"

শীতলচাঁদ মাথা নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "ততদিনে তুমি লড়াইয়ের হাল হদিস্ সব মুখস্ত করে নিতে পার্‌বে।"

প্রত্যুত্তরে আন্দু শীতলের পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইল। মহাদেবমিশ্র আস্তিন গুটাইয়া একটা পাকা লড়াইয়ের উদ্যোগ করিতেছে দেখিয়া ওস্তাদ হাসিয়া বলিলেন, "এখন নয় বাবা, আন্দু আগে 'আসনান্' করে আসুক।"

আন্দু বলিল, "আপনারা বস্‌বেন না ?"

ওস্তাদ বলিলেন, "না বাবা, কাল বলখেলার মাঠে খেলা হবে, অনেক লোককে বল্‌তে আছে, সিংহজী তোমায় কখনো দেখেন নি বলে মাত্র আলাপটা করাতে তোমার কাছে একবার এসেছিলুম, এখন তবে যাই।"

ওস্তাদ অগ্রসর হইলেন। আন্দুর হাত নিজের মুষ্টির মধ্যে পূরিয়া বিরাটকায় হরকিষণ সিং গম্ভীর মুখে বলিল, "তোমার সঙ্গে আলাপের আমার অনেক বাকী রইল, মনে রেখ। আমি তোমার জন্যে বোধ হয় আবার শীঘ্রই ভাগলপুরে আস্‌ব! কাল কিন্তু আমার সঙ্গে তোমায় 'পনের মিনুট্‌ বি' খেল্‌তে হবে! রাজী ?"

স্বীকার অস্বীকারের কোন লক্ষণই না দেখাইয়া আন্দু শুধু হাসিতে লাগিল। মহাদেব ও শীতল অত্যন্ত খুসী হইয়া চোখ টেপাটেপি করিয়া, প্রচুর হাস্যপরিহাসে হরকিষণ যে আন্দুকে ঠিক জব্দ করিয়াছেন, এই কথাটা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়া আন্দুর ধৈর্য্য রক্ষা অসম্ভব করিয়া তুলিল। ওস্তাদ মাঝে পড়িয়া, তাহাদের টানিয়া লইয়া গেলেন। আন্দু নিষ্ফল মুষ্টি শূন্যে উঁচাইয়া, তাহাদের ভবিষ্যতে প্রাপ্তির সম্ভাবনা বুঝাইয়া হাসিতে হাসিতে গন্তব্য পথে ফিরিল।

অকস্মাৎ কোথা হইতে দমকা বাতাসের মত পরিমল ছুটিয়া আসিয়া লাফাইয়া আন্দুর গলা ধরিয়া ঝুলিয়া পড়িয়া মহা আব্দার জুড়িয়া দিল। সে এত দ্রুতস্বরে কথা কহিতেছিল যে আন্দু তাহার একবর্ণও বুঝিল না। বিস্মিত হইয়া বলিল, "কি হয়েছে ?"

পরিমল বলিল, "কাল তুমি খেলার সময় বাবাকে ব'লে আমায় স্কুল থেকে নিয়ে যাবে কি না বল।"

পরিমল কথাটা কোথা হইতে শুনিল অনুসন্ধান করিয়া জানিবার অবকাশ হইল না, তাহার হস্ত হইতে সদ্যপরিত্রাণ লাভের জন্য, আন্দু পুনঃ পুনঃ আশ্বাস দিয়া পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সে কিছুতেই মানিবে না, শপথ করাইবার জন্য বিষম হাঙ্গামা করিতে লাগিল। বিপন্ন আন্দুর অনুনয় বিনয় সমস্তই সজোরে অগ্রাহ্য করিয়া সে নিজের জেদ ধরিয়া রহিল। এদিকে আন্দুও প্রতিজ্ঞা করিতে অসম্মত; শেষে দুরন্ত বালক চেঁচাইয়া বলিল, "দিদি, তুমি বলে দাও না।" চমকিত আন্দু চাহিয়া দেখিল দ্বিতলের রৌদ্রনিবারক পর্দ্দার পাশ হইতে একখানি সুন্দর মুখ সরিয়া গেল। সর্ব্বনাশ! তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত কথাবার্ত্তাই তো ঐ অন্তরালবর্ত্তিনী শুনিয়াছে! হয়ত হরকিষণের সেই অতর্কিত আক্রমণের পরিণামটাও দেখিয়াছে! ছিঃ ছিঃ! আন্দুর দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল, সে সবলে পরিমলের হাত খুলিয়া তাহাকে সুদ্ধ লইয়া স্নানের ঘাটে চলিয়া গেল।

আহারান্তে আন্দু আড্ডায় হরকিষণের সহিত গল্প করিতে যাইবে বলিয়া জুতা জামা পরিতেছে, এমন সময় বর্গীর হাঙ্গামার মত পরিমল আসিয়া মহা উৎপাত বাধাইল সেও আন্দুর সহিত যাইবে। আন্দু অনেক বুঝাইল, কিন্তু সে কিছুই মানিল না। ত্যক্ত হইয়া আন্দু বলিল, "মাইজীর হুকুম নিয়ে এস।" পরিমল টলিবার পাত্র নহে, সে ধরিয়া বসিল, "তুমি মার কাছে চল।"

আন্দু বিস্তর আপত্তি করিল। কিন্তু না-ছোড়বান্দা পরিমল তাহাকে অকুতোভয়ে টানিয়া লইয়া চলিল। সিঁড়ির পরে বারান্দায় উঠিতেই সরসীর দেখা পাওয়া গেল। সে আন্দুকে না-ছোড়বান্দা ছোড়দার কবলিত দেখিয়া নিতান্ত দয়ার্দ্র হইল, এবং ছোড়দার অন্যায় আব্দার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া বলিল, "তুমি চলে যাও তো, ওর কথা কখ্খোনো শুনো না।"

আজ্ঞাটি প্রতিপালন বড় সহজ ব্যাপার নহে। বিপন্ন আন্দু বেশ বুঝিল, এই দুর্দ্দমনীয় লোকটি উচ্চ শাসনালয়ের আদেশ ব্যতীত কিছুই মানিবে না। অগত্যা সে সরসীকে বিনয় করিয়া কহিল, "মাইজী সাহেবকে একবার ডেকে দাও খুকু—"

খুকু যদিচ আন্দুর নিকটে অনেক অসঙ্গত 'ফাই-ফর-মাসের' দরুণ সবিশেষ কৃতজ্ঞ আছে বটে, কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে আন্দুর সহিত ছোড়দার কাজের যোগটা তাহার চিত্তের সমস্ত কৃতজ্ঞতার সলিলটুকু বিদ্বেষের রুক্ষ বায়ুর সহযোগে বাষ্পাকারে উড়াইয়া দিল। সে প্রাণপণ বেগে মাথা নাড়িয়া বলিল, "মা? মা এখন কিছুতেই আস্তে পার্বেন না। মার কাছে মাদ্রাজী কাপড় বিক্রী কর্ত্তে এসেছে, তিনি বলে এখন তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত রয়েছেন, এখন আস্বেন কি করে—"

পুনশ্চ অনুরোধের আশঙ্কায় আবশ্যকীয় কর্ম্মের অনুরোধের অসম্ভব ব্যস্ততায় সরসী দ্রুতপদে চলিয়া গেল; মনে মনে অবশ্য ভরসা রহিল যে আন্দুর মত নিরীহ জীব তাহার কৃতঘ্নতার জন্য কিছুমাত্র অনুতপ্ত হইবে না। যাহাই হউক, সরসীর ব্যবহারে পরিমলও কিছুমাত্র নিরুদ্যম না হইয়া আন্দুকে টানিয়া লইয়া চলিল। পরিমল তাহাকে সত্যই বিপদে ফেলিয়াছে।

যে হলঘরখানার মধ্য দিয়া কর্ত্রীর ঘরে যাইতে হয়, সেই গৃহের সম্মুখে আসিতেই দেখা গেল, লতিকা কৌচে আড় হইয়া গালে হাত দিয়া রাজনৈতিক-কায়দায় গভীর ভাবনা ভাবিতেছে। আন্দু দ্বারের পাশে থমকিয়া দাঁড়াইল, একটু বিশেষরকম শব্দ করিয়া হেঁট হইয়া জুতা খুলিতে

লাগিল। লতিকা গলা বাড়াইয়া চাহিতেই দ্বারান্তরালবর্ত্তী আন্দুর সহিত চোখোচোখি হইল। সে উঠিয়া টেবিলে হেলান দিয়া দাঁড়াইল। পরিমলের সহিত আন্দু নতশিরে কক্ষে ঢুকিল। লতিকার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া একটু উত্তেজনার সহিত চলিল, বলিল, "কি হয়েছে পরিমল?"

পাছে দিদি আবার কিছু ফ্যাসাদ বাধায় এই ভয়ে পরিমল সংক্ষেপে বলিল, "আমি আন্দুর সঙ্গে বেড়াতে যাব।"

দ্বিতীয় কথার অবসর হইল না, তাহারা কক্ষ অতিক্রম করিয়া গেল। লতিকার মনের মধ্যে অজ্ঞাত প্রদেশে এক সুপ্ত সমুদ্র অকস্মাৎ সবেগে উছলিয়া উঠিল। অধীরতায় লতিকার কপালের শিরা দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল। সে শ্লথ শীতল হস্তে, পেনের ডগে করিয়া, বাতিদানের পোড়া মোমগুলা তুলিতে লাগিল।

অবিলম্বে জননীর অনুমতি করিয়া আন্দুকে ছাড়িয়া দিয়া পরিমল কাপড়জামা পরিতে চলিয়া গেল। আন্দু সসঙ্কোচে আবার সেই ঘরের ভিতর দিয়া ধীরপদে পার হইয়া চলিয়া যাইতেছিল। সহসা মুখ তুলিয়া যথাসাধ্য সহজভাবে লতিকা বলিল,—"যে-লোকটি ও-বেলা এসেছিল সে কি শিখ?"

আন্দু দাঁড়াইল, নতদৃষ্টিতে বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কি নাম তার?"

"আজ্ঞে হরকিষণ সিং।"

"কাল তুমি তার সঙ্গে খেলা কর্‌বে?"

কুণ্ঠাকাতর আন্দু প্রাণপণে জবাব যোগাইল, "আজ্ঞে বল্‌তে পারি না, এখনো ঠিক করতে পারিনি।" আন্দু দুইপদ অগ্রসর হইল, লতিকা হঠাৎ গভীরস্বরে বলিল, "তুমি কি পল্টনে যেতে চাও?"

পল্টনে যাওয়ার কথা লইয়া ইঁহারা সুদ্ধ নাড়াচাড়া আরম্ভ করিয়াছেন! আব্দু বিষম থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া হঠাৎ চোখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল, লতিকার চক্ষে আনন্দ রহিয়াছে, উৎসাহ রহিয়াছে, আর রহিয়াছে, এক কোণে একটু কোমল মোহমুগ্ধতার চিহ্ন!

আব্দুর মুখ লাল হইয়া উঠিল। শুষ্কহাসি হাসিয়া লতিকার কথার জবাব না দিয়া টুপী তুলিতে ভুলিয়া গিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল! আর লতিকা?—সে স্পষ্টশব্দিত হৃদ্‌পিণ্ডটা দুই হাতে চাপিয়া চেয়ারে বসিয়া চক্ষু মুদিল, তাহার মনে হইল, সমস্ত আইন-কানুন-নিয়ম বাঁধন ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া মরণোন্মাদ রক্তকেন্দ্র বক্ষের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়াছে, কি ভয়ঙ্কর!

৯

✓ সন্ধ্যার পর আলোকোজ্জ্বল কক্ষে বসিয়া জ্যোৎস্না সরসীকে তাহার পাঠ্য পড়াইতেছিল। ওদিকের নির্জ্জন ঘরে লতিকা বিকাল হইতে মাথা ধরিয়াছে বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছে,—সময়টি অবশ্য নিদ্রার পক্ষে প্রশস্ত নহে, তবে অসুখের পক্ষে সবই সম্ভব। কয়দিন হইতে জ্বরের ছুতায় লতিকা নিজের আহার নিদ্রা ভ্রমণ ইত্যাদি সম্বন্ধে এমনি আশ্চর্য্য নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল, যে বাড়ীর কেহই তাহার নাগাল ধরিতে পাইতেছে না,—সে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ভাবে স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় দিন কাটাইতেছে। বাড়ীর লোকদের প্রতি তাহার ব্যবহারেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু সে চিরদিনই রুক্ষ-প্রকৃতির একগুঁয়ে মানুষ, কেহই বড় একটা তাহার বাড়াবাড়ি আচরণগুলা গণনীয় বলিয়া ধরিতেছেন না। তা ছাড়া লতিকার বৈপরীত্য জ্যোৎস্নার পক্ষে বেশী

ক্লেশকর হইতেছে বুঝিয়া, স্নেহময়ী শান্তস্বভাবা জননী কন্যার ব্যবহারগুলার উচ্ছৃঙ্খলতা যথাসাধ্য কাটিয়া ছাঁটিয়া স্বাভাবিক সহজ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। এবং আহত ক্ষুব্ধ জ্যোৎস্না বিমন বিব্রত হইয়া স্পষ্ট বুঝিয়াছে, শুধু জননীর উৎপীড়নের জন্যই লতিকা এমন ঘোরতর রূপে অবাধ্যতা আরম্ভ করিয়াছে। তাহার অসন্তোষের সূত্র যে কোথায়, তাহা কিন্তু কেহই অনুভব করিতে সমর্থ নহে, বাস্তবিক তাহা অনুভব করাও অসম্ভব।

বারান্দায় যথেষ্ট আলোক থাকা সত্ত্বেও সিঁড়ির দ্বারে উঠিয়া চৌকাঠে হুঁচট্ খাইয়া অত্যন্ত ব্যস্তভাবে একজন কক্ষে ঢুকিল! জ্যোৎস্না সবিস্ময়ে দেখিল ব্যগ্র ব্যাকুল মুখে লতিকা! ভীতি-উত্তেজনায় তাহার মুখ চোখ এমনি অস্বাভাবিক ভাব ধারণ করিয়াছে, যেন সে এখনি কাহাকে খুন করিয়া আসিল। লতিকার অবস্থা দেখিয়া জ্যোৎস্না উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "তুমি নীচে ছিলে নাকি?"

লতিকাও কক্ষে ঢুকিয়া অকস্মাৎ দুইজনকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া যেন হতভম্ব হইয়া গেল। তাহার বোধ হয় এ কক্ষে আসার অভিপ্রায় ছিল না, হঠাৎ তাড়াতাড়িতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্নার প্রশ্নের উত্তরে প্রবল মাত্রায় চমকিয়া বিবর্ণ মুখে বলিল, "হাঁ—না, আমি এই নীচে গেছলুম।"

সহসা দিদিকে আসিতে দেখিয়া সরসীর গলার স্বর অনেকটা নামিয়া গেল। সে বইয়ের উপর যথাসাধ্য ঝুঁকিয়া জড়াইয়া জড়াইয়া ইংরেজী-পড়া উচ্চারণ করিতে লাগিল। জ্যোৎস্না বলিল, "তোমার কি অসুখ কচ্ছে?"

লতিকা বিমূঢ়ার মত হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "না।"—তারপর

আত্মসংবরণ করিয়া ত্রস্ত স্বরে বলিল, "হাঁ শরীরটে বড় খারাপ হয়েছে—" সে আলোর দিকে পিছন করিয়া জ্যাকেটের হুক্ খুলিতে লাগিল। লতিকার মনে হইতেছিল, সে এখান হইতে ছুটিয়া চলিয়া যায়, কিন্তু ইহাদের চোখের অন্তরালে যাইবার চেষ্টা করিলে, নিজেকে ইহাদের চোখে যে আরো বেশী করিয়া ধরাইয়া দেওয়া হইবে, সে সম্বন্ধেও তাহার লেশমাত্র সংশয় ছিল না; তাই নিজের অতর্কিত-ত্রস্ত আগমনটা কাজের অছিলায় ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি জামাটা খুলিয়া থামকা আনলায় রাখিল। একটা শাল টানিয়া আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া কৌচে অর্দ্ধ-শায়িতভাবে শয়ন করিল। সরসীর পাঠের অবকাশ হইতে তাহার দ্রুত উত্তেজিত নিশ্বাসের পরিষ্কার শব্দ শুনা যাইতে লাগিল। লতিকার মনে হইল তাহার সন্তর্পণে ত্যক্ত নিশ্বাস লইয়া শূন্যে অশরীরিগণ তীব্র বিদ্রূপে বিশ্বময় অট্টহাস্য ছড়াইয়া বেড়াইতেছে। সে আপনার দৃপ্ত অধীরতার সহিত যুঝিতে যুঝিতে হাঁফাইয়া উঠিল।

দিদির নিস্তব্ধতা সরসীর কাছে মহাবিভীষিকার মত লাগিল, তাহার পড়া কেবলই মুখে আটকাইতে লাগিল। অতি কষ্টে খানিকটা সময় অতিক্রান্ত করিয়া, সে পড়া বন্ধ করিল। আস্তে আস্তে ছড়ান বইগুলি গুছাইতে গুছাইতে অত্যন্ত লঘুস্বরে জ্যোৎস্নাকে বলিল, "আজ থাক জ্যোৎস্না-দি, গ্রামারের পড়াটা কাল ছোড়্দাকে দেখিয়ে নেব।"

সরসী সরিয়া পড়িলে জ্যোৎস্নাকে নিতান্তই একা থাকিতে হয়, ঘরে মানুষ আছে অথচ কথা নাই, সে অবস্থা বড় সঙ্কটময়; জ্যোৎস্না সরসীকে পড়িবার জন্য একটু পীড়াপীড়ি করিল। কিন্তু সরসী আপাদমস্তক আবৃতা দিদির দিকে গোপনে ইঙ্গিত করিয়া অসম্মত হইল। বাস্তবিক দিদিকে সে মারাত্মক রকম ভয় করিত। সরসী উঠিয়া যাইবার উপক্রম

করিতেই জ্যোৎস্না তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বসিতে ইঙ্গিত করিল। কিন্তু আর তাহাদের কাহারও মুখে কথা ফুটিল না। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া সরসীর সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নাও ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

গ্রীষ্ম-রজনীর জ্যোৎস্নার রজতধারায় চারিদিক শুভ্রস্নাত; ঘরের আলোকের উষ্ণতা হইতে বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্না বড় স্নিগ্ধতা অনুভব করিল; দ্বিতলের বারান্দায় রেলিংয়ের উপর ভর দিয়া নীচে চাহিয়া দেখিল, নীচে লোকজনের ব্যস্ত কোলাহল খুব বেগে চলিতেছে। সে সরিয়া আসিয়া ছাদের দুয়ার খুলিয়া জ্যোৎস্না-পুলকিত নিস্তব্ধ ছাদে মুগ্ধ হৃদয়ে পদ-চালনা করিতে লাগিল।

কাল দাদাবাবু আসিবেন, কালই বেলা তিনটার গাড়ীতে সে কলিকাতা যাইবে। জ্যোৎস্না ভাবিতেছিল, আর কখনো ভাগলপুর আসা ঘটিবে কি না কে জানে, কিন্তু লতিকার অভাবনীয় আচরণগুলি তাহার চিরদিন মনে থাকিবে, কি দুর্জ্জয় কঠোর প্রকৃতি!

ভাবিতে ভাবিতে ছাদের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিল। সেখান হইতে চাকরদের টানা গৃহশ্রেণী দেখা যাইতেছিল। সর্ব্বপ্রান্তস্থ নিকটবর্ত্তী গৃহখানার উন্মুক্ত গবাক্ষপথ দিয়া আলোকময় গৃহের ভিতরকার কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল; জ্যোৎস্না দেখিল, প্রশস্ত বাতায়নপথে চিম্‌নি রাখিয়া, সেলাইয়ের কলের সামনে মাথায় হাত দিয়া এক গৌরসুন্দর যুবামূর্ত্তি নতশিরে বসিয়া আছে; আলোক মৃদু মৃদু বিকীর্ণ হইতেছে, তথাপি জ্যোৎস্নার চিনিতে বিলম্ব হইল না, এই যুবাই মোটর-চালক। জ্যোৎস্না সেখান হইতে চলিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দেখিল, যুবা আলোটি উজ্জ্বল করিয়া চিম্‌নি খুলিয়া অনাবৃত অগ্নিতে কতকগুলি

কাগজ ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল, চিম্‌নি আবার পরাইয়া দিতেই উজ্জ্বলালোকে উপবিষ্ট যুবার পশ্চাতে দণ্ডায়মান আর-এক মূর্ত্তি দেখিয়া জ্যোৎস্না বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, একি !

১০

পরিমলকে লইয়া আড্ডা হইতে আন্দু সকাল সকাল ফিরিয়া আসিয়া নিজের ঘরে গেল। বৈকালের শেষে ধনুকধারী আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল, লছমীভকত মাতুলালয়ে চলিয়া গিয়াছে। আন্দু খুসী হইল। ধনুকধারীকে বিদায় দিয়া, সে আলো জ্বালিয়া জামাগুলি সেলাই করিতে বসিল। গোটা দুই জামা সেলাই করিয়া একবার বাহিরে ঘুরিয়া আসিতে গেল, দেখিল রহিম মশলা পিষিতে বসিয়াছে, রন্ধনের উদ্যোগ সবই প্রস্তুত। আন্দু রহিমকে উঠাইয়া নিজেই মশলা পিশিয়া রন্ধনে লাগিল। রহিম, শেষকালে তাহাকে ঠেলিয়া উঠাইয়া দিল; আন্দু কাজ আর বেশী নাই দেখিয়া জামা দুটি শেলাই করিবার জন্য গৃহাভিমুখে চলিল। মৃদু মৃদু গান গাহিতে গাহিতে বারান্দায় উঠিয়াই মনে হইল কে যেন ত্বরিতপদে তাহার ঘরের দিক হইতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল; স্বল্পান্ধকারে আন্দুর অনুমান হইল স্ত্রীলোক; গান বন্ধ করিয়া আন্দু দ্রুতপদে ঘরে আসিয়া ঢুকিল! সত্যই কে আসিয়াছিল বটে, তাড়াতাড়িতে ঘরে শিকল দিতে ভুলিয়া, নিজের গুপ্ত আগমনের প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। গুপ্ত আগন্তুকের বুদ্ধি-ভ্রংশতায় আন্দুর ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটিয়া মিলাইয়া গেল, অজ্ঞাতে একটা তীক্ষ্ণ সংশয় অন্তঃকরণ উদ্বেলিত করিয়া তুলিল! আন্দু ঘরে ঢুকিয়া এদিক-ওদিক চাহিল, কোথাও কোন বৈলক্ষণ্য না দেখিয়া

অনেকটা আশ্বস্ত হইল, নিজের ভ্রম মনে করিয়া ঘটনাটা মন হইতে সরাইয়া আবার সেলাই করিতে বসিল।

কলটি টানিয়া সরাইতেই নীচে একখানা পুরু সাদা খামে তাহারই শিরোনামা-লেখা পত্র পাওয়া গেল। আন্দুর চক্ষের সমক্ষে জগতের মূর্ত্তি ঝাপ্‌সা হইয়া গেল; এ যে মেয়েলি হাতের অক্ষর। শঙ্কিত হস্তে খাম ছিঁড়িয়া পত্র উল্টাইয়া স্বাক্ষর দেখিল—সুধু একটি অক্ষর রহিয়াছে। মুহ্যমান আন্দু দেখিল, পত্রের প্রতি অক্ষরে লেখিকার আদ্যোপান্ত পূরা চেহারাটি স্পষ্ট দেদীপ্যমান!

অষ্টপৃষ্ঠা-ব্যাপী সুদীর্ঘ পত্র। আন্দু ঘৃণার ধাক্কায় আতঙ্ক সরাইয়া ধৈর্য্য ধরিয়া পত্রখানা পড়িতে লাগিল। চিঠিখানি যথেষ্ট সুরুচিপূর্ণ ভাষায় যথাবিহিত ঔপন্যাসিক বিধানে সুশ্রাব্য ভাবে লিখিত। আন্দুকে মানুষের মত মানুষ দেখিয়া লেখিকা তাহাকে বিবাহ করিতে চায়। কিন্তু চিঠি পড়িয়া আন্দুর মন সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধিক্কারে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

আন্দু বাতি কমাইয়া দিয়া, মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে বসিল।

নিজের প্রতি অলক্ষ্যে একটা ঘৃণার তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। ছিঃ ছিঃ, এমনি অসতর্ক কুণ্ঠাহীন স্বভাব লইয়া সে রমণী-সমাজের সংস্রবে বাস করিতেছে! নিজের অজ্ঞাতে এতদূর অসংযতভাবে অপরের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে? কি দুর্দ্দৈব!

আন্দুর মনে পড়িল সে আজই প্রাতঃকালে লছমীভকতকে কত সদুপদেশ দিয়াছে,—আজই সে পথের ধূলায় প্রাণের আনন্দ ছড়াইয়া আনন্দের আবেগে পূর্ণ হৃদয়ে জোর গলায় গাহিয়াছে,—

"তোমার নয়নে নয়ন রাখি
চলিব তোমার পথে!"

আন্দু চমকিয়া উঠিল, একটা শুভ্র সান্ত্বনার আলোকে অন্তরের সমস্ত অন্ধকার কাটিয়া গেল,—ঠিক ঠিক, এ যে বিধাতার হস্ত হইতে আসিতেছে —জীবনপরীক্ষার প্রশ্নপত্র।

হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত নির্দোষ ব্যক্তি চরম বিচারে মুক্তিলাভ করিলে বন্দীর যেমন আনন্দ হয়, তেমনি মধুর নিঃশঙ্ক আনন্দোৎসাহে আন্দুর চিত্ত ভরিয়া উঠিল। অন্তরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার সমস্ত অসুস্থতা দূর হইল। পূর্ণ আশ্বাসে, অন্তরস্থ বিচারকের চরণে মাথা নত করিয়া, আন্দু মনে মনে বলিল, তোমার হস্ত হইতে যাহা আসিয়াছে তাহাই আমার শিরোধার্য্য, তোমার প্রশ্নের উত্তর তোমার চরণের উদ্দেশে উৎসর্গ করিব।—আমার অভিমান ক্ষমা কর।

শান্ত হইয়া বাতি উজ্জ্বল করিল, চিম্‌নি খুলিয়া চিঠিখানি ছিঁড়িয়া পুড়াইয়া ফেলিয়া দিল। তাহার মনের মধ্যে একটা উচ্ছ্বল-আনন্দ-সঙ্গীতের স্রোত উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল। সে নিশ্চিন্ত হইয়া হাতের কাজটুকু সারিতে বসিল, জগতের কোথাও কোন সুরে যেন এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নাই।

ছু'টি স্কন্ধে অকস্মাৎ অপরিচিত কোমল হস্তের স্পর্শ লাভে আন্দু চমকিয়া লাফাইয়া উঠিল।

আন্দু কক্ষ ছাড়িয়া উর্দ্ধশ্বাসে বারান্দা পার হইয়া, গেটের বাহিরে খোলা ময়দানে আসিয়া সটান নির্জ্জীবভাবে শুইয়া পড়িল। চন্দ্রালোকের দিকে চাহিয়া আন্দুর বড় দুঃখ হইল, আহা, এমন সুন্দর পৃথিবীর মাঝে, মানুষগুলোর প্রাণ এত কুৎসিত কেন? দোহাই পরমেশ্বর! মানুষকে মানুষের গৌরব ভুলিতে দিও না!

অবিলম্বে মালী আসিয়া পাশে ঘাসের উপর বসিল। আন্দু উঠিয়া

বসিল। মালী বিদ্রূপের হাসিতে চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "কি ভাই, ভূত দেখেছ নাকি, লাফিয়ে ঘর থেকে চলে এলে?"

আব্দু উদ্বিগ্ন হইয়া বলিল, "তুমি কোথা ছিলে মালী?"

রঙ্গরসিক মালী হাসিয়া হাসিয়া বলিল—"আমি যেখানেই থাকি না, তুমি কোথায় ছিলে?"

রুদ্ধ কণ্ঠে আব্দু বলিল, "কোথা ছিলে ঠিক বল,"—সে মালীর মণিবন্ধ দৃঢ় মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিল। মালী ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আঃ ছাড়, লাগে। আমি তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম, হঠাৎ তুমি ছিট্‌কে বেরিয়ে আস্‌ছ দেখে, থম্‌কে আকবরের ঘরের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়েছিলুম,—"

আব্দু উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "তারপর? আমার ঘরে গিছ্‌লে?"

মালী রঙ্গ করিয়া বলিল, "তুমি বেরিয়ে এলে তো আর কার কাছে—"

আব্দু রুষ্ট হইয়া কহিল, "বস্ চুপ।"—

মালী বলিল,—"কে এসেছিল মিঞা? ওধারের দুয়োর খুলে অন্দরের দিকে চলে গেল! অন্দর থেকে কেউ এসেছিল নাকি?"

তর্জ্জনীতে টানিয়া কপালের ঘাম ঝাড়িয়া ফেলিয়া আব্দু আশ্বস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, স্মিত মুখে বলিল, "হাঁ তিনি আমার মা।"

আব্দু চলিয়া গেল, মালী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

১১

গেটের বাম পাশে একটা শাখা-প্রশাখা-বহুল শিশু গাছ ছিল। মালীর কাছ হইতে উঠিয়া আসিয়া সেই গাছের তলায় দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া আব্দু গভীর চিন্তায় মগ্ন হইল। ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নার আলো

মাটির বুকে লুটাইয়া পড়িয়া নীরবে হাসিতেছিল। সারাদিনের গ্রীষ্ম গুমটের পর এতক্ষণে হাল্কা বাতাস ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া বহিতেছে।

চিন্তার উত্তেজনার আধিক্যে বসিয়া থাকা আন্দুর পক্ষে অসম্ভব হইল। উঠিয়া বাড়ীর চারিপাশে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্রমশঃ তাহার চরণের গতি অতিরিক্ত প্রখর হইয়া উঠিল। নিজের অবস্থা নিজের অনুভব করিবার শক্তি যদি তাহার থাকিত, তাহা হইলে এরূপ অকারণ ব্যস্ত ভাবে আপনাকে ঘুরিতে দেখিলে, সে নিজেই হাসিয়া অস্থির হইত।

ইতিমধ্যে রাত্রি কয়টা বাজিল, ও সেই প্রকাণ্ড বাড়ীখানা আন্দু কয়বার প্রদক্ষিণ করিল, তাহার হিসাব কেহই জমা-খরচের খাতায় টুকিল না। গাঢ় ভাবনায় ভ্রূকুটিবদ্ধ ললাটে, নিষ্পলক দৃষ্টিতে, গ্রীবা উঁচাইয়া ঝোঁকের ভরে চঞ্চল চরণে সে অবিশ্রাম ঘুরিতেছিল। আন্দু মনে মনে হিসাব খতাইয়া দেখিতেছিল, যে, ঘটনাস্রোতের বিরুদ্ধে সে কি করিয়া মাথাটা সোজা করিয়া রাখিবে! সাঁতার কাটিতে অনেকে জানে, কিন্তু মাঝ দরিয়ায় পাছে হাতপাগুলা অসাড় হইয়া পড়ে, সাঁতার কাটিবার আগে নিজের শক্তি খতাইয়া ঐটুকু বিবেচনা করা দরকার।

উচ্চ কণ্ঠের ডাকাডাকি শুনিয়া আন্দুর চমক ভাঙ্গিল। চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল—রহিম গেটের কাছ হইতে তাহাকে ডাকিতেছে। আন্দু গেটের নিকটে আসিতে রহিম বলিল,—"রাত যে বারোটা বাজ্‌তে চল্ল, খাবে কখন?"

কথাটা কানে গেল বটে, কিন্তু মুহ্যমান আন্দু তাহার মানে কিছুই বুঝিল না, চিন্তাকুল মুখে দুই হাতে সজোরে মাথার চুলগুলো ধরিয়া টানিতে লাগিল। রহিম বিস্মিত হইয়া বলিল,—"কি, রকম কি? নেশা টেশা কিছু করেছ নাকি? ও আন্দু খাবে কখন?"

সবেগে মাথাটা ঝাড়া দিয়া আন্দু বলিল, "খাওয়া ? ওঃ। না চাচা, আমার আজ খিদে নেই। তুমি খেয়েছ ত ? আচ্ছা শোও গে যাও, আমি খাবনা।"

রহিম ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল—"কেন, খাবে না কেন ?"

বিকৃত মুখে কপাল টিপিয়া ধরিয়া আন্দু বলিল, "বড় মাথা ধরেছে।"

রহিম অসন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"তা ধরবে না মাথা, ঠিক্ দুক্কুরে রোদের তেজে মাথার চাঁদি উড়ে যায়, তখন তুমি টো টো করে ঘুরে বেড়াও, নাওয়া খাওয়া কিছুরই বিলি বন্দেজ নেই। তারপর মগজের কাছে আলো জ্বেলে রেখে সন্ধ্যে থেকে কেবল সেলাই আর সেলাই !—তা যাও, ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? একটু ঘুমুলে সেরে যাবে, শোও গে যাও।"

রহিম চলিয়া গেল। তখন চৌধুরী-বাড়ীর সকলেই প্রায় নিস্তব্ধ হইয়াছে। আন্দু ফটক বন্ধ করিয়া বারান্দা পার হইয়া নিজের ঘরে গিয়া দরজা দিল। অন্ধকারে বিছানায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিল।

হঠাৎ বিছানা হইতে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া বাহিরে আসিল। আন্দু বারান্দার প্রান্তবর্ত্তী ঘরখানির সামনে আসিয়া শুষ্কবিকৃত কণ্ঠে ডাকিল, "ঠাকুরজী !"

ঘরে ঘরে চাকরেরা তখন সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কেবল ঠাকুরজীর ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছিল। দরজা জানালার ফাঁক দিয়া আলো দেখা যাইতেছিল, ঠাকুরজী অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পাকশালা হইতে সকলের শেষে বাহির হইয়া আসিয়াছেন।

কাশিয়া কণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া আন্দু আবার ডাকিল, "ঠাকুরজী ঘুমিয়েছেন কি ?"

এবার ভিতর হইতে জবাব আসিল। আন্দু বলিল, "দোরটা একবার খুলুন, একটু দরকার আছে।"

আলো জ্বালিয়া বিছানা পাতিয়া সমস্ত কাজ কর্ম্ম সারিয়া ঠাকুরজী মেজেয় বসিয়া ধীরে সুস্থে আয়েস করিয়া পান দোক্তা চিবাইতেছিল, আন্দুর ডাকে উঠিয়া দরজা খুলিয়া দেখিল, দুই হাতে চৌকাঠের শুর্সা ধরিয়া সামনে ঝুঁকিয়া ক্লান্ত ভাবে আন্দু দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরজী বলিল, "এখনো জেগে কেন, ভাই ?" ঠাকুরজী উড়িষ্যাবাসী।

আন্দু মুক্ত দ্বারপথে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "ঘুম হচ্ছে না। আপনি দোয়াত কলমটা একবার দিন।"

দোয়াত কলম দিয়া ঠাকুরজী বলিল—"বস্‌বে না একবার ?"

দ্বিরুক্তি না করিয়া দরজার পাশে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া আন্দু তৎক্ষণাৎ বসিয়া পড়িল, যেন সে বসিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিল। ঠাকুরজী মেজের উপর স্বতন্ত্র ভাবে বসিয়া বলিল, "পান খাবে ?"

আন্দু বলিল, "দিন্, সাজা আছে ? নেই ? তবে থাক থাক—"

"না, না, এখুনি সেজে দিচ্ছি" বলিয়া থলিয়ার ভিতর হইতে বটুয়া বাহির করিয়া ঠাকুরজী পান সাজিতে বসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া আন্দু বলিল—"ঠাকুরজী, আপনার ভাইঝির বিয়ে এখনো হয় নি ?"

একটী ছোট নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখিত ভাবে ঠাকুরজী বলিল—"আর ভাই বিয়ে ! ভাই মারা যাবার পর থেকে ভাইয়ের সংসার, নিজের সংসার, সবই আমার ঘাড়ে পড়েছে, পরের বাড়ী মাথা বিকিয়ে রইচি, যতক্ষণ এখান থেকে টাকাটি পাঠাচ্ছি ততক্ষণে হাঁড়ি চড়্‌ছে, এই ত অবস্থা ; এদিকে মেয়েটিও বড় হয়ে উঠেছে, বিয়ে না দিলেই নয়। কি যে করি কিছুই ভেবে পাচ্ছি নে।"

আন্দু সোজা হইয়া বসিল। "আচ্ছা বলুন দেখি কত টাকা হ'লে আপনাদের বিয়ে হয় ?"

ঠাকুরজী বলিল—"তা যে যেমন খরচ করতে পারে। আমাদের মত লোকেরও দেড়শো দুশোর কম ত হবার যো নেই,—"

হঠাৎ অত্যন্ত উৎসাহিত ভাবে আব্দু বলিয়া উঠিল,—"শুনুন, শুনুন, একটা কথা বলি।"

ঠাকুরজী পানে চূণ খয়ের দিয়া, তীক্ষ্ণধার ছোট স্বদেশী জাঁতিটিতে সুপারি কুচাইতেছিল; আব্দুর কথার ভঙ্গীতে কার্য্য স্থগিত রাখিয়া বলিল—"কি বল দেখি—"

"চৌধুরীসাহেবের কাছে আমার কিছু টাকা জমান আছে, জানেন বোধ হয়—"

হাঁ, তা জানি।"

"সেই টাকা আমি আপনাকে দিচ্ছি, আপনি দেশে গিয়ে ভাই-ঝিটির বে দেন।"

ঠাকুরজী চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল। পানে সুপারি দিয়া পান মুড়িয়া আব্দুর হাতে দিল, তার পর সে-সব সরঞ্জাম গুটাইয়া বটুয়ায় পূরিল, পিতলের বটুয়াটা আবার থলিয়ার মধ্যে পূরিয়া থলিয়ার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। তারপর পরস্পর সম্বদ্ধ হাত দুটি হাঁটুর উপর রাখিয়া, সোজাসুজি, আব্দুর দিকে ফিরিয়া বসিল, বলিল, "দেখ্‌ছ তো ভাই আমার হাল চাল, সে টাকা যে শীগ্রী শোধ কর্‌তে পার্‌ব তা তো মনেই হয় না,—"

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি আব্দু বলিল, "না, না, সেজন্য আপনার কিছু ভাবনা নেই, আমি আপনাকে তিন বচ্ছর সময় দিলুম, তিন বচ্ছর পরে যখন হোক আপনি দিবেন,—"

"তিন বচ্ছর কি, তিন মাস বল।"

"তিন মাস কেন?"

"তোমার নিজের বিয়ে থাওয়া আছে, সে সময় তো খরচ পত্র চাই।"

"আমার বিয়ে!"—আন্দু মৃদু হাসিল; "সে যাই হোক্ মোদ্দা আমি তিন বচ্ছরের মধ্যে আপনার কাছে টাকা চাইচি না এটা ঠিক।"

"ওঃ তাহলে আমার বড় উপকার করা হবে, ভাই। তিন বচ্ছরের মধ্যে আমি যেমন করে হোক অল্পে অল্পে তোমার দেনা শোধ করে আস্‌ব।"—ঠাকুরজীর স্বর কৃতজ্ঞতায় ভরা।

আন্দু যেন একটা কঠিন দুর্দ্দশার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিল আরামের সহিত আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিল, "বেশ্‌, কালই তা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"একটা কথা, সুদ কত করে?"

"সুদ আবার কি?—চৌধুরী-সাহেবের কাছে আমার টাকা অমনি জমা আছে, আপনার কাছেও তাই থাক্‌বে। ঠাকুরজী, আন্দু কি আপনার ছোট ভাই নয়?"

আন্দুর আব্‌দারের স্বরে ঠাকুরজীর চোখ ছলছল করিতে লাগিল এমন স্নেহমাখা সহানুভূতি, কোমলহৃদয় আন্দু ছাড়া আর কাহারো কাছে সে পায় না। একে এই দুঃসময়ে তাহার মত সঙ্গতিহীন দরিদ্রকে বিশ্বাস করিয়া এত অর্থ কর্জ্জ দেওয়া, তাহার উপর সুদ পর্য্যন্ত মকুব; কৃতজ্ঞতায় ঠাকুরজীর কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইয়া গেল, তাহার অক্ষম রসনা, উচ্চারণের উপযুক্ত ভাষা খুঁজিয়া পাইল না।

গতিক বুঝিয়া আন্দু তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। "মনে রাখ্‌বেন, তিন বছরের পর এসে যদি ও-টাকার তাগাদা না করি, তা হলে জানবেন ও-টাকা আপনারই, আমি আপনাকে দিয়েছি, হাজার হোক ছোট ভাই তো!"

হাস্যোৎফুল্ল মুখে শেষের কথা কয়টি বলিয়া আব্দু চট্ করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঠাকুরজী কিছু বলিবার অবকাশ পাইল না।

১২

নিজের ঘরে আসিয়া দরজায় খিল লাগাইয়া আব্দু আলো জ্বালিল। বিছানার নীচ হইতে এক টুকরা কাগজ বাহির করিয়া দোয়াত কলম লইয়া লিখিতে বসিল। বারান্দার ক্লক-ঘড়িতে টং করিয়া ১টা বাজিল।

আব্দু লিখিতে লাগিল,—

"শ্রীশ্রীহক পাক।
নবিজী রসুল।

শ্রীচরণে বহুৎ বহুৎ তস্‌লীম।—

কোন বিশেষ কারণ-বশতঃ অদ্য হঠাৎ আমি অন্যত্র চলিলাম, আপনাকে পূর্ব্বে জানাইতে পারি নাই, অপরাধ ক্ষমা করিবেন।

আমি কত দিনে আবার ফিরিয়া আসিব, এবং পুনরায় ফিরিব কি না, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, সে জন্য বিনীত নিবেদন এই যে, আমার স্বব্যবসায়ী বন্ধু পিয়ারী সাহেবকে অতঃপর আমার স্থানে নিযুক্ত করিবেন। সে বেকার বসিয়া আছে, তাহাকে খোঁজ করিবা মাত্র পাইবেন। আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, তাহার দ্বারা আপনার কাজ কর্ম্ম সুশৃঙ্খলে চলিবে! আমি জানি লোকটি খুব সৎ এবং সাহসী, সেই জন্যই ভরসা করিয়া তাহার কথা জানাইতেছি; অবশ্য আপনিও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

আমার দ্বিতীয় অনুরোধ—আমার পুরানো সেলাইয়ের কলটি খুকুমণি ক্রয় করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কলটি তাঁহাকে দিবেন! আমার মাহিনার দরুণ মজুত ১৬৫৲ টাকা যাহা আপনার নিকট আছে, তাহা ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে দিবেন, আমি ঐ সমস্ত টাকা তাহাকে দিলাম জানিবেন।

আমি এখন কোথায় যাইব, কি করিব, তাহার কিছুই স্থিরতা নাই, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছুই জানাইতে পারিলাম না, ক্রটি মার্জ্জনা করিবেন। আপনাদিগের যাহার নিকট যখন যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করিয়া বিস্মৃত হইবেন। আমি অনুতপ্ত চিত্তে সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

আজ্ঞানুবর্ত্তী—

আনোয়ার-উদ্দীন।"

চিঠিখানি ভাঁজ করিতে করিতে সুপ্ত পৌরবর্গকে স্মরণ করিয়া আন্দুর চক্ষু অশ্রুসজল হইল। তাড়াতাড়ি দুর্ব্বলতা দমন করিয়া পত্রখানি একটা শাদা খামে মুড়িয়া চৌধুরীসাহেবের নাম লিখিয়া বিছানার উপর রাখিল। তারপর আলোটা উজ্জ্বল করিয়া অসমাপ্ত জামা দুটি সেলাই করিতে বসিল। পরক্ষণে উঠিয়া চিঠির পশ্চাদ্দিকে লিখিল—"ধনুকধারী দুবের চারিটি জামা সেলাই করিয়া রাখিয়া চলিলাম, জামাগুলি যেন তাহার হস্তে পৌঁছে।"

আন্দু এবার নিশ্চিন্ত হইয়া সেলাই করিতে বসিল। তাহার পাশের তিনখানা ঘর, গাড়ী-ঘোড়া সম্পর্কীয় নানা রকম জিনিসে ভর্ত্তি থাকায় সে ঘরে কেহ শয়ন করিত না, সুতরাং কলের শব্দে কাহারই নিদ্রার কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইল না।

দেখিতে দেখিতে দুইটা বাজিয়া গেল। আন্দুর সেলাই তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তাড়াতাড়ি অবশিষ্ট কাজটুকু সারিয়া লইয়া জামাগুলি ভাঁজ করিয়া কাগজে মুড়িয়া ফেলিল। কলকাটি, মাপকাটি, সমস্তই গুছাইয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল। আলোটি হাতে লইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, রাত্রি তখন আড়াইটা।

আর ত বেশী সময় নাই, এবার যাইতে হইবে।—"যাইতে হইবে!" আন্দুর সমস্ত বুকটা গভীর বেদনায় আকুলভাবে হায় হায় করিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া বিছানায় বসিয়া, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের মত অধীর হইয়া আন্দু কাঁদিতে লাগিল। ওঃ কি মর্ম্মভেদী কষ্ট! সকলকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে? কতদিনের কত স্নিগ্ধ শান্তিময় স্মৃতিজড়িত,—বড় আদরের, বড় পূজনীয় ভাগলপুর! ভাগলপুরের মাটি যে সে মক্কার চেয়ে পবিত্র বলিয়া জানে, এর পঞ্জরে পঞ্জরে যে তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনাগুলি গ্রথিত প্রোথিত;—এ যে তাহার পিতামাতার সমাধিস্বর্গ!—হায় সে যে কতদিন নির্জ্জন গোরস্থানে পিতামাতার সমাধিমূলে মাথা লুকাইয়া অতীত দেবদেবীর অতীত করুণা নবীন ঘনিষ্ঠতায় অনুভব করিয়া ধন্য হইয়াছে, সেখানকার মাটিতে মাথা রাখিয়া সে যে কত দিন কত বেদনা কত গ্লানি মোচন করিয়া আসিয়াছে, আজ সেই পুণ্যতম শান্তির ক্ষেত্র হইতে—হা বিধাতা,—কোন্ অপরাধে তাহার এ নির্ব্বাসন-শাস্তি!

বহুকষ্টে ব্যাকুল উদ্বেলিত চিত্তকে শান্ত করিয়া আন্দু ধৈর্য্য ধরিয়া চক্ষু মুছিল। নাঃ! সে কাহারো উপর অভিমান রাখিবে না; নিজের তপ্ত যন্ত্রণার জ্বালায়, পরের উপর বিদ্বেষের বিরোধ সে বৃথা টানিবে না। এ সমস্ত তাহারই কর্ম্মফল—তাহা এ জন্মেরই হোক আর পূর্ব্ব

জন্মের হৌক ! তাহার নিয়তি তাহাকেই ভোগ করিতে হইবে, নিরীহ পর বেচারীর দোষ কি ?—

জোর করিয়া আপনাকে সাম্‌লাইয়া আন্দু উঠিল। প্রভু-প্রদত্ত ট্রাঙ্কটি খুলিয়া নিজের পরিধেয় জামা কাপড় কেতাবগুলি বাহির করিয়া পুঁটুলি বাঁধিল। সেদিন চৌধুরীসাহেব কলিকাতা গিয়া যে নূতন পোষাকটি তাহাকে ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন, সেইটি, এবং পুরাতন চালকের পরিচ্ছদটি আনলা হইতে লইয়া ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া সযত্নে ট্রাঙ্কে রাখিয়া দিল, ইহা তো আর তাহার দরকার নাই।

গত কল্য মাসকাবারি বেতনের দরুণ পনের টাকা কাটিয়া রাখিয়া চৌধুরীসাহেব তাহাকে কুড়ি টাকা হাতখরচ দিয়াছেন। সে এ পর্য্যন্ত তাহার এক পয়সাও খরচ করিতে পায় নাই ; প্রাতঃকালে আসিয়াই বালিশের নীচে কাগজে মুড়িয়া টাকাগুলি রাখিয়া দিয়াছিল, বাক্‌সতে রাখিবার অবকাশ হয় নাই, অথবা মনে পড়ে নাই। আন্দু টাকাগুলি বাহির করিয়া মোড়কসুদ্ধ জামার পকেটে রাখিয়া জামাটি পরিল। সাদা ফুলকাটা ছোট টুপীটি মাথায় চড়াইয়া জুতা পায়ে দিয়া গৃহকোণে ঠেসানো পিত্তল বাঁধানো বাঁশের লম্বা লাঠিতে মোটটি তুলিয়া কাঁধে ফেলিল। আল্লার নাম লইয়া অগ্রসর হইতেই "মচ্" করিয়া জুতার শব্দ হইল। আন্দু জুতা খুলিয়া হাতে লইয়া, আলো নিবাইয়া, বাহিরে আসিল, নিঃশব্দে বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিল !

বাহিরে দিব্য ঠাণ্ডা। চন্দ্রদেব ম্লান পাণ্ডুর মূর্ত্তিতে ক্লান্ত হইয়া পশ্চিম গগনে হেলিয়া পড়িয়াছেন। চোরের মত ভীত সন্তর্পণ পাদক্ষেপে প্রাঙ্গণে নামিয়াই আন্দু মুহূর্ত্তের জন্য থমকিয়া দাঁড়াইল।

সবেগে মুখ ফিরাইয়া আন্দু গেটের দিকে চাহিল। ফটক ডিঙ্গাইয়া

ঝুপ্ ঝাপ্ শব্দে ফটকের বাহিরে মোট লাঠি জুতা সমস্ত ফেলিয়া দিয়া, ফটকের মধ্যস্থ যোজক দণ্ডে পা দিয়া উঠিয়া নিজেও বাহিরে লাফাইয়া পড়িল। জুতা পায়ে দিয়া মোটটা পূর্ব্বের মত পিঠে ফেলিল।

তারপর একবার—একবার ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টিতে আন্দু বাড়ীখানির পানে ফিরিয়া তাকাইল। রুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া সবেগে বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল। অধীর হৃদ্‌পিণ্ডটা করুণ কাতরতায় বক্ষের মধ্যে আছাড়ি-বিছাড়ি করিতে লাগিল, উঃ! কি যন্ত্রণা!

তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আন্দু পথ ছাড়িয়া সোজা ময়দান পার হইয়া ওদিকের রাস্তায় উঠিয়া দ্রুতপদে চলিল। গাছপালা সব যেন আজ গভীর শোকে নিস্তব্ধ মলিন হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই চিরপরিচিত পুরাতন পথ ঘাটগুলিকে বিদায়ের শেষ দেখা দেখিয়া লইতেও আন্দু ভাল করিয়া পাইল না, সবই তাহার অশ্রুসিক্ত চোখে ঝাপ্‌সা ঠেকিতে লাগিল, রাত্রিশেষে জ্যোৎস্নাও তখন ঘোলাটে হইয়া আসিয়াছিল।

আন্দু স্তব্ধ মূর্চ্ছিত পথ অতিবাহন করিয়া চলিল। তাহার সারা বুকটা যন্ত্রণার পীড়নে মুহুর্মুহু ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল।

১৩

আন্দু ষ্টেশনে আসিয়া যখন পৌঁছিল তখন ঘোর-ঘোর ভোর। ষ্টেশনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল তখনো পশ্চিমের ট্রেন আসিতে আধ ঘণ্টা দেরী। তাইত, আধ ঘণ্টা কাটে কি করিয়া?—

একটু এদিক ওদিক করিয়া আন্দু টিকিট কিনিয়া, কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া ও দিকের প্লাট্‌ফরমে যাইতেছে। সিঁড়ি হইতে প্লাট্‌ফরমে

নামিতেই, তাহার পায়ে কি একটা বস্তু ঠেকিল; হেঁট হইয়া দেখিয়া জিনিষটা আন্দু কুড়াইয়া লইল। সেটা একটা মনিব্যাগ।

কে এখানে ব্যাগ ফেলিয়া গেল? অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে আন্দু একবার চারিদিকে তাকাইল,—কিন্তু ব্যাগ হারাইবার উপযুক্ত পাত্রের কিছুমাত্রই সন্ধান পাইল না। আন্দু ভাবিতে লাগিল, তাইত, কি করা যায়?

ক্ষণপরে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "যাঃ, ভালই হয়েছে, কি করে আধঘণ্টা কাটাই তাই ভাব্‌ছিলেম, ঈশ্বর একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছেন, দেখি ব্যাগের মালিকের সন্ধান করে, একান্ত না পাই, শেষ ষ্টেশন-মাষ্টারের জিম্মা করে দেওয়া যাবে।"

কর্ম্মপ্রিয় আন্দু কর্ম্মের উদ্যমে মর্ম্ম-বেদনা ভুলিয়া, উৎসাহিতপদে প্লাট্‌ফরমে আসিল। প্লাট্‌ফরমে রীতিমত সজীব চঞ্চলতা। মোট পুঁটুলি ঝোড়াঝুড়ি বাক্‌স ট্রাঙ্ক লইয়া, যাত্রীগণ ইতস্ততঃ বিশৃঙ্খল ভাবে ছড়াইয়া রহিয়াছে। দূর হইতে যাত্রীদের অবস্থান মন্দ দেখাইতেছে না, কিন্তু কাছাকাছি হইলে বিষম বিসদৃশ ঠেকিতেছে।

আন্দু আসিয়া একটা আলোক-স্তম্ভের নীচে পুঁটুলি ও লাঠিটি ফেলিল। তারপর—যতদূর দৃষ্টি চলে—উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, ষ্টেশনে অধিকাংশই ইতর শ্রেণীর হিন্দুস্থানী; ভদ্রপরিচ্ছদধারী কতকগুলি যাত্রী ছিল, তাহাদের একবার ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে আন্দু অগ্রসর হইল। প্রথমেই একজন সম্ভ্রান্ত ধরণের প্রৌঢ় হিন্দুস্থানীকে পাইল। কাছে গিয়া সেলাম বাজাইয়া আন্দু বলিল "জী,—আপ্‌কো মনিব্যাগ হ্যায়?" "জী"-চিহ্নিত লোকটা গঞ্জিকা-রঞ্জিত চক্ষু ঘুরাইয়া তাহার পানে চাহিল, মেজাজটা তখন দস্তুরমত রংচংয়ে ভোর ছিল, সুতরাং কথাটা বোধগম্য হইল না। দ্বিতীয় প্রশ্ন নিষ্প্রয়োজন বোধে আন্দু সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তাহার পরই একজন নব্যসভ্যতা-মণ্ডিত চশমাওয়ালা বাঙ্গালী-যুবকের পালা। যুবকটি শ্বশুরবাড়ীর ফেরৎ পিত্রালয় যাইবে, সুতরাং পরিচ্ছদের জাঁকজমক খুব। আন্দু কাছে গিয়া, পকেট হইতে বহুদিনের পুরাতন একটা পাইপ-সুদ্ধ সিগারেট বাহির করিয়া, পাইপটা খুলিয়া পুনশ্চ পরাইতে পরাইতে বলিল, "বাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে ?"

বাবু এপকেট ওপকেট হাতড়াইয়া দেশলাই বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন, আন্দু বুঝিল তাহার পকেটের জিনিসপত্র সবই যথাস্থানে আছে,—আন্দু সিগারেট ধরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। আসলে সে সিগারেট খাইত না, সুতরাং আলোক-স্তম্ভের অন্তরালে গিয়া দেয়ালের গায়ে ঘসিয়া সেটা নির্ব্বাপিত করিয়া ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের অনিশ্চিত সম্ভাবনায় পুনরায় পকেটে ফেলিল।

ব্রাউন রংয়ের বুট পরিয়া, চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়ে, টেরি এবং ছড়িযুক্ত এক ইংরেজীনবিশ হিন্দুস্থানী যুবক, প্রবল গাম্ভীর্য্যে প্লাটফরমের ধারে পাদ চালনা করিতেছিল। আন্দু তাহাকে গিয়া পাক্ড়াইল। সৌজন্যের সহিত বিনীত ভাবে বলিল, "দোস্ত সাহেব, আপ্‌কো মনিব্যাগ ঠিক রাখিয়ে, টিশন্ ভির এক আদমী-কো বেগ্ হেরায়া।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি দোস্ত সাহেব এই অপরিচিত লোকটির অযাচিত উপদেশে সন্ত্রস্ত হইয়া একবার বুক পকেটে হাত দিলেন, তারপর তাচ্ছিল্যভরে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। আন্দু দেখিল ব্যাগের জন্য এ লোকটির কিছু-মাত্র দুশ্চিন্তা নাই।

মনিব্যাগ রাখিবার উপযুক্ত যতগুলি লোককে আন্দু দেখিল, সকল-গুলিকেই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া প্রশ্ন করিয়া জানিল, ব্যাগের জন্য তাহারা কেহই ব্যস্ত নহে। বিফলপ্রয়াস আন্দু তথাপি হাল ছাড়িল না। ট্রেন

আসিতে আরো দশ মিনিট দেরী আছে দেখিয়া, সে পাঁচ মিনিট আরো ব্যাগের মালিককে খুঁজিতে মনস্থ করিল। নবোদ্যমে পুনরায় সেই আলোকোদ্ভাসিত কোলাহল-মুখরিত ষ্টেশনের আদ্যোপান্ত চাহিয়া দেখিল। তারপর দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

প্লাটফরমের পশ্চিমে কোলাহল-বিরল স্বল্পালোকিত স্থানে, দুইজন ইংরেজ-মহিলা পাদচালন করিতেছিলেন, একজন প্রৌঢ়া, অপরা তরুণী; সম্ভবতঃ মাতা কন্যা। সহসা আব্দু ব্যস্তভাবে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই শ্বেতাঙ্গনাদ্বয়ও দাঁড়াইলেন। আব্দু কুর্নিশ করিয়া কহিল, "মেম-সাহেব, আপ্‌লোক্-কো রূপেয়া ভাঙ্গানী চাহিএ।"

"নেহি"—মেম-সাহেবরা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

উদ্বিগ্ন আব্দু বলিয়া উঠিল, "নোট, নোট, ক্যাশ্ রূপেয়াকা নোট ভাঙ্গানী?"

"নোট"—মাতা, কন্যার মুখপানে চাহিলেন।

"ও, হ্যাঁ—তাতে অবশ্য সুবিধা আছে", কন্যা ইংরেজীতে বলিলেন। পরক্ষণেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া জামার ভিতর দিকে খুঁজিতে লাগিলেন। "যাঃ, কোথা গেল, কোথা গেল, আমার মনিব্যাগটা কোথা গেল"—কন্যা ত্রস্ত চকিত নয়নে ইতস্ততঃ চাহিতে লাগিল।

"ব্যাগ! সেকি, ব্যাগ নাই!"—মাতাও উৎকণ্ঠিত। আব্দুর মুখ প্রফুল্ল হইল।

"নিশ্চয় সে নিশ্চয় এই প্লাট্‌ফরমেই পড়ে গেছে, আমি সিঁড়ি পর্য্যন্ত সেটা দেখছি,"—

"যাঃ! চল চল দেখা যাক, এখন পাওয়া গেলে হয়।"

"ট্রেনটা বোধ হয় মিস্ কর্ত্তে হবে, সেটা কিন্তু ঠিক এইখানেই পড়েছে।"

"চল চল"—উভয়ে দ্রুতপদে চলিলেন।

"আপ্‌কো ব্যাগ হেরায়া মেম-সাহেব ?" আন্দু সুধাইল।

"হাঁ হাঁ ঢুঁড়কে দেখো, বিস্‌কো মিলেগা—"

"কসুর মাপ কিজিয়ে মেম-সাব, এই ঠো দেখ্‌নেকো মর্‌জি"—আন্দু বয়স্কার হাতে ব্যাগ দিল।

"হাঁ, হাঁ, এই আমার ব্যাগ, বহু ধন্যবাদ"—আনন্দোৎফুল্লা যুবতী, তাড়াতাড়ি মাতার হাত হইতে ব্যাগটা লইয়া খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার অভ্যন্তরে কয়েকখানি নোট, এবং দুইখানি ভাগলপুর হইতে টুণ্ডুলা জংসন পর্য্যন্ত রেলওয়ে টিকিট, এবং কয়েকটি টাকা ও দুটি সিকি—"সবই ঠিক আছে, লোকটাকে কিছু বখশীস্।"

"হাঁ অবশ্য"—মাতা ব্যাগ হইতে দুইটি টাকা তুলিয়া লইলেন।

আন্দু হাত ছয়েক দূরে সরিয়া গিয়া, একটা আলোকস্তম্ভে ঈষৎ হেলিয়া ঠেস্ দিয়া কোমরে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। মেম-সাহেব কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুমি এটা কোথা পেলে ?"

সবিনয়ে আন্দু বলিল, "সিঁড়ির নীচে পড়েছিল, মেম-সাহেব। প্লাট্‌ফরমের সকল যাত্রীকেই জিজ্ঞাসা করেছি, কারুর নয়, তাই আপনাদের ব্যাগ সন্দেহ করে টাকা ভাঙ্গাবার অছিলায় সন্ধান নিতে এসেছিলুম, মাফ করুন।"

মেম-সাহেব বলিলেন, "খুব ভাল, তোমার সততা প্রশংসনীয়, আমরা খুসী হয়েছি, এই টাকা দুটি—"

"মাফ করুন, মেম-সাহেব, আপনাদের খুসীতেই গরীবের আনন্দ, টাকা চাই না।"

"না না, আমরা তা হলে বড় দুঃখিত হব।"

"আপনার অনুরোধে আমি তার চেয়ে দুঃখিত হলুম। মা, টাকাই কি জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিস?"

"ধন্যবাদ, যুবক, তোমাব নাম?"—যুবতী মেম-সাহেব অগ্রসর হইয়া স্মিতমুখে প্রশ্ন করিলেন, "তোমার নাম?"

"আমার নাম শেখ আনোয়ার উদ্দীন।"

যুবতী নোটবুকে নাম টুকিয়া লইল। "তোমার বাড়ী কোথা?"

"পূর্ব্বে ভাগলপুরে ছিল, এখন নির্দ্দিষ্ট কোথাও নাই।"

"এখন কোথায় যাবে?"

"সম্ভবতঃ দিল্লী।"

"দিল্লী? কেন?"

"জীবিকা উপার্জ্জনে।"

"কি কাজ কর?"

"পূর্ব্বে দর্জ্জি ছিলাম, এখন মোটরকারের ড্রাইভারি করি।"

"ড্রাইভারি কর"—তরুণীর উজ্জ্বল নীলচক্ষু আনন্দে হাসিয়া উঠিল। অর্থসূচক দৃষ্টিতে কন্যা মাতার মুখপানে তাকাইলেন। মাতা বলিলেন, "শোনো, যুবক, আমি টুণ্ডুলা যাচ্ছি; যদি আমার দ্বারা কোন উপকার হয় তো বল, আমি করতে প্রস্তুত আছি, আমি সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।"

ভূমিস্পর্শ করিয়া আন্দু অভিবাদন করিল। সসম্ভ্রমে বলিল, "আপনার অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ, মেমসাহেব, আমি দিল্লীতে যাচ্ছি,—"

অধীর হইয়া ছোট মেমসাহেব বলিলেন, "তুমি যদি টুণ্ডুলা যাও, তা হলে, আমাদের দ্বারা তোমার ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা আছে,—"

"সেলাম, ঐ ট্রেন আস্‌ছে, আর দেরী নাই, ক্ষমা করুন"—আন্দু নিজের মোট লক্ষ্য করিয়া ছুটিল। যাত্রীর দল তখন যথেষ্ট ব্যস্ততার সহিত

মোটঘাট লইয়া উৎকণ্ঠিত কোলাহলে ট্রেনে উঠিবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিল। ছোট মেমসাহেব পিছন হইতে হাঁকিয়া বলিলেন, "তা হলে তুমি টুণ্ডুলা ষ্টেশনে নেমো, নিশ্চয় নেমো, বুঝলে ? নেমো।"

আন্দু সে কথা কানে তুলিল না। দ্রুতবেগে ভিড়ে মিশিয়া পড়িল।

ভীষণ শব্দে ষ্টেশন কাঁপাইয়া ঝাঁ ঝাঁ করিয়া ট্রেন আসিয়া পড়িল। একটা শৃঙ্খলাহীন হাঁকডাকের উচ্চ রোল পড়িয়া গেল। লোকজনের হুড়াহুড়ি, ছুটাছুটি, জিনিসপত্র নামান উঠান,—'কুলী' 'পান সিগারেট' 'পানিপাঁড়ে' 'খাবারওয়ালা' সব ক'টার চীৎকার আওয়াজ যুগপৎ জড়াইয়া, সারা ষ্টেশনটা সরগরম্ হইয়া উঠিল।

আন্দু তাড়াতাড়ি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিয়া বেঞ্চির উপর নিজের লাঠি ও মোটটা ফেলিল। তারপর নামিয়া আসিয়া উৎফুল্ল-বিক্রমে ছুটা-ছুটি করিয়া, অন্যান্য যাত্রীদের মোট পুঁটুলি অযাচিত ভাবে গাড়ীতে তুলিতে নামাইতে লাগিল। আন্দুর কল্যাণে অক্লেশে দলে দলে অক্ষম দুর্ব্বল শিশু বৃদ্ধ স্ত্রীলোক গাড়ী হইতে নামিতে ও গাড়ীতে উঠিতে লাগিল। একজন শীর্ণকায়া হিন্দুস্থানী রমণী একটা প্রকাণ্ড গাঁটরী মাথায় করিয়া ভিড়ের বেগে গাড়ীতে উঠিতে না পারিয়া অতি কষ্টে ছুটাছুটি করিয়া ঘুরিতেছিল। আন্দু তাড়াতাড়ি তাহার ভারি গাঁট্‌রীটা নিজের ঘাড়ে টানিয়া লইয়া, মেয়েদের কামরার দরজা খুলিয়া মোট-সুদ্ধ তাহাকে উঠাইয়া দিয়া, আবার অন্যত্র ছুটিল। উপকৃতা বৃদ্ধা দুই হাত তুলিয়া অপরিচিত যুবাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

মধ্যম শ্রেণীর একটা কামরার দরজা-গোড়ায় দুইজন কুলী একটা ট্রাঙ্ক লইয়া ঠেলাঠেলি করিতেছিল, কিছুতেই সেটা কামরার ভিতর তুলিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ আন্দু ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া, বিনাবাক্যে

এক ধাক্কায় সামনের কুলীটাকে সরাইয়া সবেগে দ্বিতীয় ধাক্কায় ট্রাঙ্কটা কামরার মধ্যস্থানে পৌঁছিয়া দিয়া আবার অন্যদিকে চলিল। হাসিতে হাসিতে, উদ্দেশে ওস্তাদকে অভিবাদন করিয়া মনে মনে বলিল, "কুস্তি শিক্ষার সার্থকতা এইখানে,—কাজের মাঝে।"

ট্রেনে উঠিবার সময় এক আরোহী ভদ্রলোকের হাত হইতে দৈব-ক্রমে একখানি বই লাইনের নীচে পড়িয়া গিয়াছে, ভদ্রলোকটি সাগ্রহে চার-পাঁচজন কুলীকে পুরস্কারের লোভ দেখাইয়া বইখানি তুলিয়া দিবার জন্য বারম্বার অনুনয় বিনয় করিতেছেন। কিন্তু ট্রেন তখন ছাড়ে-ছাড়ে হইয়াছে, সুতরাং প্রাণের ভয়ে সে সময় নীচে ঝুঁকিতে কেহই সাহস করিতেছে না। দূর হইতে তাহাদের ভাবগতিক দেখিয়া আন্দু সেখানে ছুটিয়া আসিয়া হাজির হইল। ভদ্রলোকটির কাতরোক্তি শ্রবণ মাত্রে অকুতোভয়ে তৎক্ষণাৎ মাটিতে বুক দিয়া শুইয়া হাত বাড়াইয়া অতিকষ্টে বইখানা তুলিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ট্রেন ছাড়িল। ভদ্রলোকটির হাতে বইখানা দিয়া, আন্দু কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ছুটিয়া আসিয়া, নিজের কামরার দরজা খুলিয়া ট্রেনে উঠিল।

পাদানিতে পা দিয়াছে, এমন সময় হঠাৎ অন্যদিকে নজর পড়িল। দেখিল তিনখানা গাড়ীর পর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার জানালা হইতে বুক পর্য্যন্ত বাহির করিয়া গাড়ীর পিত্তল-দণ্ড ধরিয়া ছোট মেমসাহেব ঝুঁকিয়া পড়িয়া ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন!

চোখোচোখি হইবামাত্র হর্ষবিকশিত নয়নে, তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠে মেমসাহেব বলিলেন, "টুণ্ডুলায় নাম্‌বে—টুণ্ডুলা জংসন।"

আন্দু গাড়ীতে উঠিয়া হাতল ঘুরাইয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তখন ট্রেন প্লাটফরম ছাড়াইয়াছে, চারিদিক ফর্শা হইয়া আসিয়াছে।
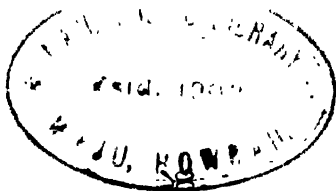
সেখ আন্দু

কাজের হুড়াহুড়ি যখন একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল, তখন আন্দু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া, বিক্ষিপ্ত চিত্তটাকে শৃঙ্খলাসূত্রে টানিয়া বাঁধিতে বসিল। আন্দু মনকে বুঝাইয়া কঠিন নির্ম্মম করিল। সে অতীতের জন্য,—অতীত সুখের জন্য স্বার্থপরের মত হা-হুতাশ করিবে না,—সে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য দৃঢ়ভাবে প্রস্তুত হইবে। ভগবান্ তাহাকে যে শক্তিকটা দিয়াছেন, সবকটাই সে কার্য্যের শানে তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল করিয়া লইয়া জটিল সংশয়াকুল জীবন-যাত্রাটা সহজ শান্ত করিবে। অসীম বেদনার মধ্য হইতে কঠিন সন্তোষ সবলে আকর্ষণ করিয়া পৌরুষের মর্য্যাদা সে সযত্নে বজায় রাখিবে। নিঃসম্বল নিরাশ্রয় হইয়া স্বেচ্ছায় অকুতোভয়ে সে যেমন পথে দাঁড়াইয়াছে, তেমনি সদর্পে স্বাবলম্বন ধরিয়া সে অদৃষ্টকে উপেক্ষা করিয়া যাইবে।

হঠাৎ আন্দুর মনে পড়িল কাল দ্বিপ্রহরের পর সে আহার করিয়াছে, তাহার পর আর জলস্পর্শ করে নাই; উদ্বেগ-আকুল চিত্তের দুরন্ত উৎক্ষেপ-বিক্ষেপে ক্ষুধা তৃষ্ণার অনুভবশক্তি এতক্ষণ মোটে অনুভূত হয় নাই; এখন কাজ নাই, তাই আলস্যের ঝোঁকে ক্ষুধা তৃষ্ণা তন্দ্রা সবাইকে মনে পড়িতেছে। আন্দু অভ্যাস-বশে পাদচালনার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু এখানে ঘুরিবে কোথা, এ যে জনপূর্ণ চলন্ত গাড়ী! আন্দুর চিত্ত-শক্তিটা এমনি একমুখী একগুঁয়ে, যে যখন যে-বিষয়টা ভাবিতে বসে, তাহারই তলায় গভীর ভাবে তখন ডুবিয়া যায়। এই প্রকাণ্ড গাড়ীভরা এতগুলো বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র প্রকৃতির লোকও এতক্ষণ তাহার দৃষ্টির কৌতূহল-শক্তি উদ্বোধিত করিতে পারে নাই। হঠাৎ সমস্ত গাড়ীটার পানে বিস্মিত

দৃষ্টিতে চাহিয়া আন্দু অবাক্ হইয়া গেল। আন্দুর বেঞ্চির সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া মোটে ঠেস দিয়া এক সৌম্যমূর্ত্তি হিন্দুস্থানী বৃদ্ধ অনেকক্ষণ হইতে প্রাতঃস্মরণীয় সংস্কৃত শ্লোকসমূহ আবৃত্তি করিতেছিলেন। আন্দু এতক্ষণ কান দেয় নাই, এখন কানে যাইতেই আন্দু সোজা হইয়া উন্মুখ নয়নে বৃদ্ধের পানে চাহিয়া বসিল। সংস্কৃতপ্রিয় ভবতারণের সংসর্গে পড়িয়া আন্দুর সংস্কৃত শাস্ত্রে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল, নিজের উদ্যমে সংস্কৃত শ্লোক ও কিছু কিছু শিখিয়াছিল ; সে প্রায়ই ভবতারণের কাছে গিয়া গীতা ও মোহমুদ্গরের সব্যাখ্যা শ্লোক শুনিত ; ভবতারণের কাছে সেও মধ্যে মধ্যে নমাজের রেকার মর্ম্ম, এবং কোরানের বয়েদ আবৃত্তি করিয়াছে। তাহাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মাঝে পরস্পরের ধর্ম্মের প্রতি সম্মানের ভাবটি বড় স্নিগ্ধ মধুময় ছিল।

সমস্ত গাড়ীর মধ্যে আন্দু এই বৃদ্ধের শান্ত মুখচ্ছবিতে একটি বিশেষ রকম মাধুর্য্য লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বৃদ্ধের চেহারায় সুপুরুষতার চিহ্নমাত্র ছিল না, দেখিতে তিনি নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু তাঁহার বার্দ্ধক্য-শ্লথ শরীরের মধ্যে এমনি একটি সৌম্য সহিষ্ণু মহানুভবতার জ্যোতি মৃদু শক্তিতে বিকীর্ণ হইতেছিল যে দেখিলেই ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়। বৃদ্ধের সহিত আলাপ করিবার জন্য আন্দু উৎসুক হইয়া উঠিল।

আন্দুর পিছন দিকের বেঞ্চিতেও কি একটা গল্প স্রোতের গোলমাল প্রবলভাবে চলিতেছিল, আন্দু ফিরিয়া সেদিকে চাহিল। দেখিল লাটুদার পাগড়ী মাথায় গোঁফ দাড়ি কামান, এক পণ্ডিত-গোছের ফোঁটা-পরা হিন্দুস্থানী মধ্য-বয়স্ক ব্যক্তি ঊষার আলোকে জানালার কাছে গিয়া এক-জনের করকোষ্ঠি দেখিয়া অনর্গল বকিয়া যাইতেছেন, আর লোকটা যেন নিতান্ত গো-বেচারীর মত 'হুঁ হাঁ' দিয়া যাইতেছে।

সে লোকটির কোষ্ঠিফল যথাবিহিত বর্ণিত হইলে আর একজন উঠিয়া আসিয়া হস্ত প্রসারণ করিল। আন্দু দেখিল, তিনি প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে যাহা বলিয়াছিলেন ইহাকেও প্রায় তদনুযায়ী বলিলেন, অধিকন্তু একটি সদ্য-সমাগত বিপদের প্রতিকারের জন্য শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিতে আদেশ করিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি আসিতে তাহাকেও ঠিক ঐরূপ ভাবে অতীত জীবনের কথা বলিলেন। লোকটা ভক্তি-গদ্গদ প্রাণে, অকুণ্ঠিত চিত্তে সমস্ত মানিয়া লইয়া নিজের স্থানে গিয়া বসিল।

আন্দুর কৌতূহল বাড়িয়া উঠিল, সেও উঠিয়া আসিয়া গণকের সামনে দাড়াইল, হাসিয়া বলিল, "আমি একবার হাত দেখাতে পারি কি ?—কিন্তু আমি মুসলমান।"

গণক-ঠাকুর দুই মুহূর্ত্তের জন্য আন্দুর পানে খর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর অবিশ্বাস্য ভাবে মাথা নাড়িয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তুমি আমায় ঠকাতে এসেছ ?—তুমি মুসলমান নও।"

গণক-ঠাকুরের জ্যোতিষ জ্ঞানের প্রাখর্য্যে আন্দু চমৎকৃত হইল। হাস্য সম্বরণ করিয়া অবিচলিত ভাবে বলিল, "হাঁ ঠাকুর, সত্যিই আমি মুসলমান।"

গাড়ীর লোকগুলা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। গণক-ঠাকুরের দম্ভ-কঠিন মুখমণ্ডল একটু নিষ্প্রভ হইল, বলিলেন, "বস, দেখ্ছি।"

আন্দু বসিয়া হাত বাড়াইল। গণক-ঠাকুর পুনরায় পূর্ব্বানুবৃত্তিরূপে যোগিনী দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রহ সংস্থান পর্য্যন্ত একই সুর ভাঁজিয়া গেলেন। তার পর বলিলেন, "তোমার ধনস্থানে বৃহস্পতি আছেন, যথেষ্ট অর্থাগম হবে, কিন্তু তুমি রাখ্তে পার্বে না,—"

আন্দু বিন্দুমাত্র উৎসাহ না দেখাইয়া বলিল, "আচ্ছা বিদ্যাস্থানে ?"

গণক ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া করকোষ্ঠি দেখিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বিদ্যাস্থানে বুধ, কিন্তু শনির কোপ আছে, সেজন্য উপস্থিত সময় পর্য্যন্ত তোমার কিছু হতে দিচ্ছে না, ভবিষ্যতে তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। বুদ্ধিতে কিন্তু বাপু তুমি অদ্বিতীয় লোক হবে, তা থেকেই ধনবান্ হবে।"

আন্দু হাসিল—"আচ্ছা, ধর্ম্মস্থানে কি দেখুন।"

গণক সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, "পরমায়ু যথেষ্ট আছে, আশী বছর পর্য্যন্ত ; ভাগ্যে দ্বি-পত্নী যোগ আছে। তোমার বয়স কত ?—"

আন্দু বলিল, "তেইশ বছর।"

গণক গম্ভীরমুখে বলিলেন, "শীঘ্রই তোমার পত্নীবিয়োগ-যোগ আছে, তবে এখনি ওর একটু প্রতিকার কর্‌লে মঙ্গল হবে, খরচ কর্‌তে পার্‌বে ?"

আন্দু অট্টহাস্য দমন করিয়া বলিল, "ঠাকুর, আমি যে অবিবাহিত।—"

ঠাকুর রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি কি জ্যোতিষ-শাস্ত্রকে ব্যঙ্গ কর্ত্তে চাও,—"

আন্দু সবিনয়ে বলিল, "আজ্ঞে না, সত্যই আমি অবিবাহিত।"

দর্শকগণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। গণক-ঠাকুর আন্দুর হাতের উপর ভ্রূকুটিবদ্ধ ললাটে অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিজের অভ্রান্ত গণনা-বিদ্যার আকস্মিক ভ্রমের তদন্তে নিযুক্ত হইলেন। আন্দু তাঁহার বিপদ দেখিয়া সদয় হইয়া বলিল, "আচ্ছা ঠাকুর, ধর্ম্মস্থানে কি রকম কি দেখ্‌ছেন ?"

ঠাকুর রেখা বিজ্ঞানের দুরূহ শ্লোকরাশি আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, "জীবনে তুমি দুবার সাংঘাতিক পীড়ায় ভুগেছ।"

আন্দু অস্বীকার করিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, একবার।"

"আরো একবার, তত বেশী না হোক, তবে তেমনি—"

আন্দু বলিল, "একবার নয়, অল্প ভোগ তিনবার ভুগেছি। আচ্ছা, সে যাক্, আপনি অতীতকে ছেড়ে দিয়ে ভবিষ্যৎ দেখুন। ধর্ম্মস্থানে আমার কি যোগ আছে?"

এমন নিতান্ত অবাধ্য, সমস্ত-অস্বীকারকারী, শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন নাস্তিককে লইয়া কি গণনা-বিদ্যা চলে?—আন্দু তৃতীয়বার ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতেই তিনি প্রবল তাচ্ছিল্যে তাহার হাত ছাড়িয়া বিজ্ঞভাবে চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "ধর্ম্ম, ধর্ম্ম! ধর্ম্মের কথা আমি কিছু বলব না, তোমার মুখে এখনো দুধের গন্ধ রয়েছে, ছেলেমানুষ তুমি, ধর্ম্মের কি বুঝ্বে?"

তাঁহার কথা কহিবার সদম্ভ-ভঙ্গীতে আন্দুর নির্ঘাত পরাভব স্থির করিয়া দর্শকের দল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। যেমন বাহাদুরী করিতে আসিয়াছিল লোকটা তেমনি জব্দ হইয়াছে!—

আন্দু কিন্তু হটিবার পাত্র নহে। দৃঢ়স্বরে বলিল, "ও কি বলছেন, জ্যোতিষ-বিজ্ঞানে ধর্ম্মের জন্যে বয়সের মাপ জোঁক আছে না কি?—সে হবে না, আপনি ঠিক করে বলুন, ধর্ম্মস্থানে আমার কি গ্রহ আছে।"—আন্দু হাতখানা আবার বাড়াইল।

তিনি পুনশ্চ হাতটা ঠেলিয়া দিয়া সগর্ব্বে হাসিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মের আর কি দেখ্ব, বলেছি তো তোমার ধন হবে।"

আন্দু বলিল, "ধনের জন্যে আমি লালায়িত নই, সত্যি বলছি আমি ধর্ম্মস্থানটা জানবার জন্যে ব্যস্ত।"

গণক-ঠাকুর মুরুব্বি-আনা ধরণে হাই তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিলেন,

"শুভ হবে, শুভ যোগ আছে, যখন হবে তখন আর ভাবনা কি? ধনই তো ধর্ম্ম!"

চমৎকার! ধনই ধর্ম্ম!

আন্দু আর বসিল না, উঠিয়া বলিল, "ঠাকুরজী, ধন তো বাহ্যিক সম্পদ, তার সঙ্গে ধর্ম্মের সম্পর্ক কি? ধর্ম্ম যে আধ্যাত্মিক ব্যাপার!"

গণক-ঠাকুরের মাথায় সে কথার সূক্ষ্ম তাৎপর্য্য ঢুকিল না। পুনঃ পুনঃ হাই তুলিয়া বলিলেন, "কেন, ধনের দ্বারাই তো সব, দান ধ্যান—"

বাধা দিয়া আন্দু বলিল, "ঐ একটি কাজ দান—কিন্তু ধনের দ্বারা তো ধ্যান চল্‌বে না ঠাকুরজী—ধ্যান যে মনের সম্পত্তি!"

গণক-ঠাকুর ফাঁপরে পড়িলেন। আজ পর্য্যন্ত এ সব জটিল তর্ক লইয়া তিনি মাথা ঘামান নাই, সুতরাং পরাভবের দৈন্যে অপমানে রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমাদের ম্লেচ্ছ শাস্ত্রে, ঐ রকম বলুক, আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে ধনই ধর্ম্মের মূল বলে।"

"ভুল কথা!"—ও ধারের বেঞ্চি হইতে সেই সৌম্যদর্শন বৃদ্ধটি জবাব দিলেন, "ভুল কথা। ধর্ম্মের পথে, ধনের আনুষঙ্গিক প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু ধনই যে ধর্ম্মের মূল একথা হিন্দুশাস্ত্রে নেই!"

বৃদ্ধটি এতক্ষণ দর্শকদিগের কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া হাসি-হাসি মুখে আন্দুর সহিত গণক-ঠাকুরের তর্কযুদ্ধ দেখিতেছিলেন, এইবার জবাব দিয়া প্রীতিভরে হস্তের ইঙ্গিতে আন্দুকে ডাকিয়া সস্নেহে বলিলেন, "এস, ভাই, নাস্তিক সাহেব, আমি তোমাকে ধর্ম্মস্থানের শুভাশুভ গণনা-সঙ্কেত বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু, সে গণনা সাধনসাপেক্ষ, চিত্তস্থিরই সে জ্যোতিষীর মূল বিজ্ঞান।—ভাইসাহেব, ভবিষ্যৎকে জানবার জন্যে অন্যায় চেষ্টা ছেড়ে, বর্ত্তমানের কর্ত্তব্যগুলো ভগবানের নামে নির্ভর রেখে করে চল ভাই,

চেষ্টার পরিমাণেই সফলতার স্ফূর্ত্তি!—আমি বলছি, তোমার ধর্ম্মস্থানে যত বড়ই অশুভ গ্রহ থাক, তুমি যদি পরিপূর্ণ চেষ্টায় ধর্ম্মসাধন কর, তাহলে দুষ্টগ্রহ নিশ্চয় হার মান্‌বে!—"

সরিয়া আসিয়া আন্দু তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বেঞ্চির উপর হাত রাখিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল।

১৫

বৃদ্ধ সমাদরে আন্দুকে তুলিয়া আগ্রহে তাহার সহিত আলাপ জুড়িলেন। আন্দু শুনিল, তাঁহার নাম রামশঙ্কর চৌবে, তিনি বঙ্গদেশের কোন চতুষ্পাঠীতে এতদিন সংস্কৃতাধ্যাপকের কার্য্য করিয়া এখন অবসর লইয়া বাটীতে রহিয়াছেন, সেকেন্দ্রাবাদে তাঁহার নিবাস, সম্প্রতি দোলযাত্রা উপলক্ষে পুরীতে গিয়াছিলেন, এখন পুরী হইতে ফিরিতেছেন, পণ্ডিতজীর সংসারে কেহই নাই, একটিমাত্র দৌহিত্র আছে, সেও কলিকাতায় পিতৃব্যের নিকট থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছে। পণ্ডিত নিজের কাহিনী সব কহিয়া স্মিত হাসিতে উপসংহার শেষ করিলেন, বলিলেন, "সংসারের মধ্যে আমায় তিনি কেমন করে রেখেছেন জান?—শিকলকাটা পাখীর মত, কিন্তু তবু আমি দাঁড় কাম্‌ড়ে বসে আছি। কেন জান? মায়ায় নয়, ভাই, মনস্থির করবার জন্যে।"

ওদিকে গণক-ঠাকুর, অবিশ্বাসী অধার্ম্মিকদিগের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্রের রহস্যোদ্ঘাটনে কিরূপ কঠিন নিষেধ আছে, তাহাই অস্পষ্ট ইঙ্গিতে তীব্র-স্বরে সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব মর্য্যাদা কিন্তু আর ফিরিল না, ভক্তদলে আর ভক্তি-উৎসাহের সাড়া পাওয়া গেল না। তাহারা হাত দেখাইতে চায় হুজুগের খাতিরে, হুজুগ যদি ব্যর্থ হইল,

তাহা হইলে তাহার কঙ্কালসার দেহটার উপর তাহাদের কিসের মমতা! যাহাই হউক এ দুর্ভোগ তাহাদের বেশীক্ষণ সহ্য করিতে হইল না, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে গণক-ঠাকুর নামিলেন। তিনি অদৃশ্য হইবামাত্র যাত্রীদলে পরম উল্লাসে তাঁহার কুৎসা কীর্ত্তন আরম্ভ করিল। আন্দুকে বিশেষভাবে শুনাইয়া শুনাইয়া তাহারা ভবিষ্যৎবক্তা গণক-ঠাকুর যে লোক-তিনটির হাত দেখিয়াছিলেন তাহাদের ভবিষ্যতে সম্ভাবিত ধন-দৌলত আসবাব-পত্রের ধুয়া ধরিয়া স্পষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িল না। লঘুচেতা লোকের প্রকৃতিই এই,—যতক্ষণ যেটাকে সত্য বলিয়া জানে, ততক্ষণ সেটা অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া থাকে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সেটা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, সেই মুহূর্ত্তে তাহার উপর নির্ম্মম খড়্গহস্ত হইয়া উঠিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করে না। তাহাদের হাস্য পরিহাসের মাত্রা এত ঊর্দ্ধে উঠিল, যে, বিরক্ত হইয়া আন্দু তাহাদের ক্ষান্ত হইতে অনুরোধ করিল। এবং একটিমাত্র অনভিজ্ঞের অপরাধে সমস্ত জ্যোতিষশাস্ত্র যে ভ্রান্ত, এ ধারণা তাহাদের ত্যাগ করিতে বিনীতভাবে উপদেশ দিল।

এদিকে অল্পক্ষণের আলাপেই পণ্ডিতজীর সহিত আন্দুর এমনি গাঢ় সৌহৃদ্য জন্মিল যে, হঠাৎ দেখিলে অনেকেই মনে করিত যে ইহারা বুঝি বহুদিনের পরিচিত, দুই নিবিড় ঘনিষ্ঠতা-আবদ্ধ আত্মীয়। আন্দুও ভাবিয়া বিস্ময় বোধ করিল, এত সহজে এমন গভীর আলাপ তাহার আর কাহারো সহিত কখনো হয় নাই! অপরিচিত লোকের সহিত সে সহজে মিশিতে ডরাইত। এই ভক্তিভাজন বৃদ্ধটি তাহার শ্রদ্ধার উপর এমনি গভীর এমনি মধুর আধিপত্য অক্লেশে বিস্তার করিয়া বসিলেন, যে, আন্দু তাঁহার সরল প্রীতিপূর্ণ আচরণের মধ্যে নিজের পিতার কোমল সাদৃশ্য অনুভব করিয়া মুগ্ধ তৃপ্ত হইয়া গেল।

একটা ষ্টেশনে কয়েকজন কাবুলী মোটঘাট লইয়া গাড়ীতে উঠিল। অন্যান্য যাত্রীরা আপত্তি করিয়া গাড়ীতে স্থানাভাব দেখাইয়া তাহাদের অন্য গাড়ীতে যাইতে উপদেশ দিল, কিন্তু তাহারা নিতান্ত অগ্রাহ্যভাবে সকলের মোট পুঁট্‌লী সরাইয়া স্থান করিয়া লইল। দুইজন তরুণবয়স্ক কাবুলী সেরূপ দক্ষতার অভাবে নিজেদের বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া কড়া আওয়াজে পূর্ব্বাগতদের সহিত বিরোধের উপক্রম করিতেই পণ্ডিতজী ব্যস্ত হইয়া নিজের মোটটি বেঞ্চির তলায় রাখিয়া তাহাদের নিজের পাশে জায়গা দিলেন, এবং মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানি কোলের উপর লইয়া সরল স্বচ্ছন্দ মুখে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে বসিলেন।

আন্দু এই পরম হিন্দুর অসঙ্কোচ উদারতায় বিস্মিত ও অভিভূত হইয়া পড়িল। বৃদ্ধ সার্থক বিদ্যা শিখিয়াছেন, পরের সুখ সুবিধার অপেক্ষা কোন্ সঙ্কীর্ণ শুচিতা শ্রেষ্ঠ! আন্দু যে-বেঞ্চিতে বসিয়াছিল, সে-বেঞ্চিতে সবকটিই হিন্দুস্থানী, কাহার, কুর্ম্মি জাতীয় যাত্রী ছিল। আন্দু নিজের মোটটি ইতিপূর্ব্বেই গাড়ীর হুকে টাঙ্গাইয়া পাশের যাত্রীকে স্থান দিয়াছিল। দুইজন বিরাটকায় দুর্গন্ধ-দুষ্ট মলিন-পরিচ্ছদ কাবুলীর মাঝে স্বল্পপরিসর স্থানে এই সদানন্দ বৃদ্ধকে স্বচ্ছন্দে সঙ্কুচিতভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সে মনে মনে ক্লিষ্ট হইয়া উঠিল। পাশের যাত্রীকে অনুনয় করিয়া তাহার মোটটি হুকে টাঙ্গাইয়া দিয়া নিজে উঠিয়া তাহার স্থানে পণ্ডিতজীকে বসিতে অনুরোধ করিল। পণ্ডিতজী শান্ত মিষ্ট হাসিতে তাহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "কেন দাদা, আমার ত কিছুই কষ্ট হয়নি, অন্তর ঘৃণিত হলেই বাইরের উপর ঘৃণার প্রকোপ বাড়ে। পরমাত্মার অংশ নিয়ে যখন সমস্ত জগতের অস্তিত্ব বিকাশ, তখন অপবিত্রতা কোথায় বল ত

ভাই !"—বলিয়াই অশ্রু-সজল নেত্রে আনন্দ-গদ্‌গদকণ্ঠে মোহমুদ্গরের শ্লোক আবৃত্তি করিলেন—

"ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানং।"

পণ্ডিত বলিতে লাগিলেন, "বাবা, বাইরের বিচার, সে শুধু মনের বিকার। বিচার তো মনে! শুচিতার দরকার চিত্তে।—নিন্দুকের চোখে সবই কুৎসিত ; পাড় সরুই হোক আর মোটাই হোক, কাপড় হলেই আমি পর্‌বার উপযুক্ত মনে করি ; পাড়ের বাহার খোঁজা, নিজের সখের জন্য। মুখে কথা অনেক কওয়া যায়, কিন্তু কথার সঙ্গে যথার্থ মর্ম্মের যোগ থাক্‌লেই সেই কথাই সত্য। ভেদ যত বাড়াবে ততই বাড়্‌বে। তুমি বস।"

আন্দু ভক্তিভরে তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল। কোন কথা না কহিয়া নিজের স্থানে বসিল। পণ্ডিতজী মহানির্ব্বাণতন্ত্রখানা তুলিয়া শান্তমুখে পড়িতে বসিলেন।

সুদীর্ঘ পথ—উভয়ে অনেক বাক্যালাপ করিলেন। আন্দু সংক্ষেপে যখন নিজের জীবনী বর্ণন করিয়া দিল্লীযাত্রার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিল, তখন পণ্ডিতজী উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বেশ বেশ! তুমি যুদ্ধে ঢোক্‌বার চেষ্টা কর্‌ছ, সে ত ভালই। যুবার শরীরে যুবার মত বিক্রমের চর্চ্চাই ত ধর্ম্ম। হাইদ্রাবাদে নিজামের অধীনে আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনিও আগে গবর্ণমেণ্টের কাজ কর্‌তেন, তিনি সুবিধা করে

দিতে পারেন। তোমার যখন তেমন অভিভাবক নাই, তখন যদি বল তো আমি তাঁকে দিয়ে চেষ্টা কর্‌তে'পারি।"

পণ্ডিতজীর সহৃদয়তায় আন্দু প্রফুল্লচিত্তে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল এবং অনিশ্চিত সফলতার পরিবর্ত্তে নিশ্চিত চেষ্টাই যুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিয়া, দিল্লী গমনের সঙ্কল্প ছাড়িয়া সেকেন্দ্রাবাদ গমনের সঙ্কল্প স্থির করিল। মেমসাহেবদের আগ্রহ-স্মৃতি, নবোত্থমের নীচে কোথায় চাপা পড়িয়া গেল, সে আর তাহার সন্ধানই লইল না।

১৬

যথাসময়ে আন্দু সেকেন্দ্রাবাদে পণ্ডিতজীর বাটীতে আসিয়া পৌছিল। হাইদ্রাবাদের আত্মীয়কে পত্র লিখিয়া পত্রের উত্তরের প্রতীক্ষায় পণ্ডিতজীর নারীসংসর্গশূন্য বহিঃপ্রকোষ্ঠে আন্দু আশ্রয় লইল। আন্দু পণ্ডিতজীর শান্তিময় সাহচর্য্যে আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিল।

কয়েকদিন অতিবাহিত হইল, পত্রের উত্তরের সময় বহিয়া গেল। পণ্ডিতজী পুনরায় তাঁহাকে পত্র লিখিলেন। ইতিমধ্যে প্রতিবেশীবর্গ সকলেই আন্দুর পরিচিত হইয়া উঠিল এবং সহরের রাস্তাঘাটগুলোর নূতনত্ব ঘুচিয়া গেল। কর্ম্মহীন সময় কাটান আন্দুর পক্ষে ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিল।

কাজের লোকের কাজ না থাকিলে মাথায় নানান্ খেয়াল আসিয়া যুটে, নানা উপসর্গ মানুষকে চাপিয়া ধরে। স্বাভাবিক কর্ম্ম প্রবৃত্তি রীতিমত খোরাক না পাইলে নির্জীব হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকূল বৃত্তিগুলিও মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিবে। এবং একবার তাহাদের কবলিত হইলে আর মুক্তি নাই। জন্মজন্মান্তর ধরিয়া নাকি তাহার জের চলিতে শুনা যায়। আন্দু

আলস্যের অবসাদে পরের গলগ্রহ হইয়া দিব্য আরামে অবনতির দিকে ঝুঁকিতে বুঝি উদ্যত হইয়াছে,—এমনি একটা দুশ্চিন্তা হঠাৎ আন্দুর মাথায় জাগিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কতকগুলো ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে আবার একটা নূতন কল্পনা মাথায় উদয় হইতেই আন্দু পণ্ডিতজীর কাছে অকস্মাৎ প্রস্তাব করিয়া বসিল, "আমায় সংস্কৃত শেখাতে হবে।"

পণ্ডিতজী তখন শঙ্করাচার্য্যের মণিরত্নমালা লইয়া নাড়া-চাড়া করিতেছিলেন, আন্দুর প্রস্তাবে মুহূর্ত্তের জন্য কৌতুক-বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া তাহার পানে চাহিলেন, তার পর হাসিয়া বলিলেন, "বেশ ত। শিক্ষার আবার শেষ কোথা ?—জন্ম হতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার সময়, তুমি স্বচ্ছন্দে শিখ্‌তে আরম্ভ কর।"

পরদিন হইতে আন্দু শিখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে শিখিতে বসিল, কিম্বা শিক্ষা তাহাকে গড়িতে বসিল সেকথা বলা কঠিন। এমনি অখণ্ড মনোযোগ প্রবল উদ্যমে সে শিক্ষার মধ্যে ডুব দিল, যে, আহারনিদ্রার জন্যও তাহার ধ্যানভঙ্গ দুরূহ হইয়া উঠিল। রন্ধনাদি নিজ হাতে করিতে চিত্তবিক্ষেপ জন্মে বলিয়া নিকটস্থ হোটেলে দিনের আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইল। রাত্রে পড়াশুনার ব্যাঘাত হয় বলিয়া অনাহারই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিল, কিন্তু পণ্ডিতজীর তাড়নায় কিঞ্চিৎ জলযোগে শেষে বাধ্য হইতে হইত। এরূপে শিক্ষা চলিল, ওদিকে হস্তও রিক্ত হইয়া আসিল। আন্দুর আবার ভাবনা ধরিল।

পণ্ডিতজীর অমায়িক উদার শ্রদ্ধা আন্দুর উপর দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। অধ্যয়নে আন্দুর ব্যগ্র উৎসাহ দেখিয়া তিনি প্রায়ই বলিতেন, "তুমি বড় বেশী ঝোঁকাল লোক। তুমি খুব সাবধানে থাক্‌বে, যদি জীবনে

উন্নতির পথে যাও তো মহাউন্নতি লাভ কর্‌বে, কিন্তু যদি মন্দর দিকে নামো তো সর্ব্বনাশের বাকি রাখ্‌বে না।—তোমার মনের তেজ বড় প্রবল, খুব সাবধান।"

আন্দু হাসিত। পণ্ডিতজীকে "পণ্ডিতজী" বলিয়া ডাকিলে তিনি প্রতিবাদ করিয়া পরিহাস করিতেন, বলিতেন, "পণ্ডিত পণ্ডিত করে আমায় যে মূর্খ করে তুল্‌ছ!—"

পাড়ার সকলে এই সদানন্দ মহাশয় বৃদ্ধকে, "দাদাজী" বলিয়া ডাকিত, তাই আন্দুও দাদাজী বলিতে আরম্ভ করিল।

১৭

নিরন্তর লেখাপড়ার পরিশ্রমের অবসাদে প্রতিবাসিগণের ফরমাস খাটিয়া গল্পবাজ যুবকদের সহিত ব্যায়ামের ব্যর্থচেষ্টা করিয়া, আন্দু নির্জ্জন মাঠে বা স্তূপপৃষ্ঠে ছুটাছুটি লাফালাফি দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিত। বৃদ্ধ দাদাজী অনেক সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু নিজের খাওয়াপরার খরচটা নিজেকে সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে বৈকি। আন্দু দাদাজীর অজ্ঞাতে কাছাকাছি একটা চাক্‌রীর যোগাড় দেখিতে সচেষ্ট হইল।

সেদিন বিকালবেলা যখন দাদাজীর কাছে পাড়ার একটি দরিদ্র বিধবার পুত্র স্কুলে প্রমোশন পাওয়ার সংবাদ সহ তাহার পাঠ্য পুস্তকগুলি কিনিয়া দিবার জন্য ছলছল নেত্রে অনুনয় করিতেছিল, তখন নিকটস্থ আন্দুর চিত্ত অকস্মাৎ কেমন বিকল হইয়া উঠিল। নিজের মধ্যে অক্ষম দৌর্ব্বল্য অনুভব করিয়া সে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। চারিদিকে এত দারিদ্র্য, এমন অসহ্য অভাব,—আর সে পরিশ্রমী উপার্জ্জনক্ষম হইয়াও এই বলিষ্ঠ দেহকে, সূক্ষ্ম জ্ঞানচর্চ্চায় অযথা আবদ্ধ রাখিয়া, একি আত্মবাসনার পূজা করিতে

চলিতে বসিয়াছে। না না, উপার্জ্জন চাই,—উপার্জ্জন চাই, চারিদিকের এত দরিদ্রতার মধ্যে সে যদি আপনার পরিশ্রমকে বিক্রয় করিয়া একটি কপর্দ্দক সংগ্রহ করিতে পারে—নিজের বক্ষের রক্ত খরচ করিয়া একজন ক্ষুধিতের ক্ষুধা মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত করিতে পারে, তাহা হইলে যথেষ্ট—তাহাই ঢের!—না, সে আপনার কর্ত্তব্য প্রাণপণে পালন করিবে। ভগবান্ তাহার সকল বন্ধন সকল দিক হইতে ছেদন করিয়া তাহাকে সকলের জন্য বিশ্বে ছাড়িয়া দিয়াছেন। নিজের কৌতূহলকে কেন্দ্র করিয়া অনির্দ্দিষ্টভাবে পৃথিবীর বক্ষে খেলা করিয়া বেড়াইলে চলিবে না, খাটিতে হইবে,—খাটিতে হইবে, চতুর্দ্দিকে অসংখ্য সাহায্যপ্রার্থী তাহার কর্ম্মঠ হস্ত দুইটির কাছে কিছু-না-কিছু প্রার্থনা করিতেছেই করিতেছে। সে কি স্বভাবের দাবী হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র বড় করিয়া গড়িতে বসিয়াছে!—চুলোয় যাউক তাহার ক্ষুদ্র আগ্রহ! সে আপনাকে পরের জন্য ছাড়িয়া পরের করিয়া পরের জন্য সর্ব্বস্ব বিলাইয়া নিজের নীচত্বের শুদ্ধি সংস্কার করিয়া লইবে। আব্দু অকস্মাৎ সবেগে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

রাস্তার ধারে একটি বড়লোকের বাড়ীর দাসী-পুত্র ছয় বৎসর বয়স্ক বালক কোথা হইতে একমুঠা কিস্‌মিস্ সংগ্রহ করিয়া খাইতে খাইতে আসিতেছিল; দৈবক্রমে হুঁচট্ খাওয়াতে রাস্তার পাশে খাদের মধ্যে কিস্‌মিস্‌গুলি ছড়াইয়া পড়িয়া গেল। বালকটি আকুল ক্রন্দনে অধীর হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় আব্দুও সেখানে আসিয়া পড়িল।

অন্য সময় হইলে হয়ত অন্য খাদ্যে বালকের ক্ষোভ দূর করিত, কিন্তু আজ সে নিজেই ক্ষুব্ধ; কাজেই বালককে আশ্বাস দিয়া তৎক্ষণাৎ সেই আবক্ষ গভীর, জঙ্গালকণ্টকাকীর্ণ খাদে অবতরণ করিয়া সযত্নে বালকের

কিস্‌মিস্ কটি খুঁটিয়া খুঁটিয়া কুড়াইয়া দিল! বালক খুসী হইয়া চক্ষু মুছিয়া কিস্‌মিস্ ধুইয়া লইতে ছুটিল।

আন্দু ঘাটে গিয়া হাত পা ধুইয়া উঠিতেছে, এমন সময় হাজা হাত পায়ে চূণ সুর্‌কি মাখিয়া রাজমিস্ত্রীর দল হাত-পা ধুইতে ঘাটে নামিল। দলে ছাপান্ন বৎসরের বৃদ্ধ হইতে তের চৌদ্দ বৎসরের বালক অবধি সকল বয়সের লোকই ছিল। তাহাদের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আন্দু ভাবিল, ইহারা সকলেই কাজের লোক ; কিন্তু সে? একেবারে নিষ্কর্ম্মা।

দলের মধ্য হইতে একটি বলিষ্ঠকায় যুবা আন্দুর বলিষ্ঠ পেশীপূর্ণ গৌরসুন্দর দেহটির পানে ঘন ঘন মুগ্ধ নয়নে চাহিতেছিল। তাহার চাহনি দেখিয়া আন্দু অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত তাহার সহিত আলাপ করিয়া ফেলিল। যুবাটির নাম মহম্মদ খাঁ। বয়সে নবীন হইলেও সেই লোকটাই দলের সর্দ্দার। আন্দু তাহার কঠিন হস্তটা দুই হাতে মুঠাইয়া ধরিয়া অত্যন্ত আবেগের সহিত নিজের বক্ষের কাছে টানিয়া ধরিল, মনে মনে ভাবিল, ইহারই জোরে লোকটা ঐ ছাপান্ন বৎসরের বৃদ্ধের উপর ক্ষমতা চালনার অধিকার পাইয়াছে।—আর সে?—তাহাকেও তো ভগবান পর্য্যাপ্ত ক্ষমতা দিয়া জগতে পাঠাইয়াছেন, তবে সে কি দুঃখে এমন অপর্য্যাপ্ত অক্ষমতার মধ্যে ডুব দিয়া সকলকে ফাঁকি দিয়া নিজেও ফাঁকে পড়িতেছে।

দলের অপর সকলে যখন হাস্যপরিহাসে পরস্পরের ত্রুটি উল্লেখে পরস্পরকে বিদ্রূপ করিতেছিল, তখন সর্দ্দারের সহিত আন্দু ঠিকানা বদল করিয়া আলাপপরিচয় পাকাপাকি করিয়া তাহার কাছে বিদায় লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। বৃষ্টিস্নাত পৃথিবীর উপর তীব্রোজ্জ্বল সূর্য্যালোক যেমন গভীর আবেগে হাসিতে থাকে, আন্দুর চিত্তটাও তেমনি এই সামান্য লোকটার সামান্য পরিচয়ে তৃপ্ত আশান্বিত হইয়া উঠিল। সূক্ষ্ম

আঘাতে তাহার মন যেমন গভীরভাবে আহত হইত—সূক্ষ্ম আশ্বাসেও তেমনি পরিপূর্ণরূপে উদ্দৃপ্ত হইয়া উঠিত।

সেখান হইতে আসিয়া নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে এমনি দ্রুতপদে পথাতিবাহন করিয়া চলিল, যেন কি বিশেষ প্রয়োজন আছে, কতদূরে যে আসিয়া পড়িল ঠিক নাই। দুহাতের আঙ্গুল পরস্পর সংলগ্ন করিয়া সবেগে ঘসিতে ঘসিতে রাস্তার মোড়ের প্রান্তে এক বাগিচার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঠিক রাস্তার কোণেই একটি নারিকেলগাছের তলায় কয়েকজন বলিষ্ঠাকৃতি ইতর শ্রেণীর লোক কি কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করিতেছিল। সকলের চেয়ে লম্বাগোছের লোকটা দা দিয়া নারিকেল গাছের গায়ে আঁক কাটিতে কাটিতে মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, "সো হাম নেহি সেকেঙ্গে। মুন্নুয়া উঠ।"

মুন্নুয়া প্রতিবাদ করিয়া জানাইল সে কখনো গাছে উঠে নাই, এবং গোঁয়ারতুমি করিয়া গাছে উঠিয়া জীবনটা নষ্ট করিতে সে নারাজ। তৃতীয় ব্যক্তি একটু বৰ্দ্ধিষ্ণু গোছের চেহারার লোক, কাজেই গম্ভীর বদনে তাহাদের ঝুটা কাজিয়া বাদ দিয়া গাছে উঠিতে আদেশ দিল।

ঝুটা কাজিয়ার অপবাদে লম্বাকৃতি লোকটা চটিয়া বলিল, উপদেশ রাখিয়া সে ব্যক্তি যদি সদ্দৃষ্টান্তের দ্বারা শিক্ষা দেয় তাহা হইলেই গাছে-উঠা-ব্যাপারটা তাহাদের বিশেষরূপে বোধগম্য হইবে!

কৌতূহলী আন্দু অগ্রসর হইয়া বলিল,— "ক্যা হুয়া জী?"

তাহারা গাছে উঠিয়া ডাব পাড়িবার সামর্থ্যাভাব সবিশেষ নিবেদন করিলে, আন্দু তৎক্ষণাৎ মালকোঁচা মারিয়া হাঁটুর কাপড় গুটাইয়া, নিজেই গাছে উঠিতে উদ্যত হইল। দৃঢ়বদ্ধ কটিবস্ত্রে দা আটকাইয়া, লোকগুলার সন্দেহ ও বিস্ময় অবজ্ঞা করিয়া, সুদক্ষ আরোহীর মত অক্লেশে গাছে উঠিয়া

পড়িল। অর্থের অভাব, সংস্কৃত ব্যাকরণের কৃৎতদ্ধিত, অধিক কি সগু-পরিচিত রাজমিস্ত্রীটীর কথা অবধি, কিছুই আর মনে রহিল না, তড়তড় করিয়া সে গাছের মাথায় উপস্থিত হইল।

এসব দেশে নারিকেল-গাছ দুষ্প্রাপ্য। বাগিচাস্বামী বিশেষ সখ করিয়াই এই গাছক'টি আনাইয়া এখানে রোপণ করিয়াছেন, এ-সব দেশের লোক কাজেই নারিকেলগাছের তত্ত্ব সবিশেষ অবগত নহে। আন্দুও স্বভিজ্ঞ নহে, একথা অবশ্য আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, তবে সে কলিকাতায় থাকিবার সময় মাঝে মাঝে নিকটস্থ পল্লীঅঞ্চলে বেড়াইতে গিয়া, এইসব উদ্ভিদতত্ত্ব স্বচক্ষে কিছু কিছু দেখিয়াছিল মাত্র। আন্দু সেই বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি অভাবের ক্ষেত্রে, সাহসের ঠেলায় সজীব হইয়া, তাহার কার্য্যোদ্ধারের সহায়তা করিল।

বাল্‌দোর উপর ভর রাখিয়া দা'য়ের সজোর আঘাতে ডাব কাটিয়া ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া আন্দু ফেলিয়া দিতে লাগিল। চাকর তিনটী কুড়াইয়া লইয়া, বাগিচার ওদিকে প্রভুর বাড়ীর অন্তঃপুরে পৌছাইয়া দিয়া আসিতে লাগিল।

যথেষ্ট ডাব পাড়া হইলে, আন্দু দা ফেলিয়া গাছ হইতে নামিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় দূরে, হঠাৎ ভয়ানক কলরব উঠিল। আন্দু গাছের উপর হইতেই তীক্ষ্ণদৃষ্টি যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া চাহিয়া দেখিল, দূরবর্ত্তী রাস্তার দিকে কোলাহল; ওদিকের রাস্তা হইতে লোকগুলা যে যেদিকে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, সকলেরই ভয়-ব্যাকুলিত ঊর্দ্ধ-শ্বাসের প্রবলবিক্রমলাঞ্ছিত মূর্ত্তি! ক্ষণপরেই দেখিতে পাওয়া গেল, এক প্রকাণ্ড শাদা ধব্‌ধবে অশ্ব রাশ ছিঁড়িয়া আরোহীপৃষ্ঠে উন্মত্ত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। পিছনে দশ বারো জন বলবান লোক হল্লা করিয়া

ঘোড়াটাকে অধিকতর ক্ষিপ্ত করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। অশ্বারোহী সাহেবটী চীৎকার করিয়া কি বলিতেছেন বুঝিতে পারা গেল না।

আন্দু দৃষ্টিশক্তি সংযত করিয়া উপস্থিত বুদ্ধিকে বিদ্যুৎবেগে নিজের মধ্যে সচেতন করিয়া লইল। ধীরে সুস্থে গাছ হইতে নামিয়া সাহেবের সাহায্য করিতে গেলে ঘোড়াশুদ্ধ সাহেবটী বহুদূর চলিয়া যাইবে, কিন্তু এই রাস্তার উপর ঈষদ্বক্র ভাবে হেলিয়া দণ্ডায়মান অনতিদীর্ঘ নারিকেল গাছের উপর হইতে সোজা লাফাইয়া পড়িলে ··· ··· হাঁ, ঠিক ! নির্ম্মম উত্তেজনা নির্ভীক বিক্রমে চকিতে মস্তিষ্কের মাঝে বজ্ররেখায় খেলিয়া গেল। সকল দিক ভাবিয়া পুরাপুরি দরদস্তুর করিবার অবকাশ রহিল না। ··· আন্দু প্রস্তুত হইল, সাহেবটীর সঙ্কট যে আসন্ন।”

ঘটিকাযন্ত্রের মুহূর্ত্তের ক্ষুদ্র কাঁটাটী টিক্‌টিক্ করিয়া অবিশ্রাম ক্ষীণশব্দে নিজের কাজ করিয়া যায়, মিনিটের কাঁটাটীও ততোধিক শান্ত নিস্তব্ধ-ভাবে আপন কাজটী যথারীতি সম্পাদন করে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অলস মন্থর নিতান্ত নিরীহ ধরণের ঐযে ঘণ্টার কাঁটাটি ওটি সকলের চেয়ে নিশ্চিন্ত আকৃতির বস্তু হইলেও ঠিক ঘণ্টার মুহূর্ত্তে সশব্দে আপনার সজীবতার গৌরব দেখাইয়া সঙ্গী দুটীকে নিষ্প্রভ করিয়া দেয়। মানবচরিত্রের বিভিন্ন বৃত্তির সন্দেহজনক নিরীহ অস্তিত্বের প্রবল বিকাশও অনেক সময় সেইরূপ হইয়া থাকে, তবে ভিতরে প্রাণস্পন্দনটী থাকা চাই।

ইতিমধ্যে অশ্বভীতির তাড়নায় সেই জোয়ান লোক তিনটি কোন্ নিরাপদ স্থানে যে অন্তর্হিত হইয়া গেল, আন্দু তাহা মোটেই টের পাইল না। ঘোড়াটা ছুটিয়া গাছের কাছাকাছি রাস্তায় আসিয়া পড়িল। আন্দু চারিদিকে চাহিল, তাহার পর অকস্মাৎ উচ্চ গাছের উপর হইতে সবেগে ভূমে লাফাইয়া পড়িল। অতর্কিতে সাম্‌নে গুরুভার পতনে

বিষম চমক খাইয়া, ক্ষিপ্ত অশ্ব সামনের পা উচুঁ করিয়া আরোহী সুদ্ধ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। অবলম্বনহীন আরোহী পিছনে কাৎ হইলেন, পড়েন আর কি!—

নিমেষমধ্যে প্রচণ্ড লম্ফ দিয়া অসীমসাহসী আন্দু উন্মুখ অশ্বের লাগামসুদ্ধ লোহার সাজ দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিয়া সজোরে এক ঝাকুনি মারিয়া, ঘোড়ার মুখ নামাইল। আরোহী সোজা হইল।

উন্মত্ত দুরন্ত ঘোড়া সহসা স্থির হইল; অশ্বচরিত্রে সুপণ্ডিত আন্দুর শিক্ষিত করস্পর্শে ঠাণ্ডা হইয়া শিশুর মত তাহার কাঁধে মাথা রাখিয়া ঘন ঘন শ্রমক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাঁপাইতে লাগিল। আন্দু বজ্রনিনাদে পিছনের লোকগুলাকে শান্ত হইতে উপদেশ দিল।

সাহেব লাফাইয়া মাটিতে পড়িলেন। পিছনের ভিড় হইতে দুইজন পুলিশ কনেষ্টবল ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়াটাকে দুইদিক হইতে ধরিয়া টহলাইয়া দম সাম্‌লাইতে লইয়া গেল। জনতা উৎসুক-কৌতূহলে সাহেব ও আন্দুকে ঘিরিয়া পুরস্কারের বহর দেখিতে দাঁড়াইল। নগ্নগাত্র নগ্নপদ অসভ্য দরিদ্র সাহসী যুবাকে সাহেবটি বিকৃত হিন্দিতে ইংরেজীর গন্ধ মিশাইয়া ধন্যবাদ দিয়া পুরস্কার চাহিতে হুকুম দিলেন। আন্দু সেলাম দিয়া সাহেবের জাতীয় ভাষায় জানাইল,—সাহেবের প্রাণ রক্ষাই তাহার প্রচুর পুরস্কার হইয়াছে, সে অন্য পুরস্কার চাহে না।

সাহেব স্তব্ধ হইয়া তীক্ষ্ণ নয়নে ক্ষণকাল তাহার আপাদমস্তক লক্ষ্য করিলেন। আন্দু নিরুদ্বেগে রাস্তার ধূলায় বসিয়া মচকান পায়ের যন্ত্রণাযুক্ত স্থানের উপস্থিত শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইল। সাহেব অক্ষত দেহে বাচিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার দিকে লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজন কি?

সাহেব আরো দুই চারিটি কথা কহিলেন, আন্দু বেশ শিষ্টাচারের

সহিত তাহার জবাব দিল। সাহেব তাহার পা-টি আহত হওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নিজের কার্ড বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া আগামী কল্য প্রাতঃকালে পুলিশ-ষ্টেশনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিয়া দ্রুত দীর্ঘ-পাদক্ষেপে চলিয়া গেলেন।

এতক্ষণ যাহারা গৌরাঙ্গ গৌরবে আন্দুর কাছে ঘেঁসিতে সঙ্কুচিত হইতেছিল, তাহারা এইবার হুড়াহুড়ি করিয়া আন্দুকে ঠাসিয়া ধরিল। এই কৌতুকপ্রিয় লোকগুলির কাছে পায়ের যন্ত্রণার কোনো প্রতিকার পাওয়া দুঃসাধ্য বুঝিয়া আন্দু উঠিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে দাদাজীর বাসার দিকে চলিল,—পা-টা আজ বড়ই জখম হইয়াছে।

রাস্তার ধারে একজন ইংরেজীনবিশ বাঙ্গালী যুবক এক বৃদ্ধের সহিত অশ্ববিভ্রাটের কথা আলোচনা করিতেছিল। খঞ্জ-গমন আন্দুকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই যে ইনি। পা-টা কি ছড়ে গেছে?"

"না" বলিয়া আন্দু চলিয়া যাইতেছিল! বৃদ্ধ সাগ্রহে বলিলেন, "তুমি কোথা থাক বাবা?"

আন্দু ফিরিয়া দাঁড়াইল। দাদাজীর বাসার উল্লেখ করিতেই বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ হাঁ, আমি যে তোমায় সেদিন ওখানে দেখেছি।"

আন্দু অভিবাদন করিল, ইনি দাদাজীর বন্ধু। যুবকটি সোৎসাহে অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনার নাম কি মশায়?" আন্দু নাম বলিল।

যুবক পুনরপি প্রশ্ন করিল, "আপানার কে আছে?"

আন্দু হাসিয়া বলিল, "কেউ নাই, বাপ মা সব মারা গেছেন।"

যুবক বলিল, "স্ত্রীপরিবার, ছেলেমেয়ে; বিয়ে করেন নি নাকি?"

আন্দু "না" বলিয়া পুনশ্চ অভিবাদনে বৃদ্ধকে সম্মান জ্ঞাপন করিয়া অগ্রসর হইল। বিস্মিত যুবক, এতক্ষণে বিজ্ঞভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল "হুঁ!"—অর্থাৎ কেউ কোথায় নাই, তাই তুমি অমন দুঃসাহসীর কাজে জীবনটা স্বচ্ছন্দে তস্‌রুপাতে উদ্যত হইয়াছিলে—না হইলে পারিতে না।

প্রশংসার ঝঞ্ঝায় মাথা ঠিক রাখিয়া তিষ্ঠান বড় শক্ত সমস্যা; দুই-একজন লোক পুনরায় আলাপ করিতে উদ্যত দেখিয়া আন্দু ত্রস্ত হইয়া চরণবেগ বর্দ্ধিত করিতে গিয়া আহত হইল।

লোকগুলা শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল, "পুলিশ সাহেবের জীবনরক্ষা করিয়া সে নিজের ভবিষ্যতের সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার রাস্তা তৈরী করিয়াছে।"

১৮

আন্দু পরদিন নূতন উৎসাহে নবীন সঙ্কল্প স্থির করিয়া পুলিশ-ষ্টেশনে গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিল। সাহেব খুব সমাদরে বসাইয়া তাহার পায়ের বেদনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহার পর অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া আন্দুর সুগঠিত শরীর সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ প্রশংসা করিয়া সাহেব তাহাকে পুলিশে কর্ম্ম লইতে অনুরোধ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, আন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। তারপর যথাবিধানে যথাস্থানে আবেদন নিবেদনের পর আন্দু একেবারে পুলিশের জমাদার হইল। দাদাজী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "যেখানে খুসী স্বচ্ছন্দে যাও, কিন্তু সাম্‌লে থেকো।"

পুলিশে ঢুকিবার পাঁচ-ছয় দিন পরে, দাদাজীর আত্মীয় মহাশয়ের পত্র আসিল। তিনি পীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া পত্রের উত্তর দিতে

পারেন নাই, এক্ষণে জানাইতেছেন যে, যে ব্যক্তি যুদ্ধবিভাগে কর্ম্ম করিতে চাহে, তাহাকে সত্বর হাইদরাবাদে পাঠাইবেন, তিনি নিজামের অধীনে তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দিবেন। আব্দু শুনিয়া বলিল, "আপনি লিখে দিন যে, আমি সংস্কৃত এবং অসংস্কৃত এই দুটোর মাঝে পড়ে বিষম হাবুডুবু খাচ্ছি। এখান থেকে বিযুক্ত হলেই তাঁর কাছে গিয়ে নিযুক্ত হব।"

দাদাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "পুলিশের কাজ যদি ছাড়্বেই জান, তবে কাজে ঢুক্লে কেন?"

আব্দু সংস্কৃত বইখানি তুলিয়া লইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখে যাই এদের ব্যাপারটা কি?"

দাদাজী চিন্তিতভাবে বলিলেন, "দেখ আব্দু, আমি তোমায় একটা কথা বল্‌ব কদিন থেকে মনে কর্‌ছি,—পুলিশলাইনের লোকেদের স্বভাব চরিত্র প্রায়ই মাটি হয়ে যায়—"

বাধা দিয়া হাসিয়া আব্দু বলিল, "আমি যে নিজে পাথর।"

দাদাজী হাসিয়া বলিলেন, "পরশ!—কিন্তু নারে দাদা, সত্যি বল্‌ছি আমার ভাবনা হচ্ছে, শাদায় ময়লা ধরে বড় শিগ্‌গির। তুমি বিয়ে কর, একটা পেছটান রাখ।"—

আব্দু বইখানা তুলিয়া বলিল, "এই যে চমৎকার রয়েছে।" দাদাজী চশমাটি চোখে পরিয়া বলিলেন, "ওতে কি বরাবর নিজেকে আট্‌কে রাখ্‌তে পার্‌বে ভাই?—তুফান যদি জোরে আসে তা'হলে যে নোঙ্গর সুদ্ধ উপ্‌ড়ে ফেলে।"

আব্দু তাঁহার পায়ের কাছে মাথা ঠেকাইয়া বলিল, "আমি যে বন্দরে আশ্রয় নিয়েছি।"

দাদাজী সস্নেহে তাহার শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, "ভগবান্ তোমায় রক্ষা করুন। আমি কিন্তু ঘটকালি সুরু করি।"

আন্দু ব্যগ্রভাবে হাত জোড় করিয়া বলিল, "আর কিছু দিন যাক, সংস্কৃত শেখা শেষ হয়ে যাক্ দাদাজী, তারপর আপনার যা খুসী হয় কর্বেন।"

দাদাজী তাহাকে টাকা কড়ি জমাইয়া ঘরবাড়ী করিতে উপদেশ দিলেন। আন্দু হাসিল।

থানা হইতে দাদাজীর বাড়ী অনেক দূর বলিয়া আন্দু প্রত্যহ দাদাজীর কাছে আসিতে পারিত না। দুই এক দিন অন্তর আসিয়া পাঠাভ্যাস করিয়া পরীক্ষা দিয়া তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া যাইত।

এইরূপে চার মাস বেশ কাটিল। তাহার কর্ম্মকুশলতা ও দয়াদাক্ষিণ্যের প্রভাবে, চারিদিকে সম্ভ্রম এবং শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল।

মুসলমানপাড়ায় সর্দ্দার-মিস্ত্রি মহম্মদের বাড়ীতে এক কুস্তীর আড্ডা পাতিয়া প্রতি-সপ্তাহে দুই দিন করিয়া আন্দু বালক ও যুবকদের পর্য্যায় ক্রমে কুস্তিখেলা শিখাইতে আরম্ভ করিল। মহম্মদের সহিত তাহার বন্ধুত্বও খুব গাঢ় হইল। জনপ্রিয় আন্দুকে সকলেই বিশেষ রকম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত ভালবাসিত। আন্দু ব্যায়ামের মাহাত্ম্য নিজের জীবনে ভালরকম বুঝিয়াছিল বলিয়া সকলকেই সেটা বুঝাইবার জন্য ব্যগ্র ছিল।

আন্দুর বিস্তর রকমের বিস্তর বন্ধু জুটিয়া গেল। কাহারো প্রতি তাহার ঔদাসীন্য ছিল না, তাহার অসীম উদারতার নিকট সকল কার্পণ্য পরাভব মানিত। বিচিত্র চিত্তের বিচিত্র সংঘাতে যখন নিজের চিত্তের মাঝে ক্লান্তি বা উত্তেজনা অনুভব করিত, তখনই সে দাদাজীর বাসায় ছুটিত। দাদাজীর শান্ত সংসর্গটিই তাহার জীবনের এখন শ্রেষ্ঠ সম্পদ্

হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আপনার মধ্যে দাদাজীকে ঘনিষ্ঠভাবে অবলম্বন করিয়া সমস্ত সংসারের মধ্যে আপনাকে নির্ভীক তৃপ্তিতে ছাড়িয়া দিল। মানুষে মানুষের নির্ভর,—কথাটা শুনিলে আন্দু আগে হাসিত, কিন্তু এখন নিজের মধ্যে, মানুষের পক্ষে মানুষের প্রয়োজন কিরূপ গুরুতর তাহা অনুভব করিয়া বিস্মিত হইয়া গেল। ইহা কি হৃদয়ের প্রেমপ্রশস্তির লক্ষণ,—না দীনদৌর্ব্বল্যের পরিচয় ?

১৯

পুলিশ আইনের কুটিল মারপ্যাঁচের মধ্য দিয়া শাসন-রহস্যের কৌতুকাবহ ঘটনাবলী আন্দুর হৃদয়ের একটা প্রান্ত এমনি তীব্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল যে, আন্দু তাহাতে সময় সময় স্পষ্টতঃ হৃদয়ে দগ্ধ-যন্ত্রণা ভোগ করিত। সবইনেস্‌পেক্টার মহিমারঞ্জন বাবু আন্দুকে বড় ভাল বাসিতেন; তিনি প্রায়ই পরিহাস করিয়া বলিতেন যে আন্দুর বিনয়াবনত কোমল চেহারাটির সঙ্গে পুলিশের বেণ্ট ব্যাটন ইউনিফরমের মোটেই সামঞ্জস্য হইতেছে না, অতএব আন্দু যদি পুলিশের চাকরী বজায় রাখিতে চায়, তাহা হইলে লাল পাগড়ীর সহিত, নম্র চক্ষু দুটিকে সমান রুক্ষ কঠোরতায় শানাইয়া লাল করিয়া লউক, নচেৎ সে নিশ্চিত লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে। আন্দু দাদাজীর সৌম্য সুন্দর মাধুর্য্য আপন মর্ম্মের মধ্যে দৃঢ় স্থিরতায় নিরীক্ষণ কবিয়া স্মিত হাস্যে উত্তর দিত,—লাল চোখ বাহির করিতে যাইলেই তাহার মাথা ধরিয়া উঠে, সুতরাং পারত পক্ষে মিষ্ট মুখে কার্য্যোদ্ধারই শ্রেয়স্কর,—কারণ মাথা ধরিয়া পীড়িত হইলেই লক্ষ্যভ্রষ্টের সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অধিক।—ছোট বাবু হাসিয়া বলিতেন, পুলিশের শাসনবিধি যে নিষ্ঠুরতায় ধনুষ্টঙ্কার

ব্যাধির মত তেউড়িয়া বাঁকান; আকণ্ঠ পূর্ণ করিয়া সন্দেশ রসগোল্লা ভক্ষণ করিলেও—এই দুরন্ত ব্যাধিগ্রস্ত জীব মিষ্টের আস্বাদ মোটেই টের পায় না—তাহার রসনায় সংলিপ্ত থাকে শুধু লঙ্কার চিড়্‌বিড়ে ঝাল।

দেশের দুর্বৃত্ত দলনের ভার যাহাদের হাতে ন্যস্ত,—তাহাদের সকলের পক্ষেই যে খুব সুবৃত্তি পরিচালিত উন্নত নির্ম্মল চরিত্র ব্যক্তি হওয়া উচিত,—একথা শাসন-তন্ত্রের উপদেশ বিধানের পৃষ্ঠায় যত বড় জোর-কলমেই লেখা থাক, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ইহার সার্থকতা খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই কঠিন। নিরন্তর, কুৎসিত কর্ম্মী নীচ-বৃত্তি পরায়ণ মানব শ্রেণীর সংসর্গ সংঘাতে,. ইহাদের হৃদয় স্বভাবতঃই অনেকটা ক্রূর নির্দ্দয় ও সন্দিগ্ধ ভাবাপন্ন হইয়া উঠে,—তাহার উপর অবাধ প্রভুত্ব ক্ষমতাবলে ইহাদের মধ্যে অনেকেই নৈতিক জীবনের লক্ষ্য ভুলিয়া,—উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠে!

কিছু দিন হইতে সহকর্ম্মিগণের গোপন আচার ব্যবহার লক্ষ্য করিয়া,—আন্দুর মন ঘৃণায় ও পরিতাপে উত্ত্যক্ত হইয়া উঠিল। আন্দু দেখিল, শান্তি রক্ষা বিভাগে,—শাসনের উগ্র-আতিশয্য যতই থাক, কিন্তু সুবিচারের বাতাস সেখানে বড় একটা নাই,—বিশেষতঃ পুলিশ লাইনের নিম্নশ্রেণীর মূর্খগুলার কাছে! আন্দুর অসহ্য বোধ হইল। সে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা ভুলিয়া,—পাশাপাশি সহকর্ম্মি-গণের স্বভাব সংশোধনে মনোযোগী হইল।

কিন্তু আন্দুর অকপট আন্তরিক সদিচ্ছা, অন্য পক্ষে বিষম বিদ্বেষ-বিদ্রোহিতা জাগাইয়া তুলিল। আন্দুর অনধিকার চর্চ্চা-প্রিয়তা কাহারও কাহারও পক্ষে মারাত্মক ভয়ের বিষয় হইয়া উঠিলেও মজ্জাগত অভ্যাসের দাবী কেহই ছাড়িতে পারিল না, পায়ে পায়ে মনোমালিন্য ঘটিতে

লাগিল,—চেষ্টা-প্রতিহত আন্দুর জেদ বাড়িল, ফলে কেহ কেহ তাহার উপর মর্ম্মান্তিক চটিয়া উঠিল।

আন্দু কাহারও অন্ন মারিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, সুতরাং হাতে-নাতে দুষ্ক্রিয়া ধরিয়া,—গোপনে শাসন করিয়া সদয় ভাবে যাহাদের ছাড়িয়া দিল,—তাহারাই তাহার গোপন-শত্রু হইয়া রহিল!

কিন্তু উপর্য্যুপরি আঁতে-ঘা খাইয়া শেষে আন্দুর মন দমিয়া গেল। চরিত্রহীন, মদ্যপ, সঙ্কীর্ণচেতা সহকর্ম্মিগণ, একযোগে রুখিয়া উঠিয়া, তাহাকে স্পষ্ট শ্লেষের সহিত ইতর-জনোচিত ব্যঙ্গ সহকারে জানাইয়া দিল যে, আন্দু যেন এই পরছিদ্রান্বেষণা বৃত্তি ছাড়িয়া, নিজের চরকায় তৈলদানে মনোযোগী হয়!

যথেষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া অপমানিত আন্দু আপনাকে সংযত করিয়া লইল। ক্ষুব্ধ মনস্তাপ নিঃশব্দে নিজের মধ্যে পরিপাক করিয়া নীরব রহিল, নিশ্চিত বুঝিল—ইহারা আইনতঃ, শাসনের শক্ত পদাঘাতকেই সম্মান করিয়া শত হস্ত পিছাইবে, কিন্তু সৌহৃদ্যের স্নেহ-আলিঙ্গনের অনুরোধে দয়া করিয়া একপদও হটিবে না! অতএব ইহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের একমাত্র উপায় আইনের তরফ হইতে নিষ্ঠুর শাস্তি দান! কিন্তু আন্দু সেরূপে প্রতিশোধ স্পৃহা চরিতার্থ করিতে অক্ষম, মিত্রতার দ্বারা যাহাদের স্বভাব সংশোধন করিতে পারিল না, শত্রুতার দ্বারা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া নিজের জেদ বজায় রাখা আন্দুর পক্ষে একান্ত অসম্ভব! বেদনাহত চিত্তে আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিয়া আন্দু প্রতিজ্ঞা করিল সে আর কাহারও দিকে দৃষ্টি রাখিবে না। থানার সম্পর্ক ছাড়া, আর কোন সম্পর্ক সংস্রবে কাহারও ছায়া মাড়াইবে না। ঘৃণা পীড়িত বক্ষঃ ভেদ করিয়া গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস উঠিল, আন্দু

নিজের গৃহে আসিয়া দ্বার রোধ করিল। নিশ্চিন্ত সহকর্ম্মিগণ নির্ভয় শান্তিতে দিন কাটাইতে লাগিল।

আন্দু চারিদিক্ হইতে বিক্ষিপ্ত চিত্তটা জোর করিয়া টানিয়া আপনার মধ্যে শান্ত সমাহিত হইয়া বসিবার চেষ্টা করিল। সহকর্ম্মীদিগের সহিত সংস্রব সংক্ষিপ্ত করিয়া বাহিরের অনাবশ্যক ব্যাগার খাটা বন্ধ করিয়া আপনার নির্জ্জন গৃহ-কোণটিতে আশ্রয় লইল। মহম্মদের বাড়ী একবার করিয়া যাইতে হয় তাই যাইত, কিন্তু উত্তমের উচ্ছ্বাস আর তেমন বেগে বিস্ফুরিত হইত না। জীবনের নির্ম্মল আনন্দ-স্রোতের মুখে কে যেন একখানা পাথর চাপাইয়া দিয়াছিল, আন্দু আপনাকে নির্ম্মম মাত্রায় সংযত করিয়া লইল। একটা দুঃসহ ক্লান্তি তাহার সমস্ত হৃদয়টা এমনি পীড়িত, এমনি বেদনাতুর করিয়া তুলিয়াছিল,—যে আবেগের মাত্রা পাছে কোথায়, কোন অসতর্ক বাতাসে, সীমার ঊর্দ্ধে উঠিয়া যায় এই ভয়ে সে সশঙ্ক হইয়া থাকিত। চারি দিকের দ্বন্দ্ব বিদ্বেষ রুক্ষ কঠোরতার অবিরাম প্রতিঘাতে দাদাজীর সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতেও তাহার এক এক সময় দ্বিধা ঠেকিত। দাদাজী কিন্তু তাহাকে এমনি আদরে এমনি সহৃদয়তায় বিমোহিত করিয়া লইতেন যে, তাঁহার কাছে আন্দু আপনার কোন অংশটা প্রচ্ছন্ন রাখিতে পারিত না।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন অপ্রতিহত গতিতে কাটিয়া চলিল। আন্দু আর কাহারও অন্যায় বড় একটা চোখ দিয়া দেখিত না। সমস্ত পৃথিবীর উপরই তাহার একটু প্রচ্ছন্ন অভিমান জাগিয়াছিল, সে আর কাহাকেও কিছু বলিবে না। পাছে বাহিরের দৃশ্য চোখে বেশী পড়ে বলিয়া, বা ঘটনাক্ষেত্রে পাছে অসহিষ্ণু হইয়া পড়ে বলিয়া সে অত্যন্ত নিঝুম হইয়া, যন্ত্রচালিতের মত দাসত্বের কর্ত্তব্যটুকু সারিয়া লইয়া গৃহকোণে বই

মুখে করিয়া নিরুদ্বেগে সময় কাটাইতে লাগিল। সময় সময় ছোট বাবুর কাছে গিয়া তাঁহার পুস্তকরাশি ঘাঁটিয়া-ঘাঁটিয়া, তাঁহার সহিত দেশ বিদেশের কথা কহিয়া, নিজ্জীব মনটাকে একটু সচেতন করিয়া লইয়া ফিরিত। ছোট বাবুর সহিত তাঁহার সখ্য ক্রমশঃই বেশী হইয়া উঠিল। ছোট বাবু খাস বাঙ্গালী লোক—থিয়েটারী উত্তেজনায় রাজস্থানের রাজপুত গৌরবাগ্নি তাঁহার মস্তিষ্কে প্রখর বেগে জ্বলিত। এক একদিন নির্জ্জন সন্ধ্যায়, অভিনয়-দৃষ্ট অভিজ্ঞতার প্রবল উচ্ছ্বাসে, গভীর বিক্রমে হাত পা ছুড়িয়া, লম্ফ ঝম্ফ করিয়া এমনি হাস্যোদ্দীপক বীরত্বাভিনয় করিতেন যে আন্দুরও পাকস্থলীতে বিষম বেদনা বোধ হইত। এইখানে যে তরল প্রমোদ-উত্তেজনাটুকু খানিক ক্ষণের জন্য আন্দুর চিত্ত উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত, বাসায় ফিরিবার সময় ঠিক ততটুকুই গাঢ় অবসাদ তাহার চিত্তটা তিক্ত নিরুৎসাহ করিয়া দিত। একদিক হইতে জমা, একদিক হইতে খরচ তাহাকে প্রবল বেগে পীড়ন করিতে লাগিল। দাদাজী তাহাকে সত্বর বিবাহের পরামর্শ দিলেন। সে কথা আন্দুর মর্ম্মে বিভীষিকার মত বাজিল। সে মাথা নাড়িল।

দেখিতে দেখিতে এক বৎসর কাটিয়া গেল, সাহেব তাহাকে প্রায়ই আদর করিয়া খাস কামরায় ডাকিয়া, স্বীয় কর্ত্তব্যের মধ্যে বুদ্ধি কৌশলের পরিচয়, বল বিক্রমের প্রভাব দেখাইতে উপদেশ দিতেন, এবং শীঘ্রই তাহার উন্নতির আশ্বাসও যথেষ্ট উৎসাহ সহকারে জানাইতেন। আন্দু নীরবে রহিত—হায় তাহার করুণ হৃদয় যে নির্দ্দয়তার পীড়নে আপনিই সঙ্কুচিত—শাসনের মধ্যে সে কি কৃতিত্ব দেখাইবে, সেখানে যে তাহার দুর্ব্বল হস্ত একেবারেই অবশ।

অশিষ্টের দমন? উত্তম প্রথা, কিন্তু মানুষ কি সাধ করিয়া অশিষ্ট

হয়? নানা অত্যাচার, নানা অভাব যে তাহাকে ক্রমশঃ ক্ষুব্ধ উন্মত্ত করিয়া দিনে দিনে তিলে তিলে দুর্দ্দান্ত দুষ্ট করিয়া তুলে। তাহার প্রতি নির্ম্মমতা প্রকাশে কি হাত উঠে? যদি একান্তই উঠাইতে হয়, তাহা হইলে, যে পারে সে উঠাক্, আন্দু পারিয়া উঠিবে না, পৃথিবীতে তাহার অন্য কাজ যথেষ্ট আছে। সকল কাজে সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিলাভ না করিলে মানুষ যদি একান্তই মানুষ হইয়া না উঠে তাহা হইলে, আন্দু ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জন্তুর শ্রেণীভুক্ত হইতে রাজী আছে, কিন্তু হিংস্রবৃত্তির তীব্র উদ্বোধনে কোন দিন অসতর্ক দোষীর ঘাড়ে দন্তাঘাত করিতে গিয়া নির্দ্দোষীর গ্রীবা হইতে রক্ত নিঃসৃত করিতে সে একান্তই অপারগ; আন্দু আপনার মধ্যে একটা ক্ষিপ্র বিষাদময় দুর্ব্বলতা ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিল। দূরদর্শী বিচক্ষণ দাদাজী ঠিক বলিয়াছিলেন তুফান জোরে আসিলে নোঙ্গর-সুদ্ধ উৎপাটিত হইবার সম্ভাবনা। আন্দু এতদিনে মানিল, যে, মুখে বলিলেও সে মনের সহিত এখনো বন্দরে আশ্রয় লইতে পারে নাই। আত্মপ্রত্যয়ে শিথিলতা দেখিয়া আন্দু আপনার মধ্যে ভয়াবহ যন্ত্রণা অনুভব করিল। সে দ্বন্দ্ব ছাড়িয়া বিশ্বের সহিত সন্ধির সন্ধান খুঁজিতে লাগিল। না হইলে সে যে আপনার মধ্যে আর জোর পাইতেছে না।

প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া আন্দু জানালার কাছে দাড়াইয়া জামা পরিতেছিল, হাতে বোতাম লাগাইতে গিয়া দেখিল হাতার কাছে অনেকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে, সেদিন শ্রীকৃষণ পাঁড়ের সহিত ধ্বস্তা-ধ্বস্তি করিতে গিয়া জামাটি সর্ব্বপ্রথম আহত হয়, তাহার পর কয়দিনের উপর্য্যুপরি ব্যবহারে আরো দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে।

সূচসূতা লইয়া আন্দু সেলাই করিতে বসিল। জামাটি আর বেশী দিন টিকিবে না, এবার একটি কিনিতে হইবে। এ জামাটি চৌধুরী-সাহেবের

বাড়ীতে থাকিতে নিজে কলে সেলাই করিয়া লইয়াছিল। ভাগলপুরের কথা মনে পড়িতেই—একটা সুদীর্ঘ বেদনাবহ নিশ্বাস পড়িল। দূর হোক, সে যে এ কথা ভুলিয়া থাকিতেই শান্তি পায়। জামাটি সেলাই করিতে করিতে আন্দু ভাবিল, দু-একদিনের মধ্যে আর-একটি জামা কিনিয়া লইয়া এটি কাহাকেও বিলাইয়া দিবে। তাহার অপ্রয়োজনীয় জিনিস নিশ্চয়ই অপরের প্রয়োজনে লাগিতে পারে।

আজ বিশেষ কোন কাজ নাই। আন্দু স্থির করিল, আজই সুবিধামত সময়ে একটা জামা কিনিয়া আনিবে। দ্বিতলের গবাক্ষ দিয়া ঘনশ্রেণীবিন্যস্ত সুদূরব্যাপী বৃক্ষশীর্ষগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একটু হাসিল—অভাব মানুষের অনন্ত, যতদূর দৃষ্টি চলে।

কাঠের ক্যাস-বাক্সটি খুলিয়া কয়মাসের মাহিনার টাকাগুলি মিলাইয়া দেখিল, পঁচাত্তর টাকার উপর আছে। আন্দু অবাক্ হইয়া গেল। এতগুলা টাকা তাহার হাতে ইহার মধ্যে জমিয়া গিয়াছে! কেহ তো তাহাকে রাখিতে দিয়া যায় নাই? টাকাকড়ির হিসাবে তাহার প্রায়ই ভুল হইত। সন্দিগ্ধ চিত্তে বাক্স খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিল একটা খুবরীতে কাগজে মোড়া ৩৲ রহিয়াছে, কাগজের গায়ে আন্দুর হাতে লেখা রহিয়াছে "মহাদেবের জমা, ১৪ই সেপ্টেম্বর"। বাকি টাকাগুলা সবই তাহা হইলে তাহার।

আত্মদ্বন্দ্বে বাহিরের সংবাদের আদান প্রদান বন্ধ হওয়ায় কয়মাস আন্দুর দানের হাত একেবারেই বন্ধ হইয়াছে। রাস্তাঘাটে বাহির হইলে যা দুই এক জনের খবর পায়, তাহাতেই পকেট খালি করিয়া, কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নিরীহ জীবের মত নিজের ধান্ধা ভাবিতে ভাবিতে—পাঁচ জনের কথা ভাবিতে, পাঁচ জনের মুখ চাহিতে ভুলিয়া গিয়া, নিজের

কোটরে আসিয়া ঢোকে, কাজেই মাহিনার টাকা জমিবে না ত কি হইবে? আব্দু ভাবিয়া দেখিল তাহার মনটা ইদানী বড় সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

এই-সব নিষ্করুণ-চিত্ত সহকর্ম্মীদিগের কঠোর সংস্রবে বাস করিয়া আব্দুর হৃদয়টাও কেমন শুষ্ক নির্দ্দয় হইয়া গিয়াছে, কাতরের অশ্রু এখন আর আব্দুর হৃদয়কে তেমন করিয়া গলাইতে পারে না, আর্ত্তের আর্ত্তনাদ আব্দুর বুকে আগেকার মত আর বাজে না, আব্দুর অন্তর দিন দিন কেমন কঠিন বিতৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার মানুষের মত মমতা-ভরা কোমলচিত্ত দিনের দিন যেন আড়ষ্ট পাষাণ হইয়া যাইতেছে, অলক্ষিতে—আব্দু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারে তাহার অন্তরে সঞ্চিত পরার্থপরতার স্নেহসুধা—অলক্ষিতে এখন স্বার্থের তিক্ত গরলে অনেকখানি কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। এখন পরের দুঃখ, পরের বেদনা অনুভবের সুতীক্ষ্ণ সকরুণ চিত্তশক্তির উপর একটা অন্ধ ঔদাসীন্যের যবনিকা পড়িয়াছে—সে যেন তাহারই বাহিরে নিশ্চিন্ত শান্তিতে থাকিবার জন্য ব্যগ্র; পরের কথা তাহার কানে এখন তেমন ভাল করিয়া পৌঁছে না, পরের ক্লেশ এখন তেমন গভীর ভাবে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহার এমনি অধঃপতন হইয়াছে।

সেই আলোকোজ্জ্বল প্রভাতের মাঝে আব্দুর মনটা সহসা অত্যন্ত মলিন হইয়া গেল। মানুষ অবস্থার দাস! কথাটা প্রকাণ্ড সত্য। ওর মধ্যে দুর্ব্বলহৃদয় কাপুরুষের জন্য অনেকখানি অক্ষম দীনতার করুণ সান্ত্বনা আছে। সহসা আব্দু উগ্রভাবে মুষ্টি উদ্যত করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যে অবস্থাকে নিজের দাস করিতে পারিয়াছে?—হাঁ তাহার পৌরুষের জয়! দেবতা! আব্দু জানালার গরাদে ধরিয়া বাহিরে মুখ বাড়াইয়া স্থির

দৃষ্টিতে প্রভাতপবনে নির্ম্মলগগনের নীচে পক্ষসঞ্চালনকারী পক্ষীকুলের নির্ভীক বিচরণ দেখিতে লাগিল। উড়ন্ত পাখী কি সুন্দর!

আব্দু ভাবিতে লাগিল, সে নিজের হৃদয়ের সজীবতা হারাইতে বসিয়াছে, অবস্থাচক্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে, তাহার উচ্চ মনোবৃত্তির পূর্ণ মাধুরিমা নিস্তেজ নির্জ্জীব হইয়া উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। আব্দু ছিল, মহিমাময় পরমেশ্বরের কর-সৃষ্ট সত্যকার মানুষ। এখন হইয়াছে, শয়তানের ইঙ্গিত-চালিত আত্মপরায়ণ প্রেত।

মর্ম্মান্তিক আত্মগ্লানিতে আব্দুর সমস্ত অন্তঃকরণটা পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। দাসত্ব ছাড়িয়া সে যদি স্বাধীনজীবী হইতে পারে, তাহা হইলে কি তাহার অপহৃত চিত্তশক্তি আবার ফিরিয়া আসে? কে জানে? কে বলিতে পারে? হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, সে ত আজিকার দাস নয়! অনেক দিনই দাসত্ব করিতেছে। বিপত্নীক পিতার সংশিক্ষায় সদৃষ্টান্তে না হয় তাহার বাল্যজীবনটাই শুভ্র শুচিতার নির্ম্মল বাতাসে নৈষ্ঠিক আনন্দে স্বচ্ছন্দে কাটিয়াছে। তাহার পর ত তাহাকে জগতের জনস্রোতে মিশিয়া, এলোমেলো ঝড়ঝাপ্টায় প্রচণ্ড প্রতিকূলতার সহিত যুঝিতে হইতেছে। চৌধুরীসাহেবের বাড়ীতেও ত তাহাকে দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করিতে হইয়াছে, কিন্তু সেখানে সে ত জানোয়ার বনিয়া যায় নাই। সেখানে সে নিজের অন্তরের মাঝে মানুষের সাড়া পাইত, দাসত্বের মধ্য হইতেও সে মহত্ত্বের মহিমালোক হইতে দৃষ্টিশক্তির নির্ব্বাসনদণ্ড পায় নাই, তাহার চিত্তশক্তি ত সজীব তেজস্বীই ছিল! শেষটা না হয় দায়ে পড়িয়া সরিতে হইল।

আব্দুর কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল। কত দিনের কথা, কিন্তু ভাবিতে আজিও তাহার চিত্তে অস্বস্তি আসে, পরের ক্ষুদ্র দুর্ব্বলতা, আজিও

তাহার চিত্তকে প্রপীড়িত করিয়া তুলে!—চিন্তাপ্রবাহ এইখানেই স্থগিত রাখিবার জন্য, আব্দু সবেগে মুখ ফিরাইয়া, দেয়ালের তাকের উপর হইতে একখানা ফার্শী বই টানিয়া লইয়া পড়িতে বসিল।

বইখানি পাঁচ ছত্র পড়িতে না পড়িতে সে আপনার কথা পরের কথা সব ভুলিয়া গেল। তদ্গতচিত্তে পড়িতে লাগিল, তাহার হাত-ঘড়িতে দম দিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, মনে রহিল না।

বারান্দায় দুপ্দাপ্ করিয়া দ্রুত পদশব্দ হইল, আব্দুর চমক ভাঙ্গিল। এ সকাল-বেলা দাসত্বজীবীর নিশ্চিন্ত আরামে বসিয়া থাকিবার সময় নহে। ত্রস্তে উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, রাস্তায় দাঁড়াইয়া ডাক-পিওন থানার কনেষ্টবলদের চিঠি বিলি করিতেছে। আব্দুর ত প্রবাসে আত্মীয় বন্ধু কেহ নাই, যে চিঠি দিয়া খোঁজ লইবে, সুতরাং তাহার আর পিওনের উপর দরদ কিসের? আব্দু উদাসীনভাবে ফিরিয়া আসিয়া পোষাক পরিতে পরিতে ভাবিল, পিওনের কণ্ঠধ্বনিতে সকলেই উৎসাহিত হইয়া ছুটিতেছে, শুধু সে-ই একলা নিশ্চিন্ত নিরুদ্যম! তাহার কি একান্তই ইহাতে যোগ দিবার কিছু নাই?—হঠাৎ আব্দুর প্রাণে কে যেন তপ্ত কঠিন বেত্রাঘাত করিয়া, তাহার প্রসুপ্ত চিত্তগ্লানি পুনরুদ্বোধিত করিয়া তুলিল। ওঃ! সেকি নির্দ্দয় স্বার্থপরতাই শিখিয়াছে! আর পাঁচজনের কুশলে প্রফুল্লমুখ দেখিয়া সে কি পরিতুষ্ট হইতে পারে না?—আগে তো সে এমন ছিল না, আগেও তো সে আর পাঁচজনের সুখ দুঃখের সংবাদের জন্য উৎকণ্ঠিত থাকিত—এখন কেন তা হয় না? এখন তাহার চিত্তের স্নিগ্ধ করুণ সহানুভূতির পূত তরল নির্ঝর, আদান-প্রদানের বিনিময়-ব্যভিচারে যেন কঠিন, অপবিত্র, ভাররুদ্ধ, স্তব্ধ! এখন সে মানুষের জন্য নিঃস্বার্থ মমতা খরচ করিতে কুণ্ঠিত!—দাদাজীর অমন মহানুভব উদার

সংসর্গ, এখন সে প্রাণ দিয়া পরিপূর্ণরূপে স্পর্শ করিয়া আপনার মধ্যে ধন্য হইতে পারিতেছে না, তাহার স্বচ্ছন্দ শান্তির গোপন আশ্রমটি ভাঙ্গিয়া কে যেন তাহাকে নিতান্ত নিরাশ্রয় অসহায় করিয়া পৃথিবীর বক্ষে ছাড়িয়া দিয়াছে। তাহার প্রকৃতির সহিত পৃথিবীর বিশাল আকৃতির যেন একটা মস্ত বক্র ব্যবধান হইয়া গিয়াছে, তাহার কোথাও যেন সে সুবিধা-মত নির্দ্বন্দ্ব ভাবে সংলগ্ন হইতে পারিতেছে না! ইহার হেতু কি শুধু আত্মাভিমান?—সত্যই আব্দুর শোচনীয় দৈন্য দশা আসিয়াছে!

ভাবিবার সময় নাই, এখনই বড় সাহেবের কামরায় যাইতে হইবে। আব্দু ইউনিফরম পরিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল, হাত-ঘড়িতে দম দেওয়া হইল না।

সাহেবের কামরায় আসিয়া দেখিল, সাহেব তখন চুরুট টানিতে টানিতে, চিঠিপত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, পাশেই নতুন ইনেস্‌পেক্টার মোহিনীবাবু নীরবে বসিয়া একখানা সরকারী পত্র দেখিতেছেন।

আব্দু যাইয়া সেলাম দিতেই, সাহেব চুরুটে লম্বা টান দিয়া বলিলেন, "আজই তোমাদের শাকারগঞ্জে রওনা হ'তে হবে। কাল মহরম। গেল বছর ঐ সময় সেখানে মারপিট হয়ে গেছে, এবারে তাই কড়া পাহারার বন্দোবস্ত কর্‌তে হবে।"

আদেশ শুনিয়া আব্দু সেলাম করিল। সাহেব চুরুটের ছাই ঝাড়িয়া পুনরায় বলিলেন, "সব্‌ইনেস্‌পেক্টার বাবুও আজ যাবেন, কাল এই ইনেস্‌পেক্টার বাবু যাবেন। তোমাদের সেখানে তাঁবুতে থাকতে হবে, পর্শু তোমরা তাঁবু তুল্‌বে। খুব সাবধানে নিয়ম বাঁচিয়ে কাজ কর্‌বে।"

আব্দু পুনরায় সেলাম দিয়া বাহিরে আসিল,—কাল মহরম উৎসব, তাহার মনেই ছিল না—কতকগুলো নূতন উৎসাহব্যঞ্জক কথা ভাবিয়া

ভারাক্রান্ত চিত্তটা প্রফুল্ল করিবার চেষ্টা করিল। কাল মহরম, মহা পর্ব্বোৎসব, কালকের শুভদিনে কারবালা ক্ষেত্রে কিছু দান করিয়া আন্দু সুখী হইবে!

দ্রুতপদে গিয়া ছোটবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, যাত্রার ব্যবস্থা সব ঠিক করিয়া, থানায় যে-সমস্ত কনেষ্টবল মেলায় যাইবে তাহাদের নামের তালিকা দেখিয়া জানিল, মাতাল রামলালও যাইবে। আন্দু ছোটবাবুকে একটু আগ্রহের সহিত বলিল, "আপনি সকলকে একটু জোর হুকুমে হুঁসিয়ার থাক্‌তে বল্‌বেন,"—

হতভাগ্য রামলালের জন্য তাহার বড় ভয়, পাছে সে মদ খাইয়া কিছু গোলমাল করে। ছোটবাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, "হাঁ হাঁ তোমায় সেই কথা বল্‌তেই খুঁজছিলুম, দেখ এই বরসজ্জায় সেজে, আজ্‌কে শুধু হাঁক ডাক করে বাসর জাগালেই চল্‌বে না, কালকে তোমায় গিরগিটি সেজে একচাল চাল্‌তে হবে,—এ পোষাক ছাড়া দুএকটা অন্য পোষাক সঙ্গে নিও, বুঝ্‌লে!"

আন্দু হাসিয়া উঠিল। বুঝিল অন্যবেশে তাহাকে পুলিশের লোকেরই ক্রিয়াকলাপের উপর গুপ্ত দৃষ্টিতে গোয়েন্দাগিরি করিতে হইবে। হোক ক্ষতি কি? সে পুলিশ হইয়া পুলিশের ত্রুটী সংশোধন করিয়া সাধারণের সুবিধা দেখিবে—তাহাতে অপমান কি? সাধারণের সম্ভ্রম শান্তিরক্ষার ভার যে তাহাদেরই হাতে।

ছোটবাবুর কাছে বিদায় লইয়া রাস্তায় বাহির হইল। বাজারে আসিয়া দেখিল অলস ঔদাসীন্যের ঝোঁকে সে না অনুভব করিতে পারিলেও, মহরমের জাঁকে চারিদিকই বেশ জমকাইয়া উঠিয়াছে; সকল মুসলমানই নূতন, অভাবে রজকালয়ের ফেরৎ, জামা কাপড় পরিয়া চক্‌চকে হইয়াছে;

দোকানে দোকানে বিষম ভিড়। আন্দুর মনটা চারিদিকের প্রফুল্লতায় বেশ মাতিয়া উঠিল। সেও দুই চারি দোকান ঘুরিয়া একজোড়া সৌখীন জুতা, গোটা দুই আধুনিক ফ্যাশানের বুকখোলা জামা, একজোড়া দেশী ধুতি, একটা চুড়িদার পাঞ্জাবী কিনিয়া ফেলিল। জিনিসগুলা লইয়া উঠিবার সময় তাহার একটু হাসি পাইল।

রাস্তায় চলিতে চলিতে আন্দু ভাবিল কাল সে গরীবের জন্য ভালরকম খরচ করিবে।

২০

থানা হইতে শীকারগঞ্জ ছয়মাইল দূর, সেইখানেই কারবালায় মেলা হইবে। তাড়াতাড়ি স্নানাহার সমাধা করিয়া আন্দু দলবল সকলকে গুছাইয়া অগ্রসর করিয়া দিয়া, নিজেও রওনা হইল, পশ্চাতে ছোটবাবু ঘোড়ায় আসিবেন, কথা রহিল।

থানা হইতে বাহির হইয়া বরাবর পাকা রাস্তা ধরিয়া দীর্ঘ তিন মাইল পথ আন্দু একাকী গান গাহিয়া শীস্ দিয়া চলিয়া যাইবার পর, দূরে এক সাইকেল-আরোহী দেখিতে পাওয়া গেল। রাস্তার বাঁ ধারে এক বটগাছে একটি ছোট পাখী গান করিতেছিল, আন্দু তাহার পানে চাহিয়া ঊর্দ্ধমুখে শীস্ দিতে দিতে চলিয়াছিল, দেখিতে দেখিতে সাইকেল-আরোহী খুব নিকটবর্ত্তী হইল।

"এ কি আন্দু!"—অকস্মাৎ ব্যগ্র আনন্দে উচ্চধ্বনি! পরমুহূর্ত্তে ব্রেক টানিয়া আরোহী নীচে নামিল। চমকিত আন্দু চাহিয়া দেখিল—পরিমল!

সরল প্রীতি-উদ্ভাসিত হাসিতে আন্দুর মুখমণ্ডল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। "আপনি, সাহেব! সেলাম সেলাম!—ভাল আছেন ত? সাহেব, মাইজী সাহেব, খুকুমণি, ছোট সাহেব, সব কেমন আছেন? ভাল ত?" আন্দু

সাইকেল ধরিয়া দাঁড়াইল, আনন্দে তাহার বুক মুহূর্ত্তে এমনি ভরিয়া উঠিল, যে, অন্য চিন্তার স্থানমাত্র রহিল না !

প্রফুল্ল বিস্ময়ে সকলের সুস্থ সংবাদ দিয়া পরিমল বলিল, "তুমি পুলিশের পোষাকে যে ?"

ক্লিষ্ট হাসিতে আন্দু বলিল "এই কাজই নিয়েছি।"

উৎফুল্ল মুখে পরিমল বলিল, "তবু ভাল, আমরা সবাই মনে করেছিলুম, তুমি বুঝি যুদ্ধে কাজ করতে গেছ। আচ্ছা, আন্দু, তুমি আমাদের না বলে কি করে পালিয়ে এলে ?"—

বড় কঠিন প্রশ্ন !—আন্দু দেড় বৎসর ধরিয়া, প্রবল চিন্তাস্রোতের মাঝে অস্পষ্ট ক্ষীণ ভাবে এই কথাটার জবাব কি একটা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল—এখন অতর্কিতে সেই প্রশ্নের পুরোবর্ত্তী হইয়া, সেই বহুঅলঙ্কার-মণ্ডিত রং-চঙে জবাবটা সহসা থতমত খাইয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল। অপ্রস্তুত আন্দু একটু ইতস্ততঃ করিয়া জবাব দিল, "আজ্ঞে আমার ত আস্‌বার ঠিক ছিল না, হঠাৎ জরুরী কাজের তাগাদা পেলুম, চলে এলুম !—আপনাদের বলবার ফুরসুৎ হ'ল না!" দ্রুতভাষী পরিমল উৎসুক ব্যগ্রতায় বলিল, "সেই শিখ পালওয়ানের সঙ্গে খেলা কর্‌বার ভয়ে তুমি পালিয়েছিলে—নয় !"

আন্দু পথ পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ—খেল্‌ব না বলেই ত পালিয়েছিলুম !"

পরিমল বলিল, "কেন ?"

আন্দু চট্ করিয়া জবাব জোগাইল, "আজ্ঞে পণ্টনের কাজে ঢোক্‌বার তখন ভারি জিদ্ ছিল, খেল্‌তে গেলে পাছে হাড় জিতের ফেরে পড়ে লোকটাকে চটিয়ে মতলব মাটি করে ফেলি, এই ভয়ে পালিয়েছিলুম !"

অপরিণতবুদ্ধি পরিমল আন্দুর কথাই বিশ্বাস করিয়া শুধু দুঃখিত ভাবে বলিল, "তারপর আর ফির্‌লে না কেন?" আন্দু আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে তার পরই মিলিটারি ডিপার্টমেণ্টে সব খোঁজ খবর নিতে কর্‌তে [illegible]ক চক মিছে কেটে গেল, তারপরই পুলিশে এই চাকরিটা জুট্‌ল।"

অধিকতর ক্ষুণ্ণ মুখে পরিমল কি বলিতে উদ্যত হইতেছে দেখিয়া তাড়াতাড়ি আন্দু বলিল, "ভাল কথা, আপনি এখানে কোথায় রয়েছেন, কবে এলেন?"

উত্তেজিত আনন্দে পরিমল বলিল, "মহরমের ছুটিতে কাল এসেছি, এইখানেই আছি, এইখানেই যে দিদি, জামাইবাবু, সব রয়েছেন। দিদির বিয়ে হয়েছে জান?"—

নিতান্ত অবিচলিত ভাবে আন্দু বলিল, "হ্যাঁ সে সব ঠিকঠাক শুনে এসেছিলুম,"—যেন সে জানিয়াও আসিয়াছিল।

পরিমল স্বভাবসিদ্ধ দ্রুতস্বরে সংলগ্ন অসংলগ্ন প্রক্ষিপ্ত নানা কথা কহিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, "চল দিদির সঙ্গে দেখা করে আস্‌বে চল।"

আন্দুর মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সে ত্রস্ত হইয়া, চাকরীর দোহাই দিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিল, পরিমল কিন্তু কিছুই মানিল না, বলিল, "ডাক্তার সাহেবের শরীর খারাপ, তাই মাস দুয়েকের জন্যে হাওয়া খেতে এসেছিলেন, আমি এঁদের দিতে এসেছি, বোধহয় পর্শু-ই আমরা চলে যাব। তুমি আবার কবে দেখা কর্‌তে আস্‌বে?"

হায় হায়! আন্দু কি জবাব দিবে? পরিমল তাহাকে পাকড়াইয়া লইয়া চলিল। দুশ্চিন্তাপীড়িত আন্দু যখন দেখিল একান্তই পরিত্রাণের উপায় নাই, তখন প্রসঙ্গান্তরে মনটা সুস্থ করিয়া লইতে সচেষ্ট হইল।

ভাগলপুরের প্রত্যেক পরিচিত লোকের সংবাদ খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আখড়া, ওস্তাদ, ভবতারণ, লছমী ভকত, সকলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। পরিমল চলিতে চলিতে উৎসাহিত আনন্দে সকলের আনুপূর্ব্বিক সংবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিল। লছমী ভকত এখন খুব ভাল হইয়াছে, আন্দুর কথা সে প্রায়ই সকলের কাছে বলে। আন্দু যেদিন চলিয়া আসে, তাহার পরদিন যখন তাহার পলায়ন-বৃত্তান্ত চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, তখন কে কিরূপ গভীর পরিতাপ করিয়াছিল, চৌধুরী-সাহেব কিরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন, কয়দিন তাহার কিরূপ খোঁজ খবর কোথায় কোথায় লইয়াছিলেন, পিয়ারী সাহেব মোটর চালাইতে আসিয়া প্রথম প্রথম কিরূপ অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছিল, সমস্ত পরিমল আগাগোড়া বলিল। আন্দু সকৌতুকে শুনিতে শুনিতে চলিল। তারপর বাহিরের প্রসঙ্গ শেষ করিয়া সে যখন লতিকার বিবাহের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণন করিল,—তখন ঘন নিশ্বাসে পরিস্ফুট, উচ্ছ্বসিত-চিত্তভার দমন করিয়া, নতদৃষ্টিতে সাইকেলের ঘণ্টাটা বাজাইয়া, অকারণে আন্দু সারা পথ মুখরিত করিয়া তুলিল! আজ পরীক্ষায় জয়লাভের উল্লাসে তাহার সারা বক্ষ তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল!—এই ভাল এই হওয়াই সব চেয়ে ভাল!

পরিমল আপন মনে তাহাকে গল্প শুনাইতে শুনাইতে চলিয়াছে।

একটা মস্ত গোলাপী রঙের বাংলা বাড়ীর সামনে সবুজ রেলিং-ঘেরা বাগানের গায়ে ফটকের সামনে আসিয়া পরিমল বলিল, "এই বাড়ীতে দিদিরা আছে।"

সহসা আন্দুর সর্ব্বশরীরের শোণিত যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। আজ এত দিনের পর—সেই সাক্ষাতের পর এই সাক্ষাৎ! লতিকা কি মনে করিবে তাহাকে দেখিয়া!—

আন্দুর ইচ্ছা হইল সেইখান হইতে সে ছুটিয়া ফিরে। তাহার ললাটে ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। সে ব্যাকুলভাবে একবার রাস্তার প্রান্ত অবধি চাহিয়া দেখিল, যদি ছোটবাবুর ঘোড়া আসিতে দেখা যায়,—তাহা হইলে সেই উপলক্ষ করিয়া যে সে পলাইয়া বাঁচিবে। কিন্তু আন্দুর দুরদৃষ্ট, কেহই রাস্তায় নাই!

পরিমল অগ্রসর হইয়া সামনে ফুলের-টব-সাজান প্রশস্ত সোপানযুক্ত দীর্ঘ বারান্দায় উঠিল; ঘনকম্পিত হৃৎপিণ্ডের প্রচণ্ড আস্ফালনে পীড়িত আন্দু সাইকেলটা কাঁধে তুলিয়া নতশিরে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া বারান্দায় একটা থামের গায়ে গাড়ীখানা ঠেসাইয়া রাখিল।

বারান্দার কেম্বিসের চেয়ারে, পায়ের উপর পা তুলিয়া আড় হইয়া শুইয়া সাহেবী-পোযাক-পরা, পাৎলা চেহারার, ময়লা রংয়ের এক বাঙ্গালী সাহেব বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। পাশে টুলের উপর তাঁহার হ্যাট্ ও ছড়ি রহিয়াছে। সাদা-চাপ্‌কান্-পরা একজন খানসামা, চা ও বিস্কুট লইয়া ঘরের মধ্য হইতে বাহিরে আসিল। পরিমলদের জুতার শব্দে ও খানসামার আগমনে, সাহেব কাগজ হইতে চোক তুলিয়া পরিমলকে কি বলিতে যাইতেছিলেন, সহসা তাহার পিছনে আর-একজন পুলিশের লোককে দেখিয়া— সবিস্ময়ে বলিলেন,— "একি!"

পরিমল সংক্ষেপে আন্দুর পরিচয় দিল; আন্দু বুঝিল ইনিই পরিমলের ভগ্নীপতি; সে সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম দিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব টুলের উপর টুপী-ঢাকা একখানা টেলিগ্রাম বাহির করিয়া বলিলেন, "শ্বশুর-মশায় টেলিগ্রাম করেছেন, তাঁর বন্ধুটি মারা গেছেন, আমাদের পশু ফির্‌তে হবে।"

"মারা গেছেন! আহা!" পরিমল টেলিগ্রামটা তুলিয়া লইল,

দেখিয়া আবার যথাস্থানে রাখিয়া বলিল,—"দিদি শুনেছে?—আহা বেচারী। ছেলেটি নেহাৎ ছোট।"

"হুঁ!"—বলিয়া ডাক্তার-সাহেব পেয়ালায় চুমুক দিলেন। আব্দুর পানে চাহিতেই তাহার উদ্বেগপূর্ণ দৃষ্টি দেখিয়া পরিমল বলিল,—"দিদির সঙ্গে ভাগলপুর গেছ্‌লো সেই যে জ্যোৎস্নাদেবী"—

চমকিত আব্দু বলিল, "হাঁ হাঁ—"

"তাঁরই বাপ মারা গেছেন! জ্যোৎস্নার স্বামী আমেরিকায় গিছ্‌লেন, আস্‌বার সময় জাহাজে মারা যান। সেই শোকে তাঁর বাপও আজ ক'দিন হ'ল মারা গেছেন! আহা কি দুঃখ!"

আব্দুর মনে ধক্ করিয়া ঘা লাগিল! আহা তেমন সুন্দর মেয়েটি! কি দুঃখ!

পরিমলের পানাহার্য্য আসিল। পেয়ালার দিকে চাহিয়া পরিমল বলিল, "ওকি কোকো? আব্দু খাবে?"

পরিমলের সৌজন্যে আব্দুর ক্লিষ্ট চিত্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সদ্যশ্রুত দুঃসংবাদে তাহার মনটা বড়ই ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে এই অপরিচিত ব্যক্তির গৃহে অনাহূত ভাবে ঢুকিয়াই তাহার বিনা আমন্ত্রণে কোন্ নির্লজ্জ দৈন্যে পেয়ালার জন্য হাত বাড়াইবে? আব্দু মাথা নাড়িল, "না সাহেব, আমায় এখনি যেতে হবে।"

এই সময় ভিতর হইতে আর একজন খানসামা বাহিরে আসিয়া অনুচ্চ স্বরে ডাকিল, "লাল্লু আও, ফুড্ হোগিয়া—"

বাহিরের রেলিং-ঘেরা বাগানের হাতার মধ্যে একজন চাকর একটি ছোট শিশুকে লইয়া বেড়াইতেছিল। আব্দু তাহাকে এতক্ষণ দেখিতে পায় নাই। খানসামার ডাকে সে হন্ হন্ করিয়া আসিয়া বারান্দায়

উঠিল। ডাক্তার-সাহেব পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে তাহার দিকে কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। কাছাকাছি হইতেই তীব্র স্বরে ধমক দিলেন—"এইও উল্লু—বেবিকো জুতি কাঁহা ?"

উল্লু অত্যন্ত থতমত খাইয়া বলিল, "পিন্‌হাতে সাব্।"

"জল্‌দী যাও,"—সাহেব পেয়ালা শেষ করিয়া নামাইয়া রাখিয়া রুমালে মুখ মুছিলেন। চাকরটা ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল। আন্দু অসহিষ্ণু চিত্তে বিদায়ের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। পরিমল ত অকাতরে বিস্কুট কোকোয় মজিয়াছে, এখন সে কি ছলে বিনয় বজায় রাখিয়া বিদায় লয়।"

আন্দু মাথার পাগড়ী খুলিয়া, ঘর্ম্মাক্ত চুলগুলিকে অঙ্গুলিসঞ্চালনে কপালের উপর হইতে পিছন দিকে টানিতে টানিতে বারান্দার ও-ধারে টবের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সাহেব চুরুট ধরাইয়া হ্যাট ও ছড়ি তুলিয়া বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন, সিঁড়িতে নামিতে নামিতে আন্দুর পানে চাহিয়া বলিলেন, "বসহে।"

আন্দু মাথা নোয়াইয়া বলিল, "আজ্ঞে আমাকে এখনি যেতে হবে, আর বস্‌ব না।"

সিঁড়ির গায়ে ছড়ি ঠুকিয়া সাহেব বলিলেন, "কোথা ?"

"শীকারগঞ্জের মেলায়।"

"ওঃ! বাড়ীতে দেখা করে যাও।" সাহেব চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। আন্দু দেখিল, লতিকা দেবী যোগ্য পাত্রেই পড়িয়াছেন, কিন্তু এসব বিবেচনার অধিকার তাহার নাই। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, পরিমলের খাওয়া শেষ হইয়াছে। বলিল, "ছোট সাহেব, তাহ'লে আসি দাদা, সেলাম!"

"ওকি, বাঃ! দিদির সঙ্গে দেখা করবে না? চল।"—পরিমল অগ্রসর হইল। শুষ্ক-তালু আন্দু প্রাণপণে মুখের উদ্বেগ-চিহ্নটা বদলাইয়া, তাহার পশ্চাৎগামী হইল।

বারান্দার দুপাশে দুখানা ঘর; মাঝে লম্বা হল। পরিমলের সহিত হলঘরে ঢুকিয়াই আন্দু দেখিল, হলঘরের মেজেয় বসিয়া একজন দাসী, সেই শিশুকে কোলে লইয়া বোতলে দুগ্ধ পান করাইতেছে, আর নিকটে বসিয়া সাহেবের সেই "উল্লু" চিহ্নিত, নিতান্ত নিরুপায় আকৃতির জীবটি শিশুকে মোজা জুতা পরাইতেছে। কৌতূহলপূর্ণ চক্ষে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া শিশুর পানে চাহিয়া আন্দু মৃদুস্বরে বলিল, "খুকিটি কার?"

পরিমল বিস্ময়-উদ্দীপ্ত স্বরে বলিল, "দিদির মেয়ে হয়েছে তাও জান না?"

আন্দুর যেন মহৎ দুর্ভাবনা ঘুচিল। উল্লসিত হইয়া বলিল, "বটে! বাঃ! বেশ ত খুকিটি!" হাঁটু পাতিয়া নত হইয়া হর্ষোৎফুল্ল মুখে খুকিকে চুম্বন করিল; দাসীটা খুকিকে একটু তুলিয়া ধরিল; আন্দু সন্তর্পণে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। এসেন্স, পাউডার, ব্লুম, টীপ, জামা, জুতায় মেয়েটিকে বেশ মানাইয়াছিল, আন্দু তাহাকে দুইহাতে ধরিয়া লুফিয়া লুফিয়া আদর করিতে লাগিল। মেয়েটি তিন চার মাসের, বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট।

আন্দুর নড়িবার গতিক নহে দেখিয়া পরিমল বলিল, "চল হে, কর্ত্তব্য-প্রিয় পুলিশ মহাশয়, সময় নষ্ট করছ কেন?"

আন্দু সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "খুকিটি চমৎকার হয়েছে।"

পাশের ঘরের দ্বারে সবুজ শার্শীর অন্তরাল হইতে একজন উকি দিল। দাসীর সহিত তাহার চোখোচোখী হইবামাত্র দাসী একটু হাসিয়া উঠিয়া

দাঁড়াইল। চাকরটাও মাথা ফিরাইয়া সেই দিকে চাহিল। পরিমল চাকরটার দৃষ্টি অনুসরণে সেই দিকে চাহিয়াই হাসিয়া উঠিল, "এই যে দিদি, এস এ ঘরে, দেখসে কে এসেছে!" আন্দু উৎসুক হইয়া চাহিয়া দেখিল, কাঁচের দ্বার খুলিয়া আসিতেছে লতিকা! সেই লতিকাই বটে, গর্ব্বিত গৌরবে বিলাস বৈভবে, সৌভাগ্য শ্রীতে উজ্জ্বলা লতিকাই বটে! লতিকা এখন আর অভিমান উচ্ছলা, ঝঙ্কার মুখরা, পিত্রালয়ের আদরের তুলালি নহে, সে এখন সন্তানের জননী—গৃহের গৃহিণী! আন্দু পূর্ণ আগ্রহে, পরীক্ষকের দৃষ্টিতে চাহিল। না, সহস্র পরিবর্ত্তনের মধ্যে লতিকার নিজস্ব মূর্ত্তিটি ঠিক অপরিবর্ত্তনীয় আছে, লতিকা সেই লতিকাই বটে! তাহার বদনের গাম্ভীর্য্যে, গমনের স্থৈর্য্যে, মৃদুতার লেশ মাত্র নাই—আছে শুধু দম্ভস্ফীত, বিকৃত উগ্রতা! সে যেন কি একটা কে মহা-মহাজন হইয়া পড়িয়াছে, এমনিতর উদ্ধত ভাবখানা!

আন্দুর বাহুমূল ধরিয়া, তাহাকে টানিয়া ফিরাইয়া পরিমল বলিল, "একে চিনিতে পার?"

লতিকা তাচ্ছিল্য দৃষ্টিতে ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "আন্দু না?"

লতিকার তাচ্ছিল্যে আন্দুর রক্তকেন্দ্রের জমাট রক্ত-রাশিতে আবার যেন তরল জীবনপ্রবাহ ফিরিয়া আসিল; সে নত মুখে অভিবাদন করিয়া বলিল, "জী হুজুর।"

সহসা তাহার জ্যোৎস্নাকে মনে পড়িল, আহা!

লতিকা গ্রীবা বাঁকাইয়া, বাম স্কন্ধের ব্রুচ্‌টা খুলিতে লাগিল।

আন্দু খুকির চিবুকে আঙ্গুলের টোকা মারিয়া আদর করিতে লাগিল।

লতিকা ব্রুচটা খুলিয়া হাতের চুড়িতে সেটা আটকাইয়া রাখিয়া বলিল, "পরিমল, বাবার টেলিগ্রাম এসেছে।"

পরিমল বলিল, "হাঁ সে দেখ্‌লুম্, আহা, শুনে আমার ভারি দুঃখ হচ্ছে।"

লতিকা বিবেকপ্রবুদ্ধ বৈরাগীর মত মহা নিশ্চিন্ত মুখে বলিল, "ওর আর দুঃখ করে কি হবে? এ ত সকলের আছে। এখন আমাদের যাওয়ার উজ্জুগ কর।"

আন্দু অন্তরে চমকিয়া লতিকার মুখের পানে তাকাইল। লতিকার সত্যই এতখানি তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে? সেও না জ্যোৎস্নারই মত—পিতার কন্যা, পতির পত্নী! সে আজ জ্যোৎস্নার সাংঘাতিক সর্ব্বনাশের সংবাদে এতটুকু শিহরিল না? ধন্য মেয়ে বটে!

চাকরটা দেওয়ালের গায়ে মিশিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, আন্দু তাহার কাছে আসিয়া তাহার কোলে খুকিটিকে দিল। লতিকা পরিমলের সহিত যাত্রার ব্যবস্থা :লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। আন্দু চাকরটার কাছে একখানা চেয়ারে ভর দিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইয়া, উর্দ্ধদৃষ্টিতে দেওয়ালের ছবিগুলো দেখিতে লাগিল।

বাড়ী ঢুকিতে তাহার যে আতঙ্ক অন্তরে জাগিয়াছিল এখন তাহা নিঃশব্দে মরিয়া গেল দেখিয়া, সে অত্যন্ত শান্তিবোধ করিল। কিন্তু এ বিরক্তিকর 'বড়লোকী' বিড়ম্বনার মধ্যে বেশীক্ষণ অবস্থান করিলে তাহার মত ক্ষুদ্র প্রাণী দম বন্ধ হইয়া মরিবে। আন্দু অনাবশ্যক ব্যস্ততায় চেয়ারটা সশব্দে সরাইয়া রাখিয়া বলিল, "আপনাদের পরশু যাওয়াই ঠিক হ'ল?"

লতিকা চক্ষু আকুঞ্চিত করিয়া টানা গম্ভীর আওয়াজে বলিল, "হুঁ— তাই হ'ল বৈকি।"

আন্দু তাহার সে ভঙ্গী দেখিয়াও দেখিল না, পরিমলকে বলিল— "সাহেবকে মাইজীকে আমার সেলাম দেবেন। আমার তো আর সময় হ'বে না, না হলে পশু এসে একবার দেখা কর্‌তুম।"

লতিকা হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল,"তুমি শুদ্ধ চল না আমাদের সঙ্গে ?"

আন্দু হাসিল, "আমার যে চাকরী রয়েছে।"

প্রবল তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বাঁকাইয়া লতিকা ঠাকুরাণী জবাব দিলেন, "ওঃ! চাক্‌রী!"

আন্দু বলিল, "আমি তবে এখন আসি, অনেক দেরী হয়ে গেল, তারা আবার আমায় খুঁজ্‌বে।"

আন্দুর এমনি ঔদাস্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা, এমনি সংক্ষেপ বিদায় প্রার্থনা, লতিকার প্রভুত্ব-গর্ব্বিত হৃদয়কেও এইবার একটু দমাইল। এতক্ষণে বোধ হয় তাহার যেন প্রকৃতই মনে পড়িল, যে, আন্দু এখন তাদের সেই পূর্ব্বের মোটর চালক নহে—লতিকার মনে বোধ হয় একটু কুণ্ঠিত ভাবের উদয় হইল, সে মানুষের মত সহজ মুখে এবার বলিল, "পুলিশের কাজে কি খাটুনি খুব বেশী ?—তোমার যুদ্ধে যাওয়ার কি হ'ল আন্দু ?"

পরিমল আন্দুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঠিক দেড়বৎসর পূর্ব্বের মতই অসঙ্কোচ সৌহৃদ্যে ঝুলিয়া পড়িয়া সাগ্রহে বলিল, "তুমি জাননা দিদি, যুদ্ধের স্বপ্ন, এখনো সোল্‌জার সাহেবের মগজের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে—না আন্দু ?"

আন্দু মৃদুলজ্জিত হাসিতে নিরুত্তরে সস্নেহে দুইহাতে পরিমলের মুখখানি ধরিয়া তুলিয়া গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। এবার লতিকা সত্যই পূর্ণ-উৎসাহে বলিয়া উঠিল, "ভালই তো, চেষ্টা থাকলে, সাহস থাকলে সকল দিকেই উন্নতি হবে, উন্নতির হাত পা নেই —তাকে নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়।"

শিক্ষিতা লতিকার মার্জ্জিত মন্তব্যে, মুহূর্ত্তে আন্দুর সুপ্ত হৃদয়ের মধ্যে সত্যই একটা কল্যাণময় উদ্যমের সাড়া পড়িয়া গেল। প্রফুল্ল মুখে হাসিয়া

বলিল, "তা বই কি দিদিমণি! নিজের চেষ্টা ভিন্ন নিজের উন্নতি কখনো হতে পারে না"—

নবীন উৎসাহের ঝোঁকে অনেকগুলা কথা তাহার মনে হইল, কিন্তু সে সব বলিতে পারিল না, তাহার চক্ষে উজ্জ্বল আনন্দের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। আন্দু তৃপ্ত চিত্তে আভূমি প্রণত হইয়া লতিকাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইয়া অগ্রসর হইল।

লতিকার উন্নতগর্ব্বিত চিত্তের তীক্ষ্ণ আত্মসম্ভ্রম-বোধ সহসা যেন ঋজু হইয়া গেল। প্রসন্নদৃষ্টিতে আন্দুকে বিদায় দিয়া, পরিমলের পশ্চাৎ তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দ্বার পর্য্যন্ত আসিল। আন্দু দ্বারের বাহিরে আসিয়া ফিরিয়া যুক্তকরে পুনরভিবাদন পূর্ব্বক সরল হাসিমুখে বলিল, "তবে আসি দিদিমণি, খানিকক্ষণের জন্যে এসে খুব জ্বালাতন করে চল্লুম, কিছু মনে কর্‌বেন না, আমি বড় খুসী হয়ে চল্লুম।"

লতিকার কঠিন দর্পের ক্ষীণ রেখাটুকু নিমিষে যেন চূর্ণ হইয়া গেল! এতক্ষণে সে দেখিল, আন্দুর নম্র মহত্ত্ব কত সুন্দর! আন্দু প্রায় ফটকের কাছে চলিয়া গিয়াছে, সহসা লতিকা সকাতরে ডাকিল, "আন্দু"—

আন্দু ফিরিল, দেখিল লতিকার চক্ষে উচ্ছ্বসিত বিষণ্নতা! দীনস্বরে লতিকা বলিল, "আন্দু, তুমি কিছু মনে কোরো না"—

মমতা-বিগলিত আন্দুর চক্ষের কোণে এক বিন্দু অশ্রু ফুটিয়া উঠিল, ত্রস্তে অভিবাদনের আবরণে সে দুর্ব্বলতাটুকু সংবরণ করিয়া লইয়া—তরল কোমলকণ্ঠে করুণ আবেগের সহিত আন্দু বলিল, "না-না দিদিমণি, আপনারা এই গোলামের অপরাধ মাপ কর্‌বেন"—

আন্দু আর দাঁড়াইল না!

ম্লানবদনা দিদির পানে চাহিয়া পরিমল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আহা! এমন লোক আর দেখ্‌লুম না!"

লতিকা সবেগে বলিল, "নাঃ!"

২১

পথে চলিতে চলিতে আন্দু তাহার জীবনের হিসাব-নিকাশ আগাগোড়া মিলাইয়া, ঠিকের ঘরে জমা দিয়া দেখিল, আজ একটা বিভীষিকাময় বিয়োগের ভুল, মিলিয়া জমার ঘরে উঠিয়াছে! এতদিনে একটা দ্বন্দ্ব অমূলক বলিয়া ধরা পড়িল! আন্দুর ব্যথা-ভারাক্রান্ত শৈত্যজমাট চিত্ত আজ সুদীর্ঘ কালের পর, মৃদু তরঙ্গ-লহরীতে নির্ভাবনায় ধীর প্রশান্ত আবর্ত্তন আরম্ভ করিল। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে সেই কলিকাতার তরুণীর দুর্ভাগ্য-শ্রুতিটা মনে পড়িয়া তাহার চিত্তের অন্য প্রান্তে বিষাদের ঘন-গাম্ভীর্য্য অনুভূত হইতে লাগিল,—আহা সে বেচারীদের আজ কি দিন!

আন্দু মেলাস্থলে আসিয়া সহকর্ম্মিগণের খোঁজ লইল।

পুলিশের লোকেরা তখন লালপাগড়ীর জোরে স্থানটা খুব জাঁকাইয়া তুলিয়াছে। গোটাকতক মজুর ধরিয়া মাটীর উপর ছাই ছড়াইয়া তাঁবু খাটান হইতেছে। দোকানদারগণ, তালপাতার টাটের নীচে চাঁচের আড়াল তুলিয়া, চৌকী বেঞ্চি পাতিয়া, দোকান সাজাইয়াছে। লাল পাগড়ী নীলকুর্ত্তি ও মোটা বুট পায়ে দিয়া, অত্যন্ত গ্রামভারি চালে, পুলিশের লোকেরা দোকানে দোকানে বাহার দিয়া বসিয়া শাসন করিয়া মর্য্যাদা আদায়ের পন্থা খুঁজিতেছে। আন্দুকে দেখিয়া পুলিশ-মহলে একটু চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিল।

তাঁবুর কাছে একটা পানের দোকানে বসিয়া আন্দু মজুরদের কাজ

দেখিতে লাগিল, রামলাল তেওয়ারী মহা কর্ত্তৃত্ব-আস্ফালনে তাহাদের খাটাইতেছে।

আন্দু একজন মজুরকে ডাকিয়া দু পয়সার চিনি কিনিতে দিল—পথে জলঝড়ে ভিজিয়াছে, একটু চা খাইবে।

মজুরটা চিনি আনিয়া দুটি পয়সা বখশিস লইয়া চলিয়া গেল। রামলাল দূর হইতে বক্র দৃষ্টিতে দেখিয়া তাঁবুর ওপাশে সরিয়া গেল, মজুরটাও মুগুর লইয়া খুঁটি পুঁতিবার জন্য ঐ দিকে গেল।

চা প্রস্তুত হইল। হিন্দুস্থানী পানওয়ালার বালক-পুত্রকে আন্দু আদর করিয়া খানিকটা চা ঢালিয়া দিয়া সবেমাত্র বাটি মুখে তুলিতেছে, এমন সময় তাঁবুর ওদিকে কিসের গোল উঠিল, আন্দু চায়ের বাটি নামাইয়া ছুটিয়া গেল।

রক্তচক্ষু রামলাল, বাঘের মত উগ্র চেহারায় সেই মজুরটাকে রুলের দ্বারা পিটাইতেছে। মজুরটা হীনবল নয়, সে যদি রামলালের ব্যবহারের প্রত্যুত্তর দেয় তো, তাহাকে ইচ্ছা করিলে রীতিমত তালিম করিয়া দিতে পারে, কিন্তু রামলালের মাথায় যে দরিদ্রের মৃত্যু-বিভীষিকার মত লাল পাগড়ী! সে শুধু প্রহার আট্‌কাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া, স্থানে অস্থানে রুলের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া 'দোহাই হুজুর' হাঁকিতেছে।

ছুটিয়া আসিয়া আন্দু স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। তাহার মস্তকের রক্তপ্রবাহের অগ্নিস্রোত গর্জ্জিয়া উঠিল।—আন্দুর একবার মনে হইল এই মুহূর্ত্তে শোণিতোন্মাদ দানবের মত এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখিয়া সমুদ্যত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মুহূর্ত্তে মনে হইল এই অল্পদিন আগে রামলালের পুত্র বিয়োগ হইয়াছে; দুশ্চরিত্র রামলাল মুমূর্ষু পুত্রকে দেখিতে পর্য্যন্ত যায় নাই, তবু হাজার হোক বাপ ত! রামলালের পুত্র-

শোকসন্তপ্তা, স্বামীর পরিত্যক্তা, অভাগিনী পত্নীর কথা আন্দুর মনে পড়িল। রামলালের শরীরে চর্ম্ম নাই, এ প্রহার তো মারিলে তাহাকে লাগিবে না,—বাজিবে যে অপরকে!—হায় রামলাল হতভাগ্য! কাল না তুমি পুত্র হারাইয়াছ?—আজ তোমার এই নিঃশঙ্ক পাশবিক ঔদ্ধত্য! জানি না রামলাল, মানবাকৃতির আবরণে কি নিষ্করুণ পৈশাচিকতায় পরমেশ্বর তোমার অন্তর গঠন করিয়াছিলেন! আন্দু রামলালকে সৎপথে থাকিতে পরামর্শ দেয়, আন্দুকে দেখিয়া রামলালকে দুষ্কর্ম্ম করিবার সময় সমীহ করিয়া চলিতে হয়, তাই আন্দুর উপর রামলালের রাগ। রামলাল প্রবলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাহত হইয়া দুর্ব্বলের উপর আড়ির ঝাল মিটাইল। এ প্রহার ত মজুরকে হয় নাই, আন্দুকে হইয়াছে,—আন্দু পাথরের মত শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, বাধা দিল না।

দুই তিন জন মজুর দুই চারি ঘা খাইয়া, সেই লোকটাকে টানিয়া ছাড়াইল। সে ব্যাঘ্রগ্রাসমুক্ত ছাগশিশুর ন্যায় ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, আন্দুর ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া বুকের রক্ত ঢালিয়া তাহার অঙ্গের বেদনা মুছিয়া লয়। ক্ষোভে তাহার চক্ষু জলে ভরিয়া গেল, সে মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছিল।

পিছনে রোষে উত্তেজিত রামলালের চীৎকার শোনা গেল,—"পয়সা নিয়ে খাট্‌ছিস্, না অমনি! এক লহমার জন্যে আড়াল হয়েছি আর অমনি ফাঁকি!—"

আন্দু এবার নিঃসংশয়ে বুঝিল, কেবল চিনি আনিবার অপরাধেই নিরপরাধ বেচারী প্রহৃত হইল! আন্দুর বক্ষের সমস্ত শিরাগুলা যেন গভীর বেদনায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল; হায় কি কুক্ষণেই সে চিনি আনিতে পয়সা দিয়াছিল।—রামলালকে আন্দু সৎপথে থাকিয়া মানুষ

হইতে উপদেশ দিত, তাই আন্দুর উপর রামলালের আড়ি। কাপুরুষ রামলাল তাহার উপর ঝাল ঝাড়িবার জন্য মারিল গরীব মজুরকে। রামলাল তাহাকে পিটাইল না কেন ?

জীবনের অসংখ্য ত্রুটীতে রামলালের আকণ্ঠ পূর্ণ; কাজেই সে পরের ক্ষুদ্র ত্রুটী মার্জ্জনা করিবে, কোন্ শক্তিতে ? দাসত্বের হীনতায় তাহার মনুষ্যত্ব পিষিয়া গুঁড়াইয়া গিয়াছে, তাই বুঝি সে, এতটুকু প্রভুত্বের সুযোগ পাইবামাত্র, পশুত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া বসিল। অনেকগুলা কঠিন কথা আন্দুর ঠোঁটের কাছে আসিয়া জমিয়াছিল—সে আর দাড়াইল না।

মেলার বাহিরে একটা দোকানে কতকগুলা লোক জমিয়া সেই মজুরটাকে সান্ত্বনা দিতেছিল। লোকটা তখনো প্রহারের বেদনায় রোদন করিতেছে। আন্দু দোকানে ঢুকিয়া কিছু খাবার কিনিয়া, তাহাকে ডাকিয়া লইয়া দোকানের বাহিরে আসিল; এত লোকের সাম্নে রামলালের গ্লানি লইয়া কুৎসা করিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

লোকটাকে লইয়া একটু নিভৃত স্থানে আসিয়া তাহাকে খাবারগুলি দিয়া পকেট হইতে তুটি টাকা লইয়া তাহাকে দিল,—তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া স্নেহময় কণ্ঠে তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিল। আন্দুর সহৃদয়তায় সে আকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, আন্দুও চোখের জল রাখিতে পারিল না।

সে কাঁদিয়া বলিল, "হুজুর খুঁটীতে তাঁবুর রশা বাঁধছিলুম, আমাকে তিনি এসেই জুতোর গুঁতো দিয়ে বল্লেন, 'গাঁজা কিনে আন।'—আমি বল্লুম, 'রশায় গাঁট দিয়ে যাচ্ছি হুজুর।' বস্ আর কথা নেই,—অমনি রুল উঁচিয়ে—"

আন্দু আর শুনিতে পারে না, সে তাড়াতাড়ি তাহাকে গৃহে প্রত্যা-বর্ত্তনের উপদেশ দিয়া নিজে ফিরিয়া চলিল।

লঙ্কামরিচের গুঁড়া নাকে চোখে লাগিলেই অসহ্য জ্বালা ধরে।—আন্দু ভাবিতে ভাবিতে চলিল, সে কি করিয়া এই ঘটনার গরল মনের মধ্যে চাপিয়া, রামলালের সামনে অন্যের সহিত প্রসন্ন মুখে কথা কহিবে? এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের একটি শিখায় সে যদি অসাবধানে ফুঁ দিয়া ফেলে, তাহা হইলে রামলালের পত্নী!—সে যে এই স্বামীর অশ্রদ্ধার অসাময়িক দানের উপর নির্ভর করিয়া কাচ্চা বাচ্চা লইয়া কোনো রকমে বাঁচিয়া আছে! হায় দুর্দ্দৈব।

আজ আসিয়া দেখিল, ছোটবাবু আসিয়াছেন, তিনি আন্দুকে দেখিয়াই বলিলেন, "কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

আন্দু হঠাৎ বিষম খাইয়া বলিল, "উঃ! পাঁজরটা টেনে ধরেছে!"

ঘটনাটা ছোটবাবুর কানেও উঠিয়াছিল, তিনি আন্দুকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন। আন্দু 'বিশেষ কিছু নয়' বলিয়া উড়াইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। রামলাল আন্দুর দৃষ্টি এড়াইয়া চলিতে লাগিল।

পরদিন যত বেলা হইতে লাগিল, মেলাস্থানে ততই লোক বাড়িতে লাগিল; দ্বিপ্রহরের পর জনতা এরূপ বেশী হইয়া উঠিল, যে, স্বয়ং ছোট-বাবু বাহির হইয়া শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

ইতর লোকেরা মদে রাঙিয়া উঠিল। পুলিশমহলেও এই সূত্রে উৎসাহের ঝাঁক বাড়িতেছে দেখিয়া, শঙ্কাকুল আন্দু ছোটবাবুর শরণাপন্ন হইল। ছোটবাবু সমস্ত তাঁবেদারগণকে একত্র করিয়া কঠিন স্বরে সাবধান থাকিতে হুকুম দিলেন।

সকলে প্রস্থান করিলে, ছোটবাবু আন্দুকে বলিলেন—"মিঞা, তুমি পোষাক না পরেই বেরিয়ে যাও।"

সূর্য্যরশ্মির শক্তি-হ্রাসের সহিত জনস্রোতের শক্তি প্রবল হইয়া উঠিল, দলে দলে লোকজন আসিতে লাগিল,—তাজিয়া গাড়ী ঘোড়ায় চারিদিক পূর্ণ হইয়া উঠিল, পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম করিয়াও ইতস্ততঃ ঘুসাঘুসি চড়চাপড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রহসন ঘটিতে লাগিল। ছোটবাবু অস্থির হইয়া, চারিদিকে শান্তি শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে লাগিলেন, আন্দু বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া ছোটবাবুর আদেশমত, পাহারার উপর পাহারা দিয়া যখন দেখিল জনতার অসম্ভব হুড়াহুড়ি বাঁধিয়াছে, তখন সে আর নিশ্চিন্ত থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনায়, নিজের লাল পাগড়ী আনিতে তাঁবুর দিকে চলিল।

সহরের অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মুসলমানরমণীগণ গাড়ী পাল্কী করিয়া কারবালা-ক্ষেত্রে আসিয়াছেন। সেই সব গাড়ী প্রভৃতি রাখিবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান মেলার বাহিরে স্বতন্ত্র স্থানে ছিল। আন্দু দূর হইতে দেখিল, একখানা ভাল চক্‌চকে রুদ্ধ গাড়ী বলিষ্ঠ-যুগলাশ্ব-সংযোজিত হইয়া মেলার জনতরঙ্গে নামিয়া বিষম হুলুস্থূল উৎপাদন করিয়াছে। ঘোড়ার মুখ হইতে লোকেরা ঠেলাঠেলি করিয়া হটিয়া পথ করিয়া দিতেছে, সেই ভিড়ে অনেকে সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়া হাত পা কাটিয়া, ছালচাম্‌ড়া ছিঁড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। গাড়ীখানা অবাধে লোক-লহরী মথিত করিয়া, মেলার মধ্যে ছুটিয়া আসিতেছে, গাড়ীর উপর হইতে দুই পার্শ্বে ভিড়ের উপর মধ্যে মধ্যে নির্ম্মম ভাবে চাবুক বর্ষিত হইতেছে—জনতা কোলাহল করিয়া বিষম গোল বাঁধাইয়াছে। আন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া পায়ের ভরে যতদূর সম্ভব উঁচু হইয়া খুব ভাল করিয়া দেখিল,—দেখিল, গাড়ীর উপর একজন "লাল পাগড়ী!"

আন্দুর চক্ষু স্থির হইল, এ কার গাড়ী ? কিন্তু যাহারই গাড়ী হোক, চালকের দুঃসাহসিকতায় সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ঠিক সেই সময় গাড়ীর উপর হইতে বর্ষিত চাবুকের প্রভাবে, জনতার ঠেলায় এক বৃদ্ধ চীৎকার করিয়া মাটিতে লুঠাইয়া পড়িল। আন্দুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল ; সে ছুটিয়া বৃদ্ধের কাছে আসিল ; তখন তাহাকে দুই তিনজনে ধরিয়া তুলিয়াছে। আন্দু সেখানে আর দাঁড়াইল না, তীরবেগে ছুটিয়া আসিয়া সিংহবিক্রমে লাফাইয়া ঘোড়ার রাশ ধরিয়া গাড়ী থামাইল। চকিত নেত্রে চাহিয়া দেখিল, লাল পাগড়ীওলা লোকটি আর কেহই নহে, তাহারই প্রিয়তম সুহৃদ্ রামলাল তেওয়ারি !

ক্রোধে তাহার সর্ব্বশরীর ঝিম্‌ঝিম্ করিতেছে. পূর্ব্বসঞ্চিত যে অচঞ্চল নিঃশব্দ উত্তাপ মর্ম্মকে উত্তপ্ত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সহসা উদ্দাম বেগে জ্বলিয়া উঠিল, আন্দুর ইচ্ছা হইল রক্ষ-বিক্রমে রুখিয়া, গাড়ীর উপরকার নির্ম্মম বর্ব্বরগুলোর মুণ্ড মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলে !—কোচম্যানকে কঠোরস্বরে বলিল, "ফেরাও গাড়ী !"

গাড়ীর ছাদে উপবিষ্ট রামলাল, আন্দুর সেই বিকৃত কণ্ঠস্বর ও প্রকাণ্ড পাগড়ীতে তাহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিল না, স্বভাবসুলভ কর্ত্তৃত্বে তাড়না করিয়া অবজ্ঞাভরে বলিল, "আরে হাটো। হাটো,—হাঁকাও গাড়ী সাম্‌নে !" আন্দু তীব্র স্বরে বলিল, "চোপ্‌রও।"

গাড়ীর ছাদের উপর কোচম্যানের পিছনে চাবুক লইয়া যে ব্যক্তি বসিয়া মনুষ্য হটাইয়া ঘোড়ার রাস্তা পরিষ্কার করিতেছিল, তাহার বয়স বোধ হয় বছর কুড়ি। মাথায় প্রায় পাঁচ ইঞ্চি লম্বা চুলে তিন ইঞ্চি খাড়া উঁচু আধা-আলবার্ট আধা-ঢেউখেলানো ফ্যাসানের টেড়ি। গায়ে চাকরদের সাদা চাপকান, পায়ে জুতা, মস্তকটির মাঝখানে পাতলা টুপি তেরছা

করিয়া বসানো, বোধ হয় টেড়ির খাতিরে। লোকটার মেজাজ সুরায় সরগরম ছিল, চাবুকটা শূন্যে ঘুরাইয়া, মত্তভাবে বলিল, "তুমি কেহে মশাই? দেখ্‌ছ না গাড়ীতে পুলিশ রয়েছে!"

আব্দু বজ্রদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল,—মুহূর্ত্তে তাহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ডের অভ্যন্তরে, চপেটাঘাতসূচক, প্রবল বিদ্যুৎঝঞ্ঝনা বহিয়া গেল; হাতের বেতটা দাঁতে চাপিয়া ধরিয়া ঘোড়ার মুখ ধরিয়া সবলে টানিয়া ফিরাইল, গাড়ীবানকে পুনশ্চ বলিল "হাঁকাও গাড়ী"—

পিছনে খটাখট্ শব্দ হইল; আব্দু চাহিয়া দেখিল, প্রকাণ্ড লাল ঘোড়ার উপর আল্‌পাকার সাহেবী পোষাক পরা, মাথায় লাল রংয়ের বনাতের, গেলাসের মত সরু উঁচু, কাল রেশমের থুপী দেওয়া, সম্ভ্রান্ত মুসলমানীধরণের টুপি পরা, সৌখীন চাবুক-চুরুট-ধারী এক যুবক! ঘোড়ার লাগাম টানিয়া তিনি উগ্রভাবে বলিলেন—"ব্যাপার কি? ইনিই গাড়ীর মালিক!"

টেড়িওলা লোকটা হর্ষোৎফুল্ল মুখে চেঁচাইয়া বলিল, "আইয়ে খোদাবন্দ, ই বদ্‌মান্ গুণ্ডা বহুৎ হায়রান্ কিয়া!—"

খোদাবন্দ ঘোড়া লইয়া আগাইয়া আসিলেন। ইনি স্থানীয় জমীদারের পুত্র,—এবং তাঁহার শ্বশুরও এখন সহরের সবডিপুটী, সুতরাং চোখ পাকাইয়া, চাবুক উঁচাইয়া, প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "ছোড় দেও, উজবুক!"

আব্দুর অন্তর জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে আত্মদমন করিতে না পারিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, "কভি নেই, হিঁয়া গাড়ী নেই চালানে দেঙ্গে।"

গাড়ীর স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার-শিঞ্জন, অস্ফুট অসন্তোষগুঞ্জন, এবং শিশুর ভয়ব্যাকুলিত ক্রন্দন যুগপৎ শোনা গেল। চাবুক-চুরুট-ওলা যুবক

বিষম উত্তেজিত হইয়া ধৈর্য্য হারাইলেন, "কেঁও রে রাস্কেল্, নেই ছোড়ো গে" বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে হাতের চাবুকটা দিয়া আন্দুর গ্রীবার চর্ম্মে তীব্রভাবে আঘাত করিলেন। আন্দু যেন ইহাই খুঁজিতেছিল, মুহূর্ত্তে সে ভীষণ বেগে লোকটার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া হাত হইতে চাবুক কাড়িয়া, মুখে এক ঘুসি বসাইল, আহত যুবকের দন্তচ্যুত চুরুট, ছিট্‌কাইয়া গাড়ীর চাকার কাছে পড়িল! অপমানিত বিপন্ন যুবক গুণ্ডার স্পর্দ্ধিত বিক্রমে নিরুপায় হইয়া রামলালের প্রতি চাহিয়া ইংরেজী ধমক দিলেন, "ইউ আর ডুইং ইওর ডিউটী বাই দিস্ মিন্‌স ?—ননসেন্স পুলিশ !—কাম্ ইন্ !—"

এতক্ষণে রামলাল আন্দুকে চিনিল। যুবকের আহ্বানে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া, ত্রস্তে গাড়ী হইতে নামিয়া, আন্দুর প্রতি দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, নিঃশব্দে ভিড়ে মিশিয়া গেল !—প্রধান নির্ভর রামলাল তেওয়ারীর নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া সেই টেড়িওলা চাবুকধারী খানসামাপুঙ্গব তাড়াতাড়ি চাবুক হাতে নামিয়া অসহায় প্রভুর পশ্চাতে সাহায্যের জন্য দাঁড়াইল,—মুহূর্ত্তে প্রভুভৃত্য এক সঙ্গে নবোত্থমে গর্জ্জিয়া আন্দুর উপর পড়িল,—আন্দু প্রথমেই পিছু হটিয়া প্রভুর আক্রমণ ব্যর্থ করিতেই—ভৃত্যের চাবুক আসিয়া মাথা ডিঙ্গাইয়া তাহার পৃষ্ঠে পড়িল। ততক্ষণে প্রভুর ঘুসি তাহার নাকের কাছাকাছি পৌঁছিল। আন্দু ঘুসিসুদ্ধ হাতখানা বজ্রপেষণে টিপিয়া ধরিয়া এক হেঁচকায় তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া যুবকের আলপাকার-পায়জামা-শোভিত উরুদেশে কঠিনভাবে জুতার ধূলিলাঞ্ছিত চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিল! পাদুকাঘাতের বেগে তিনি তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইলেন !

ইত্যবসরে ভৃত্যের চাবুক আরো দু'বার আন্দুর পৃষ্ঠে পড়িয়াছিল ; আন্দু এইবার প্রভুর সৎকার করিয়া, ভৃত্যের দিকে ছুটিল—টেড়ির

চাক্‌চিক্যের মূল্য যতই হোক, লোকটার শরীরে শক্তি একপয়সারও ছিল না। আন্দু তাহার ঘাড় ধরিয়া নীচু করিয়া তাহারই চাবুক লইয়া, নির্দ্দয়-ভাবে তাহার পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি বসাইয়া তাহার দুর্ব্বল পীড়নের সমস্ত দেনা সুদসুদ্ধ শোধ করিয়া দিল!

জনতার ভয়ঙ্কর কোলাহলে মেলাসুদ্ধ পুলিশ ভাঙ্গিয়া যে যেখানে ছিল সেই দিকে ছুটিয়া আসিল; আন্দুর সেরূপ মূর্ত্তি আর কেহ কখনো দেখে নাই। তাহারা হল্লা করিয়া আসিতে আসিতে, আন্দু আপনার প্রহারের আকাঙ্ক্ষাটি পরিপূর্ণরূপে মিটাইয়া লইয়া, লোকটাকে অত্যন্ত সহজে আপনিই ছাড়িয়া দিল,—তাহার পর কেহ সাহায্য করিবার পূর্ব্বেই নিঃশব্দে গিয়া ভূপতিত ডেপুটীজামাতার হাত ধরিয়া তুলিয়া বিনীত ভাবে বলিল,—"মাপ করবেন মশাই, নিতান্ত উত্ত্যক্ত হয়েই আপনাদের আচরণের প্রত্যুত্তর দিয়াছি, না হ'লে, এমন অনর্থক কষ্ট আমি কাউকে দিই না।"

অদ্ভুত স্বভাবের আন্দুর অপূর্ব্ব ভাববৈচিত্র্যে পরিচিত অপরিচিত সকলেই অবাক্;—অপর কনেষ্টবলেরা সকলে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "হয়েছে কি?"

আন্দু পাগড়ীটা খুলিয়া আরক্ত মুখের স্বেদবিন্দু মুছিয়া, গাড়ীর পাশে ঘাসের উপর পাগড়ীর কাপড় বিছাইয়া বসিল; যেন কিছুই হয় নাই, এমনি নিশ্চিন্ত ধৈর্য্যে বলিল, "ছোট বাবু আসুন।"

ক্ষণপরেই ভিড় ঠেলিয়া খাকি রংয়ের পোষাকপরা ছোটবাবু দেখা দিলেন।—বিস্ময়-উৎকণ্ঠিত স্বরে বলিলেন—"জমাদার!—তুমি? হয়েছিল কি?"

আন্দু উঠিয়া অভিবাদন করিল, একবার চারিদিক চাহিয়া লালপাগড়ী-

পরা সকল মুখগুলা দেখিয়া লইল, তারপর উচ্চকণ্ঠে বলিল, "রামলাল তেওয়ারীকে তলব করুন, সেই প্রধান সাক্ষী।"

বিস্মিত ছোটবাবু বলিলেন, "কোথায় সে?"

চারিদিকে "রামলাল রামলাল" রবে একটা হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল। অনেক সন্ধানে, অনেকদূর লইতে রামলালের সাড়া পাওয়া গেল, সে শুষ্ক ভীতমুখে আসিয়া সেলাম দিয়া দাঁড়াইল। ছোটবাবু বলিলেন, "হয়েছিল কি?"

রামলাল চকিত নেত্রে সকলের পানে চাহিল। দেখিল ডেপুটী-জামাতা, রুমালে উরুর ধূলা ঝাড়িয়া নতমুখে দ্রুত কম্পিত নিঃশ্বাসে হাত মুছিতেছেন; আর আন্দু স্থির দৃষ্টিতে রামলালের পানে চাহিয়া আছে। রামলাল বুঝিল জানি না বলিলে আজ পরিত্রাণ নাই! সে ম্লান মুখে রুদ্ধ স্বরে যাহা জানিত সব বলিল,—অবশেষে একটুখানি খোঁচা দিয়া বলিল, "জমাদার:পোষাক পরে না আসাতেই তো এত গোল হ'ল। জমাদারকে কেউ চিন্‌তে পারেনি, মনে করেছিল, ও একটা বাজে গুণ্ডা!"

রুষ্টস্বরে ছোটবাবু বলিলেন—"গাড়ী ভিড়ে নামাতে হুকুম দিয়েছিল কে? তুমি?"

রামলালের বক্ষ দুরুদুরু করিয়া উঠিল, বলিল, "আজ্ঞে ডেপুটী সাহেবের জামাইয়ের হুকুমে আমি পাছে ভিড়ে কিছু গোলমাল হয় বলে গাড়ীতে ছিলুম"—

বজ্রনিনাদে ধমক দিয়া আন্দু বলিল, "চোপ্‌রাও মিথ্যাবাদী, পাছে গোলমাল হয় বলে? দু-পাশে চাবুক চালিয়ে রাস্তা সাফ করবার হুকুম দিয়েছ তুমি—আমি আপনি শুনেছি,—কত লোকের পিঠে চাবুকের দাগ পড়েছে দেখ দেখি,—"

রামলাল এতটুকু হইয়া গেল, জনতার মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জন শোনা গেল, চাবুকের জ্বালায় যাহাদের পিঠ এখনো জ্বলিতেছিল, তাহারা প্রমাণ দিতে প্রস্তুত; ছোটবাবু সে-সব কথায় কর্ণপাত করিলেন না, বিরক্ত স্বরে বলিলেন, "বেশ কথা, তুমি এমন মারামারির হাঙ্গামা দেখেও এখান থেকে পালালে কি বলে?"—

রামলাল চুপ করিয়া রহিল।

ছোটবাবু কঠিনস্বরে বলিলেন, "তুমি পাগড়ী পরে' পাগড়ীর জোরে বে-আইনী কাজ করেছ, খুব বাহাদুর তো!"—

এমন সময়ে দূরে আবার ভিড়ে গোলমাল শুনা গেল, তাহারা চাহিয়া দেখিল, অশ্বপৃষ্ঠে বড়বাবু আসিতেছেন। ছোটবাবু অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি অগ্রসর হইয়া ডেপুটী-জামাতাকে তদবস্থায় দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চমকিত ব্যগ্রতায় বলিলেন, "দিলদার সাহেব হয়েছে কি?"

ছোটবাবু সংক্ষেপে সব বলিলেন। বড়বাবু অকস্মাৎ উগ্রভাবে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "তা জানানাগাড়ীখানা আটক করে রেখেছ কেন?"

ছোটবাবু প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "আমি ত আটকাইনি,—ওরাই মদের ঝোঁকে মারামারি করে সব জড়ভরত হয়ে দাঁড়িয়েচে,"—ডেপুটী জামাতার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এই ভদ্রলোককে আমি এখনো কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাবকাশ পাইনি, কেবলমাত্র আন্দুর আর রামলালের—"

বড়বাবু ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, "খুব হয়েছে, এঁর আর সওয়াল জবাবে কাজ কি?—আন্দু যখন বলেছে তখন অপর পক্ষের কথা শোন্‌বার দরকার কি?—আন্দুর কথাই বেদবাক্য!—"

আন্দুর নামে শ্লেষ ছোটবাবুর অসহ্য হইল। তখনই কি একটা কথা বলিতে উদ্যত হইতেছিলেন,—আন্দু সেলাম করিয়া বলিল, "হুজুর তাঁবুতে—"

বড়বাবু ক্রুদ্ধ মুখখানা ফিরাইয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "গাড়ী নিয়ে তোমরা বাড়ী যাও। দিল্‌দার সাহেব, ঐ খানসামাটাকে নিয়ে একবার তাঁবুতে আসুন। সেইখানেই একটু দরকার আছে।—"

২২

তুলার বস্তায় আগুন লাগিলে তাহা দাউ দাউ করিয়া না জ্বলিলেও গুমিয়া গুমিয়া যেটুকু পোড়ে সেটুকু নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। এই ব্যাপারটা লইয়া, সম্পর্কীয় নিঃসম্পর্কীয়—চারিদিকের জনসমাজে এমনি একটা নিগূঢ় রহস্যের আন্দোলনের সৃষ্টি হইল, যে বাহিরের দিক হইতে সেটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া উঠা কঠিন; একজন সম্ভ্রান্ত জমীদারের পুত্র, একজন গণ্যমান্য ডেপুটীর জামাতা,—তাঁহাকে প্রকাশ্য মেলায় একজন নগণ্য পুলিশের জমাদার সর্ব্বসমক্ষে পদাঘাত করিয়াছে,—কি দুর্জ্জয় ব্যঙ্গসংবাদ!—চারিদিকের উচ্চ উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টির তীক্ষ্ণ ধিক্কার হইতে আপনাকে বাঁচাইবার জন্য আন্দু নতশিরে গৃহকোণে আশ্রয় লইল।—সে যেন শুধু হুজুগের ক্ষুধায় সিদ্ধির নেশা ঢালিয়া, তাহাকে পূর্ণমাত্রায় চম্‌চমে করিয়া তুলিয়াছে।—সকলেরই এমনিতর ভাব! প্রতি মুহূর্ত্তে আন্দুর মনে হইতে লাগিল,—এখনই চাকরী ছাড়িয়া দিই,—কিন্তু সে যে এখন দোষের শৃঙ্খলে বাঁধা,—সে শাস্তি না লইয়া কি করিয়া আপনাকে নিষ্কৃতি দিবে।—

এদিকে এই ব্যাপারে আন্দুকে মধ্যে রাখিয়া বড়বাবুর সহিত ছোটবাবুর

এমনি ঘোরতর মনোমালিন্য সংঘটিত হইল,—এবং সেই সংঘাতে, উভয় পক্ষের মধ্যে দোদুল্যমান আন্দু, এমনি নিপীড়িত হইয়া উঠিল, যে বলিবার নহে। বিশেষতঃ ডেপুটীবাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ সৌহৃদ্য থাকায়, বড়বাবু যতদূর রুষ্ট হইবার, তাহা হইলেন। তিনি আন্দুকে লক্ষ্য করিয়া আক্রমণে উদ্যত হইলেই ছোটবাবু আন্দুকে সরাইয়া স্বয়ং লড়িতে লাগিলেন।—শেষফল যাহা হইবার তাহাই হইল, আন্দুকে মধ্যে রাখিয়া উভয়েই পরস্পরের প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিলেন,—মনে রহিল বিদ্বেষের ধূমায়িত অগ্নি—রসনায় রহিল, সুসম্বদ্ধ আইনের কঠিন দোহাই!

কয়দিন এই ভাবে কাটিল। শিকারগঞ্জ হইতে যথাসময়ে সকলেই ফিরিয়াছেন। ডেপুটী-জামাতা পদাঘাত ও মুষ্ট্যাঘাত উল্লেখে মানহানির মামলা উত্থাপন করা অপমানজনক বুঝিয়া, সে সম্বন্ধে নিরস্ত হইলেন, এবং ভৃত্যটির প্রহারের অভিযোগেও বিশেষ ফল হইবে না বুঝিয়া দুর্বৃত্ত জমাদারকে দণ্ডিত করিবার পরামর্শের জন্য বড়বাবুর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন। কিন্তু সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল, বড়বাবু কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। একদিন সাহেব আন্দুকে ডাকিয়া নিজের কামরায় লইয়া গিয়া মেলার ব্যাপারটা কি সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। আন্দু অকপটে আদ্যোপান্ত সমুদায় বলিয়া গেল। সাহেব সমস্ত শুনিয়া মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে চশমার ভিতর হইতে চোখ দুইটি তুলিয়া, মুখখানি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিলেন,—"অল্‌রাইট্ ম্যান্,—যুবক, আমি এ ক্ষেত্রে তোমায় কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বলিতেছি—হট্ ব্রেন্, এবং মিলিটারী মেজাজ লইয়া শান্তিরক্ষার কাজ যে চলে না, এটা অবশ্য তুমি মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন করিবে!"

আন্দু হাসিয়া বলিল, একথা তাহার খুবই স্মরণ আছে, তবে কার্য্য-

ক্ষেত্রে যখন ঘটনাপ্রবাহ ন্যায়ের এবং সহিষ্ণুতায় সীমা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়াছিল তখন সে বাধ্য হইয়া শক্তিপ্রকাশে বাধা দিয়াছিল ; অবশ্য সে জানিত যে এ জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে দণ্ডিত হইতে হইবে, কিন্তু তথাপি সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে নিরস্ত হয় নাই।

সাহেব বলিলেন—নিশ্চয়ই নহে। লাল চোখ দেখাইয়া প্রতিপদে পরের সৎসাহস খর্ব্ব করাও তাঁহার প্রকৃতি নহে, তবে সকলেরই একটা সীমা আছে, এইটুকু তিনি আন্দুকে বুঝাইতে চাহেন।

কেবল মাত্র মুখের তোড়ে, কি হাতের জোরে যে সাহস নামক বস্তুটা পৃথিবীর বাজারে সস্তাদরে বিকায় না, এবং সহিষ্ণুতা-জিনিষটাও যে সময়-বিশেষে ভীরুতার নামান্তর রূপে প্রতিপন্ন হয়, আন্দু তাহা ভালরকম জানিত। সুতরাং সে সাহেবকে সেলাম করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিল।

আন্দু অনেক রাত্রে ছোটবাবুর বাসায় গিয়া তাহার উর্দ্দি ফিরাইয়া দিয়া আসিল। তখন তিনি শয়ন করিয়াছেন। আন্দু চাকরের জিম্মায় রাখিয়া আসিল। চাকরটা নিদ্রাভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিল, "আজ কেন ?"

আন্দু গম্ভীরভাবে বলিল, "হাঁ আজই !"

পরদিন কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া আন্দু একেবারে ইস্তফা-পত্র লিখিয়া সাহেবের কামরায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সাহেব খুব ব্যগ্রতার সহিত তাহাকে পুনঃ পুনঃ চাকরী ছাড়িতে নিষেধ করিলেন। আন্দু সবিনয়ে নিতান্ত শান্তভাবে প্রতিবাদ করিয়া হাস্যমুখে বলিল, "না সাহেব, পুলিশের কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

সাহেব দুঃখিত হইলেন, সে যুদ্ধ-বিভাগে অতঃপর কাজ লইবে

শুনিয়া, স্বেচ্ছায় একখানি প্রশংসাপত্র দিলেন। আন্দু অভিবাদন করিয়া বাহিরে আসিল। তারপর যথাকর্ত্তব্য সমাপন করিয়া থানার সহিত সমস্ত সম্পর্ক উঠাইয়া সহরের প্রান্তে আসিয়া একখানি ছোট একতলা ঘর ভাড়া লইল, আহারাদির বন্দোবস্ত নিকটস্থ হোটেলে করিল। এইবার সে সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ !

এবার হাইদরাবাদের যোদ্ধামহাশয়কে নিজেই পত্র লিখিল। দাদাজীর কাছে গেল না, পাছে তিনি আন্দুকে নিজের বাড়ীতে আনিবার জন্য কোনরূপ পীড়াপীড়ি করেন বলিয়া। স্বাবলম্বী হইয়া, এবার সে দৈন্যের দায়ে পরের মুখ চাহিবে না, ইহাই ঠিক করিল। সমস্ত জগতের মধ্যে সমগ্র বিপদের মধ্যে, এবার সে ঔদাসীন্যের আশ্রয়ে খুব নির্ভীকভাবে অবস্থান করিবে, কাহাকে তাহার ভয় ? নিজের জন্য কেহ কখনো ভাবে না, ভাবে পরের জন্য ; তাহার যখন কেহই নাই, তখন সে ত একেবারে নিশ্চিন্ত, পরমেশ্বর যাহা করেন তাহা ভালর জন্যই। ভাগ্যে সে বিবাহ করে নাই !

আন্দু যখন কাহাকেও কিছু দান করিত, তখন হাতে রাখিয়া করিতে পারিত না, সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যেই হাতটি প্রায় খালি হইয়া আসিল। ওদিকে হাইদরাবাদের সেই কর্ম্মকুশল যোদ্ধা মহাশয় দশ বারো দিনেও পত্রের উত্তর দিলেন না। আন্দুরও তাহাতে যে আগ্রহ খুব বেশী ছিল, এমন কথা বলিতে পারা যায় না ; হয় হবে,—না হয় না হবে,—তাহার ভাবখানা ঠিক এই রকম ছিল। সে ডোমপাড়ায় গিয়া মহা উৎসাহে ডোম যুবকদিগের সহিত মিলিয়া ঝুড়ি, চাঙ্গারী, চাঁচ, সুপ, বুনিয়া, বনে বনে তাহাদের সহিত কটাশ্ উদ্বিড়াল শিকার করিয়া, ছুটোপাটি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল। অবশ্য উদ্বিড়াল-

মৃগয়ায় তাহার যে অত্যন্ত আমোদ ছিল সেটা মনে করিতে পারা যায় না ; সে শুধু এই নীচ সম্প্রদায়ের বে-আব্রু জীবনের সহিত মিশিয়া দাসত্বের কেতা-দুরস্ত আদবকায়দা-আবদ্ধ আড়ষ্ট নির্জ্জীব জীবনটা, গরীবের আব্-হাওয়ায় প্রাণের সজীব স্বাধীনতায়, নূতন করিয়া সুধ্রাইয়া লইতে আসিল ; সে মনে মনে খুব জোর করিয়াই বলিল, দম্ভের চেয়ে দীনতাই সুন্দর, লক্ষ্মীছাড়ার পক্ষে লক্ষ্মীছাড়ার সংসর্গই নিরাপদ ; লক্ষ্মীমন্তের সংসর্গে মিশিতে গেলেই পায়ে মাথায় নিরন্তর বাধিতে থাকে।

২৩

তখন চৈত্র মাস পড়িয়াছে, প্রকৃতির রাজত্বের উপর হইতে ক্ষুব্ধ জড়তার আবরণ সরিয়া গিয়া, উজ্জ্বল স্বচ্ছ উল্লাসের মদিরা-বিহ্বল স্রোত ভাসিয়া চারিদিকে একটা মনোরম স্বপ্নাবেশ সৃষ্টির সূচনা করিতেছে। শুক্লানবমীর সন্ধ্যায় জ্যোৎস্নার নব যৌবনে তরুণ লাবণ্য যেন উছলিয়া উছলিয়া ধরাবক্ষ ভাসাইয়া হাঁসাইয়া প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে।

আহারাদি সারিয়া আন্দু নিজের গৃহের সম্মুখে সঙ্কীর্ণ রোয়াকটিতে পায়চারী করিতেছিল, এমন সে প্রায়ই করিয়া থাকে, আহারের পরই নিদ্রা তাহার অভ্যাস নহে। জনবিরল পল্লী তখনো নিস্তব্ধ হয় নাই, পাশাপাশি বাড়ী হইতে দু-একজনের কণ্ঠস্বর তখনো শ্রুত হইতেছে, অদূরে ময়রাদের দোকানের আলো রাস্তায় পড়িয়া জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আলোটুকুর উপর রুদ্ররূপের বিরক্তিকর ছায়া খানিকটা ফেলিয়া গর্ব্বের আকাঙ্ক্ষায় লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছিল। আন্দু আপন মনে ভাবিতেছিল,—আজ যদি তাহার স্কন্ধে একটি পোষ্যপালনের দায়িত্ব থাকিত, তাহা হইলে বুঝি বাধ্য হইয়া তাহাকে দীনতার চরণে মস্তক

নত করিতে হইত। উঃ! সে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা! ভাগ্য তাহাকে সে বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছে! তাহার মত প্রতিকূল অবস্থায় এমন অনুকূল ভাবে জীবন যাপন করিতে তো প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না।

আন্দু বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল। আপনার জীবনটা আদ্যোপান্ত চিন্তা করিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা দাদাজীর আত্মীয় মহাশয়ের কথা মনে পড়িল। আন্দুর একটু হাস্যোদ্রেক হইল,—তিনি পূর্ব্বে ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে সমস্ত যৌবনটা ভোর সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহার পর এখন সে সঙ্কট-সঙ্কুল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নিজামের অধীনে, নিশ্চিন্তের কূলে পা দিয়া বিবাহাদি করিয়া দিব্য আরামে সংসারী হইয়া সৈনিকের সাজে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করিতেছেন,—কোথায় সৈনিকের সংযম সহিষ্ণুতা আর কোথায় সাংসারিক সুখসম্ভোগলুব্ধতা,—ধিক্!

আন্দু শিথিল ভাবে রোয়াকের লৌহস্তম্ভে হাত রাখিয়া, নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে সামনের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল।

বিপরীত দিক হইতে শুভ্রবেশধারী এক প্রৌঢ় পথিক ক্যাম্বিশের ব্যাগ হাতে করিয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, আন্দুর দিকে চাহিয়া বিশুদ্ধ উর্দ্দুতে বলিলেন, "ওগো বাপু, রাত্রের মত থাক্‌বার জায়গা এখানে কোথা পাওয়া যায় বল্‌তে পার?"

চিন্তামুহ্যমান আন্দু ত্রস্তে মাথা ফিরাইয়া চাহিল, লোহার খুঁটী ছাড়িয়া অগ্রসর হইয়া বলিল, "কি বল্‌ছেন মশাই?"

"তুমি বাঙ্গালী?" পথিক সোৎসাহে বলিলেন, "তুমি বাঙ্গালী! আঃ বাঁচালে বাপু, রাত দুপুরে বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে বড়ই ফাঁফরে পড়ে

গেছি ; যে দেশ, একটা ভদ্রলোকের দাঁড়াবার স্থল নেই—," লোকটি আরো বকিয়া যাইতেছিলেন, আন্দু বাধা দিয়া বলিল, "আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন ?"

পথিক বলিলেন, "আস্‌ছি কলকাতা থেকে,—যাব ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বাড়ী, সে এখান থেকে কতদূর বল্‌তে পার ?"

আন্দু বলিল, "আজ্ঞে ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বাড়ী এখান থেকে যে ক্রোশখানেক তফাতে,—"

পথিক বলিলেন, "আচ্ছা কণ্ট্রাক্টর রমানাথ রায়ের নাম শুনেছ ? তাঁর বাড়ী কোথা জান ?"

আন্দু বলিল, "আজ্ঞে তা তো বল্‌তে পার্‌ছি না, তাঁর নাম কখনো শুনেছি কি না, তাও মনে পড়্‌ছে না। তিনি কি এখানকার বাসিন্দা ?"

পথিক বলিলেন, "হাঁ এখানে তাঁদের বাড়ী আছে, কিন্তু কোথায় তা আমি জানি না—আচ্ছা বাবা, এখানে কোথাও কি থাক্‌বার জায়গা পাওয়া যাবে না ?—"

আন্দু ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আজ্ঞে আপনি যদি একটু অসুবিধে সহ্য করে এখানে থাকেন,—"

পথিক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আর অসুবিধে বাবা, মাথা গুঁজে দাঁড়াবার একটু স্থল পেলে বেঁচে যাই।"

আন্দু সসম্ভ্রমে বলিল, "তবে আসুন আমার এই ঘরটায় একটু জিরিয়ে নিন, আমি দেখি কাছাকাছি যদি কোথাও সুবিধা কর্ত্তে পারি !—আপনারা ?"

পথিক বলিলেন, "আমরা সদ্গোপ, তোমরা ?—"

আন্দু বলিল, "আজ্ঞে পাঠান্।—" ঘরে গিয়া তাড়াতাড়ি প্রদীপ জ্বালিল। সে এতক্ষণ প্রদীপ নিভাইয়া জ্যোৎস্নালোকে রোয়াকে পাদ-চারণা করিতেছিল। প্রদীপালোকে সেই প্রৌঢ় পথিক আন্দুর বলিষ্ঠ সুন্দর শরীরের পানে অত্যন্ত বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া তাহাকে অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তাহার কেহ নাই, এবং সে এখনো অবিবাহিত কেন ?—এই কথাটা এমনি গভীর আশ্চর্য্যের সহিত তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন যে বিব্রত আন্দু-সুদ্ধ নিজের সম্বন্ধে কেমন একটা নূতন অসম্ভব বিস্ময় অনুভব করিল। আন্দুর যে কেহই নাই, এ কথাটা পথিকের ধারণায় যেন মোটে খাপ খাইতেছিল না, তিনি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বার বার নানাদিক দিয়া কথাটা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আন্দু যখন পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিল, যে, সত্যই সে আত্মীয়হীন নির্ব্বান্ধব,—তখন প্রৌঢ় বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া সহসা অস্ফুট স্বরে বলিয়া ফেলিলেন, "এতটা মুক্তি ভাল নয় !"

আন্দু চমকিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া আপনা আপনি একটু হাসিল। সে প্রসঙ্গান্তর আলাপ করিবার চেষ্টা করিল। আন্দু পথিকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে করিতে নিজের বক্তব্য পুনঃ পুনঃ ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এক কথা দুই তিনবার জিজ্ঞাসা করিল। পথিক যখন বলিলেন যে তিনি চিত্রকর,—সেকেন্দরাবাদের ইঞ্জিনীয়ার বাবুর আদেশে গৃহপ্রাচীরে চিত্রের জন্য এখানে আসিয়াছেন, কণ্ট্রাক্টর রমানাথ বাবুর অধীনে তিনি কাজ করিবেন, তখন আন্দু সহসা বলিল—সেও কিছুদিন পূর্ব্বে চিত্রবিদ্যা শিখিয়াছিল। পথিক উৎসাহিত হইয়া তাহার বিদ্যার পরিচয় আদ্যোপান্ত সব জিজ্ঞাসা করিলেন। আন্দু মুহূর্ত্তে নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা নূতন ব্যবস্থা ঠিক করিয়া

পথিকের প্রশ্নের সমুদয় উত্তর দিল, এবং খানিকক্ষণের কথাবার্ত্তার পর দুজনে মিলিয়া এই বন্দোবস্ত ঠিক করিল, যে, আন্দু অতঃপর পথিকের সহিত আলোচিত চিত্রবিদ্যার পুনঃ চর্চ্চা আরম্ভ করিবে।

চিত্রকর মহাশয়ের নাম শ্যামদাস ঘোষ; আন্দু নিজের শয্যায় চাদর বদলাইয়া সেইখানে চিত্রকর মহাশয়ের শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিল, ও আপনি স্বতন্ত্র একটি ক্ষুদ্র শয্যা রচনা করিয়া শয়ন করিল। চিত্রকরের আহারাদি ষ্টেশন হইতেই সমাধা হইয়াছিল, সুতরাং উভয়েই শয়ন করিলেন এবং অনেক রাত্রি অবধি এই দুই অসমবয়স্ক সগ্যমিলিত অপরিচিত ব্যক্তি, আপন-আপন জীবনী পরস্পরকে শুনাইলেন।

২৪

পূর্ণ আহার, পূর্ণ নিদ্রা ছাড়িয়া, পড়াশুনা রাখিয়া, নমাজের সময় কমাইয়া দিয়া, আন্দু নূতন করিয়া চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিতে বসিল। অশ্রান্ত অধ্যবসায় তাহাকে দ্রুতবেগে ক্রমোন্নতির পথে টানিতে লাগিল। নূতনত্বের আস্বাদনে নব নব উদ্যমে উত্তেজিত হইয়া—ঠিক ভূতগ্রস্তের মত দুর্দ্দম্য উচ্ছৃঙ্খলতায়, দিন রাত্রিগুলাকে অবজ্ঞার সহিত পিছনে ফেলিয়া ব্রতীর সংযম ধরিয়া একরোখা আবেগে সে চিত্রবিদ্যা শিখিতে লাগিল। সমস্ত শক্তিই অনুশীলন সাপেক্ষ, এবং সমস্ত সফলতাই পরিশ্রমের মুখাপেক্ষী। আন্দু অত্যন্ত দ্রুতবেগে শিখিতে লাগিল। তাহার অদম্য ঝোঁক দেখিয়া চিত্রকর বিস্মিত হইলেন; দাদাজী ধমক দিলেন, বলিলেন অত বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

লব্ধ বিদ্যা যখন পরিপূর্ণরূপে আয়ত্ত হইল, এবং ইঞ্জিনীয়ারপ্রমুখ সহরে সৌখীন সম্ভ্রান্ত লোকদের গৃহ-ভিত্তির গাত্রে যখন আন্দুর সুনিপুণ হস্তের

কলাকৌশল পরিস্ফুটরূপে প্রসন্ন উজ্জ্বলতায় হাসিতে লাগিল, তখন হায়দরাবাদ হইতে পত্রের উত্তর আসিল। তিনি লিখিয়াছেন যে তিনি বিশেষরূপে সুবিধা-মত কার্য্যের চেষ্টা করিতেছেন, পাইলেই সংবাদ দিবেন, তবে তিনি যুদ্ধবিভাগের লোক হইয়া—এবং যোদ্ধজীবনের সম্পূর্ণরূপে বিশেষজ্ঞ হইয়া, আন্দুর মত অনভিজ্ঞ যুবকসম্প্রদায়কে এই পরামর্শ দেন যে যুদ্ধবিদ্যা অপেক্ষা অন্য কোন নিরাপদ কার্য্যে জীবন-যাপন তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ শ্রেয়স্কর।—আন্দু, পত্রপাঠ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার হিতৈষিতার অজস্র সুখ্যাতি করিয়া তৎপরে লিখিল, তাঁহার উপদেশ-মত সে অত্যন্ত নিরুপদ্রব পথে জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে।

চিত্রকরদিগের দৈনিক উপার্জ্জন আন্দুর পক্ষে মন্দ হইত না ; যত্র আয় তত্র ব্যয় সত্ত্বেও কয়েক মাসেই আন্দুর কিছু জমিয়া গেল। আন্দু খুব উৎসাহের সহিত কুস্তির আখড়ার নূতন সরঞ্জাম কিনিয়া, আবার মহম্মদের বাড়ীতে নিরুৎসাহ কুস্তিগীরদিগকে সমবেত করিয়া তালিম করিতে সুরু করিল। তাহার অযত্নে দলটি প্রায় ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল। আন্দু যখন যে দিকটায় ঝুঁকিত, তখন এমনি প্রাণপণে সেটায় জোর দিত, যে, তাহার চাড়ে যে অন্য দিকটা সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইতেছে, তাহার হিসাব রাখিত না। মহম্মদ প্রায়ই তাহাকে বিদ্রূপ করিত যে "তুমি বেহিসাবী বন্দোবস্তের মধ্যে কোন্ দিন নিজেকে সুদ্ধ খরচ করিয়া ফেলিবে!"

কুস্তির পর মহম্মদের বাড়ীতে প্রতিদিন গীতবাদ্যের চর্চ্চা হইত। এই যুবকসম্প্রদায়ের সংসর্গে প্রাণ ভরিয়া মিশিয়া, আন্দুর সংযত সংহত জীবনের মধ্যে যৌবন-প্রবাহে তরল স্বাচ্ছন্দ্যের ঢেউ খেলিতে আরম্ভ হইল, নিবৃত্তির গাম্ভীর্য্য ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া গেল, চপল প্রবৃত্তি প্রতাপের সহিত

ধীরে ধীরে উন্মেষিত হইতে লাগিল, মনোবৃত্তির পশ্চাতে কর্ত্তব্য-অভিমানের শোভনীয় পরিচ্ছদে সজ্জিত কামনারূপসী নববধূর বেশে সলজ্জ ভাবে উঁকি দিল, আন্দু মুগ্ধ হইয়া দেখিল কি সুন্দর!

২৫

দাদাজীর সহিত কণ্ট্রাক্টর রমানাথ বাবুর বিশেষ আলাপ ছিল। সেদিন ইঞ্জিনীয়ার বাবুর বৈঠকখানায় বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে আন্দুর কথা উঠিতেই, দাদাজী যখন বলিলেন যে ঐ নবীন পেণ্টারটিই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হিউবার্ট সাহেবকে উন্মত্ত ঘোড়া হইতে বাঁচাইয়াছিল, এবং প্রকাশ্য মেলায় ডেপুটীর উদ্ধত জামাতাকে পদাঘাত করিয়াও নির্ব্বিবাদে ভবিষ্যৎ উন্নতির যথেষ্ট সম্ভাবনামূলক চাকরী স্বচ্ছন্দে ছাড়িয়া আসিয়াছে,—তখন আন্দুর উপর সকলেরই একটু সম্ভ্রমের ভাব জাগিয়া উঠিল। পরদিন আন্দু যখন তুলি ছাড়িয়া ছুটীর সময় ছুতারের সহিত করাত চালাইতেছিল, তখন অকস্মাৎ ইঞ্জিনীয়ার বাবু আসিয়া, তাহার সর্ব্বাবয়বের মাপজোঁক করিয়া, তাহার শরীরের বিস্তর প্রশংসা করিলেন ও তাহার জীবন-সম্বন্ধে অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন সুধাইয়া গেলেন। তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া আন্দু ক্ষুণ্ণ মনে ভাবিল, খোদা এমনি বিষম চেহারায় তাহাকে দুনীয়ায় পয়দা করিয়াছেন, যে সেই অভাগাই সকলের চোখে ঠেকিয়া যায়।

কয়েকদিন পরে পুরাতন পেণ্টার মহাশয়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় তিনি কলিকাতা চলিয়া গেলেন। কণ্ট্রাক্টর বাবুর কাজও আর বেশী ছিল না, সুতরাং আন্দু একলাই চালাইতে লাগিল।

এই সময় কণ্ট্রাক্টর বাবু একটি নূতন কাজ ঠিকা লইলেন। এক সাহেবের প্রকাণ্ড বিল্‌ডিংয়ের কিয়দংশ গাঁথিয়া তুলিতে হইবে,

ও অপরাংশের পুনঃসংস্কার হইবে। এবার সর্দ্দার মিস্ত্রি মহম্মদেরও ডাক পড়িল। আন্দু ও মহম্মদ একসঙ্গে কাজে খুব উৎসাহের সহিত লাগিল।

কয়েকদিন পরে কণ্ট্রাক্টর বাবুর দৌহিত্র, ত্রয়োদশ বর্ষীয় রতু বাবু, নিজের গরজে আন্দুর সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলিল,—তাহার পাঠগৃহের দেয়ালের পেণ্টিংগুলি বিকৃত হইয়া চটা উঠিয়া যাইতেছে, সুতরাং আন্দুকে একবার বিশেষ প্রয়োজন। এই সুকোমল সুন্দর বালকটির সহিত খুব আগ্রহের সহিত আলাপ করিয়া আন্দু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, আগামী কল্য রমানাথ বাবু কার্য্যব্যপদেশে কলিকাতা যাইবেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত বিল্‌ডিংয়ের কাজ বন্ধ থাকিবে, সেই অবসরে আন্দু রতু বাবুর ঘর পুনঃ সংস্কৃত করিয়া দিবে।

রতু কথাবার্ত্তা পাকাপাকি করিয়া বিদায় লইল। ছেলেটির ফুট্‌ফুটে পরিষ্কার চেহারা দেখিয়া আন্দুর তাহাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। রতু চলিয়া যাইবার সময় তুলি ফেলিয়া আন্দুর বিল্‌ডিংয়ের দ্বার পর্য্যন্ত আসিল ও কথাপ্রসঙ্গে যখন জানিতে পারিল যে এই সুন্দর কিশোর বালকটি পিতৃমাতৃহীন,—তখন করুণায় তাহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। রতুও এই পেশী-কঠিন-দেহ লোকটির নম্র মনোহর আলাপপরিচয়ে বড় খুসী হইয়া প্রফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরিল।

পরদিন প্রত্যূষের ট্রেনে রমানাথ বাবু কলিকাতা চলিয়া গেলেন।

প্রাতে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আন্দু রমানাথ বাবুর বাড়ীতে আসিল, বাড়ীখানি তাহার অপরিচিত নহে, এই বাড়ীতেই সে একদিন লতিকা ও পরিমল প্রভৃতিকে দেখিয়াছিল। বাড়ীখানা পূর্ব্বে সে ভাড়া মনে করিয়াছিল, গতকল্য কৌতূহল মীমাংসার জন্য রতুকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়াছে বাড়ীখানি

রতুর পিতার। আন্দু লতিকার স্বামী ডাক্তার চক্রবর্ত্তীর নাম উল্লেখ করিতেই রতু বলিল,—"হাঁ তাঁহারা পিতার বন্ধুর আত্মীয়; সেকেন্দরাবাদের বাড়ীতে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসিয়াছিলেন।" আন্দু এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন করিল না, এবং নিজেও যে তাহাদের পরিচিত ব্যক্তি সে কথাও কিছু প্রকাশ করিল না।

প্রাতঃকাল; ক্রমবর্দ্ধমান তপনালোকের দিকে চাহিয়া চাহিয়া হাফেজের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে আন্দু বরাবর আসিয়া বাড়ীর বারাণ্ডায় উঠিল; সে রতুকে ডাকিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সহসা স্তব্ধ হইয়া শুনিল, হলের ঐ দিকে অদূরবর্ত্তী কক্ষ হইতে অতি সুমধুর রমণীকণ্ঠে গীতা পঠিত হইতেছে।—

মুহূর্ত্তে আন্দুর সমস্ত অন্তঃকরণটা আলোড়িত করিয়া সমুদায় চিত্তবৃত্তি সবলে উন্মুখ হইয়া উঠিল, আত্মবিস্মৃত আন্দু পরিপূর্ণ মুগ্ধতায় অভিভূত হইয়া পড়িল। সে ত দাদাজীর মুখে অনেকবার এসব শ্লোক শুনিয়াছে,—কিন্তু সেখানে সে বরাবরই অনুভব করিয়াছে প্রাণস্পর্শী মঙ্গলমন্ত্র;—আজ এখানে, সহসা অন্য কণ্ঠের মধ্যে সে আশ্চর্য্যের সহিত অনুভব করিল, নিবিড় মর্ম্মস্পর্শী মাধুর্য্য-সঙ্গীত।

বাড়ীর চাকর কৃষ্ণ হলঘরের মধ্য দিয়া বাহিরে আসিতেই তাড়াতাড়ি আপনাকে সাম্‌লাইয়া আন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, "রতু বাবু কই?"

কৃষ্ণ রতুকে ডাকিয়া দিতেই আন্দু রতুর সহিত আবশ্যকীয় কথাবার্ত্তা কহিয়া তাহার পাঠগৃহে গিয়া উপস্থিত হইল। গত কল্য পেণ্টিংয়ের মলিন চটাগুলি উঠাইয়া ঘরখানি চূণকাম করা হইয়াছে, সুতরাং আন্দু গিয়াই কাজ আরম্ভ করিল।

দ্বিপ্রহরে ক্লান্তির অবসরে সরল ব্যায়ামে বুকপিঠের অস্থিগুলা সোজা

করিয়া হাত-পা-গুলো সজোরে খেলাইয়া অসাড়তা ঘুচাইয়া যখন আন্দু বিশ্রামের জন্য বসিয়া দেরাজের গায়ে ঠেসানো ঘরের ছবিগুলি দেখিতে-ছিল, তখন চাকর কৃষ্ণকান্ত তাহার সংবাদ লইতে ঘরে ঢুকিল; রতু তখন স্কুলে গিয়াছিল।

কৃষ্ণ আন্দুর সহিত অনেক অনাবশ্যকীয় প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিল। অন্যমনস্ক আন্দু ছবিগুলা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে, সহসা একখানি ক্ষুদ্র ফটোগ্রাফ তুলিয়া সোৎসুকে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ ছবি কার?—"

কৃষ্ণ সকৌতুকে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; আন্দু অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া ভাবিল—তাইত, সে কি নির্ব্বুদ্ধিতাই করিয়া ফেলিয়াছে! কৃষ্ণ বলিল, "চিন্‌তে পারছ না? রতুবাবু আর ওঁর দিদি!"

আন্দু ঢোক গিলিয়া বলিল, "ওঃ!"—যেন সে সত্য সত্যই এতক্ষণে রতুকে চিনিল; কিন্তু তাহা নহে, রতুকে সে চিনিয়াছিল বলিয়াই রতুর পশ্চাৎবর্ত্তিনী বৃক্ষতলে-উপবিষ্টা বৃক্ষকাণ্ডে-বামস্কন্ধ-সংলগ্না, কমনীয়-মূর্ত্তি অনাড়ম্বরবসনা তরুণীর পরিচয়ই জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—ফটোখানি দেখিয়াই তাঁহার সম্বন্ধে একটা তীব্র কৌতূহল আন্দুর মনের মাঝে খর স্রোতে বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। তাহার সদ্যোন্মেষিত শিল্প-কলারসিক গুণগ্রাহী দৃষ্টি চিত্রখানির ভাবমাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল—কিশোর বালক, তরুণীর কণ্ঠাবলম্বনে, ঠিক যেন তাঁহার বক্ষে শ্লথ মস্তক রাখিয়া সম্মুখের দিকে, ভবিষ্যৎ পানে আগ্রহাকুল দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে; আর তরুণী, বালককে দক্ষিণ হস্তে জড়াইয়া, পৃথিবীর কঠিন অনাবৃত বক্ষে বসিয়া, বিশাল বৃক্ষকাণ্ডে নির্ভর স্থাপন করিয়া বেদনাব্যঞ্জক স্নিগ্ধ সকরুণ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধ মুখে চাহিয়া আছে, সে যেন পরম, গভীর, সুদূরগামী দৃষ্টি!

উভয়েরই আকৃতিতে একটা সাদৃশ্যব্যঞ্জক কোমল লাবণ্য ক্রীড়া করিতেছে। একাগ্র দৃষ্টিতে ছবিখানি দেখিতে দেখিতে সহসা আন্দুর মনে হইল, সে যেন এইরূপ চেহারা কোথায় কাহার দেখিয়াছে। ফশ্ করিয়া আন্দ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল,—"এঁর নাম?—"

কৃষ্ণ বলিল, "ডাকে মণি বলে, নাম জোচ্ছনা,—উনি বিধবা।—"

আন্দুর স্তম্ভিত দৃষ্টি নত হইল।

২৬

চার পাঁচ দিনের মধ্যে রত্নুর ঘরের কাজ শেষ হইয়া গেল। তখনো রমানাথ বাবু আসিলেন না। আন্দু খুব ব্যস্ততার সহিত কুস্তির দলের সাগ্‌রেদদের কুস্তির নূতন নূতন প্যাঁচ শিখাইয়া, দীঘিতে ছোট ছোট ছেলেদের লইয়া পর্য্যায়ক্রমে সাঁতার শিখাইয়া এবং পরিচিত অপরিচিত সকলের কুশলাকুশল জানিয়া, কয় দিন কাটাইল। সেদিন যখন ছোট বাবুর সহিত দেখা করিয়া তাঁহার বাসা হইতে প্রাতঃকালে ফিরিতেছিল, তখন পথে কৃষ্ণর সহিত সাক্ষাৎ হইল, কৃষ্ণ ডাক্তারখানা হইতে ফিরিতেছে, তাহার হাতে ঔষধের শিশি। আন্দু জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল—রমানাথ বাবু অসুস্থ হইয়া বাড়ী ফিরিয়াছেন। অভ্যস্ত সংস্কারবশে তখনই তাঁহাকে দেখিতে যাইবার জন্য উদ্যত হইয়া সহসা আন্দু একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, "না চল, আমি দেখে আসি।"

কৃষ্ণ ঘরে গিয়া শিশি রাখিয়া, ডাক্তারের বক্তব্য বিষয় বলিয়া, আন্দুর কথা বলিতেই রমানাথ বাবু তাহাকে ডাকিলেন।

নিকটে বাতায়নে পিঠ রাখিয়া জ্যোৎস্না বসিয়া দাদাবাবুর কথানুযায়ী

একখানি পত্র লিখিতেছিল। অপরিচিতের আগমনের সম্ভাবনায় কাগজ কলম চেয়ারে ফেলিয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া যাইতেছিল, রমানাথ বাবু ডাকিয়া বলিলেন, "মা, আমার মোজা-দস্তানা-গুলো পরিয়ে দাও তো, হাত পা বড় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, উলের গেঞ্জিটাও দিও।"—

জ্যোৎস্না আল্‌না হইতে মোজা ও দস্তানা পাড়িয়া আনিল; উঁচু হুকের উপর হইতে গেঞ্জিটা নামাইতে যেমন হাত বাড়াইয়াছে, ঠিক সেই সময় আন্দু কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই একেবারে উন্নত-মুখী জ্যোৎস্নার সহিত তাহার চোখোচোখি হইয়া গেল। জ্যোৎস্না মাথায় কাপড় ঠিক করিয়া গেঞ্জি লইয়া দাদাবাবুকে পরাইতে আসিল।

আন্দুর আপাদমস্তকে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চমক খেলিয়া গেল!—ইনিই তিনি! যাহার অস্পষ্ট স্মৃতি মনের মাঝে অস্পষ্টতর হইয়া গিয়াছে, যাঁহার শোচনীয় পরিবর্ত্তিত জীবনের ফলে শান্ত সহিষ্ণু মূর্ত্তির মৌন করুণদৃষ্টি তাহার চিত্ত গভীর বিষাদে মুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, ইনিই তিনি!—শিল্পের আদর্শ বটে! আন্দুর সমস্ত চিত্তশক্তি অকস্মাৎ সাগ্রহে উন্মুখ হইয়া,—তাহার অজ্ঞাতে,—সেই সৌন্দর্য্যসুষমা চিত্ত ভরিয়া গ্রহণ করিল,—কি সুন্দর দৃষ্টি! কি মনোহর! আন্দু সারা জীবনের মাঝে এমন শুচিস্মিত, এমন শান্ত দৃষ্টি আর কখনো দেখে নাই! আন্দুর মনে হইল, সে যেন কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া এই দুইটি আদর্শ মনোরম মহিমাময় দৃষ্টির আরাধনা করিয়া আসিতেছে, আজ তাহার সাধনা ধন্য হইল!—এই প্রসন্ন সুপবিত্র দৃষ্টি, এ জগতে অতুলনীয়, সারা বিশ্বের সৌন্দর্য্যের শ্রেষ্ঠ বিকাশ এই দৃষ্টির মাঝে! কি অপরিসীম আনন্দ-সংবাদ! আন্দুর সমস্ত অন্তঃকরণ স্নিগ্ধ হইয়া গেল। জ্যোৎস্না চাহিতেই আন্দু সসম্ভ্রমে পিছু হটিয়া গিয়া দ্বারের বাহির

হইতে রমানাথ বাবুকে অভিবাদন করিল। রমানাথ বাবু তাহার সহিত আবশ্যকীয় কথা কহিতে লাগিলেন।

জ্যোৎস্না দ্বারের দিকে পিছন ফিরিয়া রমানাথ বাবুকে মোজা দস্তানা জামা স্বহস্তে পরাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে অন্য দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেল। জ্যোৎস্নাও আজ মনের মাঝে একটা অননুভূতপূর্ব্ব বিস্ময় অনুভব করিয়া চঞ্চল হইল। দূর হইতে কয়দিন যে সামান্য লোকটাকে দূরে দূরে কাজ করিতে দেখিয়াছে, আজ অত্যন্ত কাছাকাছি তাহার সম্ভ্রমসুন্দর চক্ষু দুটির মাঝে কোমল আগ্রহের সন্ধান পাইয়া সেও কৌতূহল জয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। বিশেষ, মানবসমাজে অপরিচিত দৃষ্টির প্রতি যখনই সে নেত্রপাত করিয়াছে, তখনি সেখানে এমনি একটা জ্বালাময় তীব্রতা অনুভব করিয়াছে—যাহাকে কঠিন ঘৃণায় অবজ্ঞা না করিয়া মোটেই থাকিতে পারা যায় না!—কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ নিকটবর্ত্তী দীপ্ত প্রশান্ত খরত্বহীন দৃষ্টিতে পুণ্যোজ্জ্বল ভাবের আভাষ পাইয়া বড় খুসী হইল।

এই সামান্য লোকটির বিনয়নম্র শিষ্টাচারের সহিত সম্ভ্রান্ত লোকদের গর্ব্বিত ফ্যাসান-বদ্ধ শিষ্টাচারের তুলনা করিয়া দেখিতে দেখিতে—সহসা মেঘছিন্ন রৌদ্রের মত—পুরান কথা তাহার মনে পড়িল—সে ভাগলপুরের কথা! চকিতে ভাগলপুরের সমস্ত ঘটনা তাহার চিত্তক্ষেত্রে একটা সুগম্ভীর স্পর্শ বুলাইয়া গেল—সব চেয়ে বেশী স্পষ্ট মনে হইল, লতিকার বিড়ম্বনা-ক্লিষ্ট আচরণের উপসংহার!—সেই জ্যোৎস্না-যামিনীতে নির্জ্জন ছাদের উপর হইতে দেখা সেই দীপালোকিত কক্ষের সেই গম্ভীর স্থৈর্য্য ও অধীর চপলতার দৃপ্ত সংঘাত-অভিনয়! জ্যোৎস্না ভারাক্রান্ত চিত্তে অন্য-দিকে মুখ ফিরাইল,—মনে মনে বলিল—এই পেণ্টারটির আকৃতি অনেকটা সেই ড্রাইভারের মত!

শীতকালের রৌদ্রের মত সুমিষ্ট হেমাভ-উজ্জ্বল সেই একটা মহত্ত্ব-স্মৃতি সহসা আজ তাহার হৃদয়ের বড় জোরে ঝাপ্টা মারিয়া তাহাকে অনেক দূরের অতীতের পানে বার বার টানিতে লাগিল,—জ্যোৎস্নার বড় ইচ্ছা হইল যে একবার ভাল করিয়া সেই অদৃশ্যপ্রায় অতীত রাজ্যটা সমস্ত চক্ষু মেলিয়া দেখিয়া লয়; কিন্তু কাল মাঝখানে একটা ঘন ছায়ার যবনিকা ফেলিয়া তাহাকে নিষ্ঠুর বিদ্রূপ করিতে লাগিল, সেই পুরাতন—সেই অতীতকে একবার নূতন করিয়া দেখিতে—নূতন করিয়া মর্মের মাঝে অনুভব করিতে, জ্যোৎস্নার মন আজ বড় লালায়িত হইয়া উঠিল, তীব্র কৌতূহল তাহার বক্ষের মাঝে ব্যর্থ চেষ্টায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুর্দ্দম্য ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজন করিল। জ্যোৎস্নার শান্ত নিরুপদ্রব চিত্তের মাঝে সেই পুরান নির্জ্জীব ঘটনাস্মৃতি অকস্মাৎ আজ যেন দানো পাইয়া মহা উৎপাত বাধাইয়া তুলিল!

কলিকাতা গিয়া রমানাথ বাবুর খুব জ্বর হইয়াছিল। জ্বর যদিও সারিয়াছে, কিন্তু শ্লেষ্মার প্রকোপ কমে নাই, তাহাতে তখন বর্ষাকাল, চারিদিকেই অসুখবিসুখ হইতেছে। তিনি আন্দুকে বলিয়া দিলেন যে তাঁহার শরীর সুস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত বিল্ডিংয়ের কাজ বন্ধ থাকিবে।

মহম্মদকে রমানাথ বাবুর আদেশ জানাইতে হইবে বলিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া রাস্তায় নামিয়াই কিন্তু আন্দু সে কথা ভুলিয়া গেল। গন্তব্য অগন্তব্য নানা পথের মধ্য দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে, সে কেবলই জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে লাগিল;—এই জ্যোৎস্না, তিনি যেদিন বিলাসভোগ-উজ্জ্বলা সৌভাগ্য-গৌরবময়ী কিশোরী জ্যোৎস্নাকে আন্দু ভাগলপুরে দেখিয়াছিল, তখন তাহার সৌন্দর্য্য আন্দুর চোখে ভাল করিয়া ঠাহর হয় নাই, আজ তাহাকেই স্পষ্ট করিয়া দেখিল, সংসারের

সর্ব্বসুখবঞ্চিতা অবস্থায়,—ভাগ্যচক্রের নিষ্ঠুর দৈন্যপীড়িত জীবনে,—ঠিক যেন তপশ্চর্য্যার পবিত্রতায়, শান্ত সুন্দর মাধুর্য্যমণ্ডিত বেশে! এই মূর্ত্তির মধ্যে কৃত্রিম শোভা-চাতুর্য্যের লেশ মাত্র আড়ম্বর ছিল না, ছিল শুধু গভীর উদাসীনতা। আন্দু তাঁহার গায়ের সেমিজ, পরণের সরুপাড় ধুতি, হাতের রুলী, কপালের অনাদৃত বিশৃঙ্খল কেশ, কিছুই লক্ষ্য করিয়া দেখে নাই, সে শুধু মুহূর্ত্তের জন্য সন্তর্পণ-চকিত-নেত্রে দেখিয়াছিল মাত্র তাহার চক্ষুদুটি!—সেইখানেই সে যেন তাঁহার সমস্ত পরিচয় জানিয়া লইয়াছিল!

আন্দুর চিত্তের একাগ্রতা যতদিন কাজের মাঝে ছিল, ততদিন কর্ম্মের মাঝে নিরন্তর সে সফলতাই লাভ করিয়াছে, এখন কর্ম্মহীন অলস মুহূর্ত্তগুলা শুধু গভীর চিন্তায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, একটি মাত্র বিষয়কে সহস্র দিক হইতে সহস্র অংশে বিশ্লেষণ করিল। মনুষ্যহৃদয় নামক সজীব পদার্থটা অন্তর্দৃষ্টির অণুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা মোহের দিক হইতে মনোরম ভাবে দেখিতে চেষ্টা করিল,—পদার্থ-বাচক বিশেষ্য মাত্রেই যে অগ্নির ভক্ষ্য সে কথাটা স্মরণ রাখিতে সে ভুলিয়া গেল।

সত্যই তাহার সূক্ষ্ম অনুভব-শক্তিকে ইতিপূর্ব্বে কেহই এমন তীব্র আক্রমণে জাগাইয়া তুলে নাই। তাই এখন সহসা সেটা অত্যন্ত গভীরতার সহিত অনুভব করিয়া সে স্তব্ধ হইয়া গেল। নিতান্ত অনাবশ্যক বোধে জগৎব্যাপারের যে অংশটায় বিদ্বেষের পর্দ্দা ফেলিয়া সে নিশ্চিন্ত মনে এতদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া দিন কাটাইয়াছে, আজ অকস্মাৎ গভীর সংঘর্ষণের মুহূর্ত্তে তাই সেটার দিকে তীক্ষ্ণ আগ্রহ পড়িল, উত্তেজনার ঝাপ্টার বেগে পর্দ্দাটা ছিঁড়িয়া রহস্যগহ্বরের অন্ধকারের অভ্যন্তরে যতদূর সম্ভব দৃষ্টিশক্তি চালাইল,—এবং সেই অলক্ষণীয় অংশটাই যে মানব-জীবনের

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ মহত্তর,—সে সম্বন্ধে আজ তাহার তিলার্দ্ধ সন্দেহ রহিল না।

নয়নের মধ্য দিয়া যে প্রচণ্ড অনুভূতি তাহার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত পুলক-হিল্লোলে প্রবল বেগে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল, আন্দু পরিপূর্ণ সংহত চিত্তে তাহারই সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম মর্ম্মগ্রহণে গভীর ভাবে মনোনিবেশ করিল।

বহুদিন রুক্ষ রূঢ়তার সংসর্গে তাহার চিত্ত এতদিন যে পরিমাণ তৃষ্ণা সঞ্চয় করিয়াছিল, আন্দুর চিত্ত এতদিনে সেই পরিমাণ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে—যাহা সে পান করিতে চাহিতেছে তাহা স্বাস্থ্যকর পানীয়, কি মত্ততাকর সুরা, তাহা বুঝিয়া দেখিবার শক্তি তাহার ছিল না।

২৭

কিছুদিন হইতে আন্দুর চিত্তরাজ্যের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলতার ঘূর্ণী বাত্যা বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল, আন্দু তাহার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার কোন উদ্যোগই না করিয়া আপনাকে ঘূর্ণীর মধ্যবর্ত্তী করিয়া কৌতুক দেখিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। তারপর যখন স্বভাব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে ভয়ঙ্কর ভাব-সমুদ্র উচ্ছ্বাসে সমস্ত চিত্তরাজ্যটা সম্পূর্ণ বিপ্লাবিত করিয়া তুলিল—তখন আন্দু সহসা বিপর্য্যস্ত হইয়া অত্যন্ত আকুলতায় আশ্রয়ের অবলম্বন হারাইয়া উচ্ছৃঙ্খল আনন্দে আপনাকে আশ্বাস দিল, যে, সে ভাসিতে ভাসিতে যদি তলাইয়া যায়, তাহাতে কাহারই বা ক্ষতি! উদ্দাম উদ্দীপনার ঝোঁকে পূর্ব্বাভ্যস্ত নিশ্চিন্ত শান্ত জীবনটার উপর একটু বিশেষ ভাবে আড়ি করিয়াই সে খুব উৎসাহের

সহিত প্লাবনের স্রোতে ভাসিয়া চলিল ; নিজের পৌরুষ-বলের উপর তাহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, সে জানিত, যখন খুসী সে আপনাকে টানিয়া ফিরাইতে পারিবে।

কিন্তু যখন উচ্ছ্বসিত সমুদ্রবারি সরিয়া যাইতে আরম্ভ হইল, এবং তাহার টানে সে আপনাকেও যখন নিম্নগামী হইবার উপক্রম দেখিল, তখন সহসা অত্যন্ত শঙ্কাকুল হইয়া সে প্রকৃতিস্থ হইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তখন পদতলের কর্দ্দমাক্ত মৃত্তিকা শিথিল, অত্যন্ত পিচ্ছিল ! আন্দু শিহরিয়া উঠিল, সে এতখানি আসিয়া পড়িয়াছে ?

কয়েক দিন ধরিয়া নিস্তব্ধ অলসতার মাঝে ক্ষুদ্র রোয়াকটিতে সবেগে পায়চারি করিয়া, ক্রমাগত অসংলগ্ন জটিল চিন্তা-তরঙ্গে মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া আন্দু দেখিল সে এমনি অকর্ম্মণ্য, এমনি ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, যে, কোন কাজের উপর জোর দেওয়া চুলায় যাউক, নিজের অন্তরটার প্রতি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেও তাহার ভরসা হইতেছে না। কিছুদিন হইতে যে দুর্ব্বলতা সে মর্ম্মের মাঝে অনুভব করিতেছিল, আজ সহসা সেই দুর্ব্বলতাকে প্রবল বিপদে রূপান্তরিত হইতে ও তাহার মধ্যে নিজেকে নিঃসহায় বেপথুমান দেখিয়া, আতঙ্কে আন্দু যেন অসাড় অবশ হইয়া গেল ! অনেক দিন আগে, আন্দুর মনে পড়িল, একবার এক বালককে কোরানের ছিন্ন পত্র পোড়াইতে দেখিয়া আন্দু তিরস্কার করিয়াছিল ; তাহাতে সেই দুরন্ত বালক হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল, "ও ত শুধু কাগজ !"—আন্দুর মনে হইল সেও ঠিক সেই বালকের মত মূঢ়তা করিয়া বসিয়াছে,—দুর্দ্দান্ত চিত্ত লইয়া ক্ষুদ্র খেয়ালের খেলায় কৌতুক করিতে গিয়া সেও পবিত্র বিবেকবল ভ্রমের আগুনে পুড়াইয়া আপনি বনিয়া গিয়াছে—শুধু ছাই !

আন্দু আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবনটা সূক্ষ্মদৃষ্টিতে নূতন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ

করিয়া দেখিল,—দেখিল, যাহাতে এত দিন সে ক্রমাগতই সার্থকতা ও সন্তোষ দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা নিরর্থক, নিতান্তই ব্যর্থ! তাহার সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া শুধু অসম্পূর্ণতা ও অসীম অনর্থের শূন্যগর্ভ উপঢৌকন সঞ্চিত রহিয়াছে! ইহা লইয়া, আপনাকে প্রবঞ্চনা করিয়া সে মানুষ বলিয়া এতদিন দিব্য শান্তিতে সুখে দিন কাটাইয়াছে! - তাহার চারিদিকেই অতৃপ্তি, চারিদিকেই নিরাশা, চারিদিকেই নিরর্থকতা, চারি-দিকেই অচরিতার্থতা! ইহার মধ্যে সে একান্ত অবলম্বনহীন নিরাশ্রয়!

চারিদিকে ধূলিলাঞ্ছিত পুস্তকরাশি, অযত্নে পরিত্যক্ত চিত্রযন্ত্রাদি ছড়াইয়া, আন্দু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছে। এমন সময় হাস্যবদন মহম্মদ আসিয়া দ্বার ঠেলিয়া কক্ষে ঢুকিল। আন্দুকে তেমন অবস্থায় নিঝুম হইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—"একি মিঞা, অসুখ বিসুখ করেছে নাকি?"

সবেগে চমকিয়া, উচ্ছলিত চিন্তাস্রোত ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া, আপনাকে উগ্র ঝাঁকুনিতে শক্ত করিয়া আন্দু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল, "কই না। খবর ভাল তো? তোমায় যে কয়দিন দেখিনি,—পাড়ার সবাই ভাল আছে?—দাদাজীর খবর কি জান, ক'দিন যেতে পারিনি।"

আন্দুর কালিমালিপ্ত বিশুষ্ক মুখচোখ দেখিয়া মহম্মদ পুনরায় বলিল, "তোমার এর মধ্যে অসুখ করেছিল নাকি?—বড় যে শুকিয়ে গেছ।"

সে কথা উল্টাইয়া আন্দু অন্য কথা পাড়িল। মহম্মদ বলিল, তাহার পুত্রের জাত-কর্ম্ম উপলক্ষে আজ তাহার বাড়ীতে আন্দুর নিমন্ত্রণ।

যে উদ্যমশীল বন্ধুর মুখপানে চাহিলে সুখের উচ্ছ্বাসে আন্দুর প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিত, আজ তাহার সহিত কথা কহিতে, তাহার বাড়ীতে শুভোৎসবের নিমন্ত্রণ আন্দুর যেন উৎকট বিস্বাদ বোধ হইল। চারিদিকের

মাটী তাহার ধসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, পৃথিবীর নীরস কর্ম্ম-কোলাহল তাহার কানে যেন হতাশার আর্ত্তনাদের মত শুনাইতেছে, তাহার যে এ মহাব্যর্থতার মাঝে কিছুই ভাল লাগিতেছে না, কিছুতেই স্বস্তি মিলিতেছে না,—সে করিবে কি? প্রাণপণে আত্মদমন করিয়া আন্দু মহম্মদের কথায় একটিমাত্র প্রতিবাদ না করিয়া তখনই তাহার সহিত চলিল।—এমনি অবান্তর কথাবার্ত্তা লইয়া, এমনি অসংলগ্নভাবে অনর্গল বকিতে লাগিল যে তাহার মনে যে লেশমাত্র নিগূঢ় চিন্তার গোপন আয়োজন আছে, তাহা মহম্মদ ধারণাই করিতে পারিল না।

আন্দু আপনাকে সজোরে ধাক্কা দিয়া বহির্জগতের কাজে ঠেলিয়া আনিল বটে, কিন্তু আপনাকে আর তাহার সহিত কিছুতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত করিতে পারিল না। এমনি একটা প্রকাণ্ড ব্যবধান মাঝখানে দৃঢ়ভাবে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে, যে, যতই মাথা ঠোকাঠুকি করুক, মাথার রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠা ছাড়া কোনই ফল হইল না। আন্দু দেখিল বহির্জগৎ তাহার নিকট হইতে একেবারে অপরিচিত—একেবারে বিভিন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কোন কালে যে তাহার সহিত প্রাণের যোগ ছিল, সে কথা আন্দু একেবারে স্মরণ করিতে পারিল না; সে যেন চিরদিনই এমনি স্বতন্ত্রভাবে দিন কাটাইতেছে, কোন দিনই কাহারো সহিত তাহার সম্পর্ক ছিল না।

কষ্ট সৃজিত উৎসাহ-আনন্দের আবরণে চিত্তের তীব্রতিক্ততা ঢাকিয়া উৎসবের বাড়ীতে সারা দিনমান কোনরূপে কাটাইল; কোনকালে তামাক না খাইলেও সন্ধ্যার পর যখন অত্যন্ত পরিশ্রান্তির দোহাই দিয়া হুঁকা লইয়া সে নিতান্ত নির্জ্জীবভাবে বসিয়া পড়িল, তখন মহম্মদসুদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তোমার হ'ল কি? আজকের দিনে অমন

মিইয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না, চল আসরে গান বাজ্‌না বসেছে, তুমি না হ'লে তো জাঁকাবে না।" আব্দু নিজের কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে সভয়ে বিস্তর ক্রটী উল্লেখ করিয়া পুনঃপুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিল, কিন্তু নির্দ্দয় মহম্মদ কোনো আপত্তি শুনিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল; পরিচিত শিষ্য-বন্ধুজন গান গাহিবার জন্য প্রবল পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। অন্তরে অন্তরে আহত ক্ষুব্ধ হইয়া আব্দু মুখে শুধু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "উঁচুতে পাল খাটাতে গিয়ে বুকে বড় ধাক্কা লেগেছে, গাইতে গেলেই লাগ্‌বে, তোমরা গাও!"

বুকের কোন্ শিরাটা যে আহত হইয়াছিল, তাহা আব্দু নিজেই জানিত না। অবশ্য সেটা চিকিৎসাশাস্ত্রের অন্তর্গত নহে, ইহা নিশ্চয়। যে সূক্ষ্ম কোমল অননুভূত তীব্র নেশা, বেদনার মত তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে অহরহ স্পন্দিত হইতেছিল, বাতাসের সঙ্গে যাহার মাদকতা স্তরে স্তরে জমিয়া পলকে পলকে তাহার নিঃশ্বাস মত্ত-বিষাদে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছিল, যে অভিনব অনাস্বাদিত উদ্দাম আবেগে তাহার আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়াছিল,—তাহাতে যে ধৈর্য্য ধরিয়া অন্যের চিত্তরঞ্জন তাহার পক্ষে একান্ত অসম্ভব, এ কথা শতবার স্বীকার্য্য।

গান বাজনা চলিতে লাগিল, মহম্মদের এক কুটুম্ব যুবক কণ্ঠস্বরের খ্যাতি লাভ করিয়া উৎসাহ-উদ্বেলিত কণ্ঠে গান ধরিল—

"তুম্‌সে হাম্‌সে পেয়ার ভয়া হ্যায়, তুনিয়াসে কোন্ কাম্?
শাওন রয়্‌না বাঢ়ে আঁধেরী বর্‌খে অবিরাম!"

আব্দুর হৃদ্‌পিণ্ড ধক্ করিয়া লাফাইয়া, তাহার পর সহসা স্তব্ধ তন্ময় হইয়া গেল! এমন মৃত্যু-বিহ্বল বিকলতা সে জীবনে কখনো অনুভব করে নাই! গানের তালে তালে সে যেন ক্রমশঃ নির্জ্জীব, মুমূর্ষু হইয়া

আসিল! একি গান এ যে তাহার আপন চিত্তের দৃশ্য। একটা গভীর আবেগভরা ভাব তাহার সারা চিত্ত মথিত করিয়া সবেগে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। আন্দু অন্ধকারে মুখ ফিরাইয়া ছিল, কেহ দেখিল না, অকস্মাৎ সে সভা ছাড়িয়া উঠিয়া গেল।

কোলাহলময় জগৎ তাহার কাছে একেবারে ডুবিয়া গেল, তাহার দৃষ্টিতে রহিল শুধু তুটি শান্ত স্মিত চক্ষু।

তুঃস্বপ্ন-আবিষ্ট ও আতঙ্কে আড়ষ্ট উদ্ভ্রান্ত আন্দু এমনি একটা বিপ্লবময় গভীরতার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া ফেলিল যে সারা বিশ্বের মধ্যে কোথাও সে অবলম্বনের আশ্রয় পাইল না। চারিদিক হইতে কঠিন বিভীষিকা যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিল। উন্মাদের মত নির্জ্জন পথে রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে শেষ রাত্রে বাসায় আসিয়া শয়ন করিল!

মাথা একটু ঠাণ্ডা হইলে ভাবিল—সে করিতেছে কি?

২৮

অতি প্রত্যূষে দাদাজীর আহ্বানে দ্বার খুলিয়া আন্দু এমনি ভাবে তাঁহার পানে চাহিল, যেন সে এখনিই কাহাকে খুন করিয়া আসিয়াছে; উষ্ণ মস্তিষ্কের অদ্ভুত-কল্পনা-উদ্ভূত আশঙ্কার বেগে কম্পিত বক্ষে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। দাদাজী বলিলেন, "বড় বিপদ, আন্দু, তোমায় তাই বল্‌তে এলুম।...রমানাথ বাবুর অবস্থা বড় খারাপ...আর বাঁচ্‌বেন না।

আন্দুর শ্রবণশক্তি যেন লোপ পাইয়া গিয়াছিল, সে জড়বৎ বসিয়াই রহিল। দাদাজী বলিতে লাগিলেন, "হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে জ্বর খুব বেড়ে

গেছে, ছুদিকে নিউমোনিয়া হয়েছে। কল্‌কাতায় টেলিগ্রাম করা হয়েছে, এখনি ছুজন ডাক্তার আস্‌বেন, আমি তাদের আন্‌তে ষ্টেসন যাচ্ছি; তুমি আর ঘুমিওনা, তোমারও যেতে হবে,—"

স্বপ্নাবিষ্ট আন্দু সবেগে মাথা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ত্রস্ত স্বরে বলিল, "আমি যে আজই মক্কা যাব, দাদাজী।"

দাদাজী বিচলিত হইয়া বলিলেন, "কেন?—কে সঙ্গে যাবে?"

আন্দু ভীতচকিত নয়নে চাহিয়া বলিল, "কেউ না, একলা।"

দাদাজী বলিলেন, "একলা!—ওঃ!—সে তীর্থ অনেক দূর! এখন যেটা আট্‌কেছে সেইটা করবে চল, তীর্থের সময় এর পর ঢের পাবে!—"

আন্দু নিঝুম হইয়া গেল, তাহার কানে শুধু বাজিতে লাগিল, তীর্থ অনেক দূর! তীর্থের সময় সে ইহার পর পাইবে,—এখন শুধু কাজ! তীর্থের অধিকার তাহার নাই, তীর্থ হইতে সে যে অনেক দূরে চলিয়া আসিয়াছে, যে আবর্জ্জনার বোঝা চিত্তের উপর চাপাইয়া সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা কি শুধু রক্তমাংসের দেহটাকে খাটাইয়া কতকগুলি ক্রিয়ানুষ্ঠান করিলেই সুস্থ মুক্ত হইতে পারিবে? না না—কালীর দাগ তুলিতে হইবে ঘসিয়া! দাদাজী সত্যই বলিয়াছেন, তীর্থ অনেক দূর! লক্ষ্যহারা সঙ্গীহীন আন্দু একাকী সেখানে কিসের জন্য বৃথা যাইবে?

দাদাজী বলিতে লাগিলেন, যে, রমানাথ বাবুর জনবিরল বাড়ীতে শক্তিসামর্থ্যযুক্ত সেবার লোক নাই, তাই তিনি আন্দুকে ডাকিতে আসিয়াছেন; কারণ ইতিপূর্ব্বে যখন দরিদ্র বিধবার দৌহিত্র নূরুদ্দিনের মাথায় ইট লাগিয়া বালকটি মৃতপ্রায় হইয়াছিল, তখন আন্দু কিরূপ দক্ষতার সহিত সেবাশুশ্রূষা করিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল, তাহা তো তিনি ভাল

রকমই দেখিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি আন্দুকে একাজের উপযুক্ত মনে করেন—।

আন্দু উপযুক্ত !—হায় সরলপ্রাণ বৃদ্ধ, আজ আন্দুর কি হইয়া গিয়াছে তাহা তো কেহই জান না !—আন্দু যে শুচিতার বলে দক্ষতার সহিত নির্ব্বিকার চিত্তে জগতের সকল কাজে প্রাণ ঢালিয়া ধন্য হইত, আজ যে সে-শুচিতা সে-নিষ্ঠা তাহার নাই ! আজ সে যে অনুপযুক্ত, একান্ত অপারগ ! কেন অনুপযুক্ত, তাহাও যে সে বলিতে পারে না ! রোগীর কক্ষ – সে ত তাহার চক্ষে পূর্ব্বে ছিল দেবতার মন্দির !—এখন, এখন যে তাহার চক্ষে সেই পুণ্যদীপ্তি নাই, তবে সে কোন্ সাহসে সেই স্বর্গ শুচিতার সান্নিধ্যে অগ্রসর হইতে ভরসা করিবে।

দাদাজী বলিলেন, "কাল তোমায় খুঁজ্‌তে এসে দুবার ফিরে গেছি, কোথায় ছিলে ?"

আন্দু বলিল, "মহম্মদের বাড়ী।"

দাদাজী বলিলেন, "আমিও তাই মনে করেছি যে তুমি ত কোথাও চুপ করে বসে থাক্‌বার লোক নও,—তা, সে যাই হোক, এখন চল শীগ্রী।"

আন্দু বিমূঢ়ের ন্যায় চাহিয়া বিকল কণ্ঠে বলিল, "আমি গিয়ে কি করব ?—"

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দাদাজী বলিলেন, "কি করবে ?" সত্যই এমন নির্ব্বোধ প্রশ্ন আন্দুর মুখে কেহ কখনো শুনে নাই ; রোগীর বাড়ীতে গিয়া কি করিতে হইবে, তাহা আজ আন্দুকে দাদাজী বুঝাইয়া দিবেন ? এমন অবস্থায় কি করা উচিত—তাহা কি পুরাণ তন্ত্র খুলিয়া দাদাজী ব্যবস্থা দিবেন ? এমন নিদারুণ সঙ্কটের মুখেও সে নিশ্চিন্ত হইয়া প্রশ্ন করিতেছে ! সে কি বিপদের বুকে মাতালের মত ক্ষুদ্র খেয়াল লইয়া পড়িয়া থাকিবে ?

তাহার হাতে শক্তি আছে, তাই সাংসারিক কাজে তাহার ডাক পড়িয়াছে, সে কি হাত পা গুটাইয়া এখনো অলসভাবে ঘুমাইতে চায়!—

আন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। না, সে যেমন পুরুষ মানুষ হইয়া জন্মিয়াছে, তেমনি পুরুষত্বের সদ্ব্যবহার করিয়া পৌরুষের গৌরব রাখিবে। ভয় কি! কর্ত্তব্য সকলের আগে, কর্ত্তব্যকে ফাঁকি দিয়া কে কবে শ্রেয় লাভ করিয়াছে? সংসারে সকলেই সার্থকতা লাভ করিতে পারে না, সে ও এই ব্যর্থ বেদনার মধ্যে আপনার ক্ষুদ্র অস্তিত্বটি বলিদান দিয়া, সংসারে সকলের জন্য পূর্ব্বের মত আন্দু হইয়া কাজ করিবে। মক্কা অনেক দূর,— কিন্তু এই রোগশয্যা, এ তো নিকটস্থ, আগে ইহারই স্পর্শে সে চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া লউক, তাহার পর তীর্থ!

আন্দু বলিল, "চলুন!"

২৯

কলিকাতার সাহেব ডাক্তারদের লইয়া যথাসময়ে দাদাজী রমানাথ-বাবুর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তারেরা রোগীকে যথা-বিহিত পরীক্ষা করিয়া, পূর্ব্ব হইতে স্থানীয় যে ডাক্তারটি দেখিতেছিলেন তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া, চিকিৎসা ও শুশ্রূষার যথানির্দ্দিষ্ট বন্দোবস্ত বলিয়া কহিয়া পারিশ্রমিক লইয়া বিদায় হইলেন।

চিত্তের সমস্ত শক্তি সবলে সংহত করিয়া রোগীর পায়ের কাছে আন্দু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বেলা হইল। দাদাজী স্নানাহার করিতে বাসায় গেলেন, তিনি ফিরিয়া আসিলে আন্দু যাইবে। রতু রোগীর মাথার কাছে উদ্বিগ্ন হইয়া বসিয়া রহিল।

সেঁকের সময় হইল; জ্বলন্ত আগুনের কড়া গামছায় ধরিয়া মাথার

কাপড় দিয়া জ্যোৎস্না ঘরে ঢুকিল। আন্দু উঠিয়া দাঁড়াইল, মৃদুস্বরে রতুকে বলিল, "কৃষ্টকে ডেকে দিন্, আমি সেঁক দেব।"

জ্যোৎস্না নতমুখে বলিল, "সে যে ডাক্তারখানা গেছে।" "রতুর হাতের ফোস্কাটা কেমন আছে?"

রতু হাত তুলিয়া দেখাইল, মধ্যমাঙ্গুলীর উপর মস্ত ফোস্কা। আন্দু নতশিরে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, কোন কথা কহিতে তাহার সাহস হইল না। যে প্রাণীটির অগোচরে যাঁহার অস্তিত্বের ছায়া লইয়া, সংসারের অজ্ঞাতে, সমাজের অদৃশ্যে, মনোরম স্বপ্নকুহক-পুরে সকলের প্রান্তে, সকলের ঊর্দ্ধে, অন্তরের গোপনকক্ষে, যে বিচিত্র সৌন্দর্য্য-পূজায় সে আত্ম-হারা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের কলুষ স্পর্শ না করুক, তবু ত সে অপরাধ! সে চিন্তা যতই বিশেষত্বসূচক তন্ময় হউক, তবু ত সে ভ্রম! তাহার শক্তি কোথা! দোষীর সাহস নাই! আন্দু ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গিয়া বারান্দায় পদচারণা করিতে লাগিল। তাহার সমগ্র স্নায়ু-কেন্দ্রের একাগ্র গ্রন্থি আকুল বেদনায় হাহাকার করিয়া শতছিন্ন হইয়া গেল! ধিক্ সে এমনি দুর্ব্বল ভীরু! এই আন্দুই না আজীবন পরের উপকারে বদ্ধপরিকর হইয়া কার্য্যসাধনের একগুঁয়েমির ঝোঁকে নিজের জীবন-মরণের শঙ্কা রাখিত না!—সেই আন্দুর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা এখন বাতাসের ফুৎকারে ক্ষণে ক্ষণে শূন্যে মিলাইতেছে! সে না পুরুষমানুষ! সে না পৌরুষে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায়!—এই কুণ্ঠিত ত্রস্ত মন লইয়া সে পৌরুষের গর্ব্ব করে? ধিক্।

আন্দু তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরিয়া আসিয়া আগুনের কড়াখানা ধরিয়া সবেগে ঝাঁকানি দিয়া উপরের ছাইগুলা উড়াইয়া নতমুখে বলিল, "সরুন, আমি একাই সেঁক দেব।"

জ্যোৎস্না ক্ষীণভাবে বলিল, "একলা তো সুবিধে হবে না, আমি সুদ্ধ, ধরি।"

আন্দুর মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। আগুনের গনগনে আঁচের মত তাহার মুখখানা উজ্জ্বল লাল হইয়া উঠিল। জ্যোৎস্না জলের হাঁড়ি চাপাইল। আন্দুর ইচ্ছা হইল সে প্রাণপণ চীৎকারে উত্তর দেয়, আমি পারিব না, আমি পারিব না,—কিন্তু তাহার রুদ্ধকণ্ঠে একটি শব্দও উচ্চারিত হইল না।

রোগযন্ত্রণাচ্ছন্ন রমানাথ বাবু চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "ওকি!"

আন্দু চমকিয়া উঠিল। রতু বলিল, "কি বল্‌ছেন দাদাবাবু?"

রমানাথবাবু পাশ ফিরিয়া বলিলেন, "ও কে মণি? রতু, ওখানে কে?"

আন্দু কাছে আসিয়া বলিল, "আজ্ঞে আমি।"

তিনি শান্ত ভাবে, পুনশ্চ তন্দ্রাচ্ছন্ন হইলেন।

সেঁক আরম্ভ হইল। দুই জনে ভিজা ফ্লানেল গামছায় দিয়া নিংড়াইয়া ফেলিতে লাগিল, জ্যোৎস্না রোগীর বুকে সেঁক দিতে লাগিল। আনত দৃষ্টি আন্দু জ্বলন্ত কড়াইয়ের পানে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল—কি বিড়ম্বনা পরমেশ্বর! যে দুর্ভেদ্য ব্যবধান কখনো ঘুচিবার নহে, তাহা এক মুহূর্ত্তে কাগজের আবরণের মত অতর্কিতে খসাইয়া একই কাজে দুইজনের হাতে হাতে মিলাইলে!—এ কি বিভীষিকা?—না বিপন্মুক্তির বিমল আনন্দের পূর্ব্বাভাস?

আন্দু সময়োচিত ঘটনা-সংঘাতে অন্তরের আকৃতিটা খুব শান্তভাবে তলাইয়া দেখিবার চেষ্টা করিল। সে কি সত্যই একটা ভ্রমের মধ্যে আপনাকে এমন ক্লান্ত করিয়াছে? ইহা কি সত্যই একটা ক্ষণিকের মোহ

ব্যতীত আর কিছুই নহে? আব্দুর মস্তিষ্কে চিন্তাবেগ খরস্রোতে বহিতে আরম্ভ হইল, এতখানি মর্ম্মান্তিক আলোড়ন, এ কি সত্যই কিছু নয়?

৩০

আব্দু জ্যোৎস্নাকে দূরত্বের মোহ-মরীচিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী করিয়া নিশ্চিন্ত আরামে যতক্ষণ দেখিয়াছিল, ততক্ষণ সে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বল্গাছিন্ন অশ্বের ন্যায় ইচ্ছা-মত মনোবৃত্তিগুলাকে দিগ্বিদিকে ছুটাইয়াছিল, কিন্তু অবস্থা-বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এখন সে ক্রমশঃ সচেতন হইয়া যখন ভাল করিয়া চাহিল, তখন জ্যোৎস্নাকে একেবারে অত্যন্ত আত্মীয় ভাবে নিতান্ত কাছা-কাছি দেখিয়া তাহার বিপদাচ্ছন্ন ধৈর্য্য-সম্ভ্রমমণ্ডিত পুণ্য গম্ভীর শ্রীতে অভিষিক্ত মনোহর মূর্ত্তি দ্বিতীয় বার দেখিয়া ক্রমে ক্রমে গভীর বেদনায় তাহার বক্ষ ভরিয়া উঠিল; নিজের অবস্থা ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ হইল না, সে অত্যন্ত গভীর সংযমে মর্ম্মের মধ্যে স্বর্গীয় শ্রদ্ধার চরণে নিঃশব্দে আপনাকে পরিপূর্ণরূপে নত করিল।

হৃদয়-বীণায় সৌন্দর্য্যের অর্চ্চনা-সঙ্গীত গাহিতে গিয়া বাসন্তী সুরের তরুণ উন্মাদনায় অকস্মাৎ উদ্দাম আবেগে যে স্বর্ণাভ উজ্জ্বল কুসুম-কোমল স্বপ্ন রচনা করিয়া অন্তরের গোপন-গৃহে যে রমণীর আদর্শ সম্ভ্রমের আসনে স্থাপন করিয়া মুগ্ধ অবশ হইয়া গিয়াছিল, আব্দু সজোরে তাহার সম্মুখে আপনাকে খাড়া করিয়া তুলিল।—নিজের মূঢ় অজ্ঞতায় সমস্ত হৃদয়টা তপ্ত-নিঃশ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তবু সে সেই আবেগ-রচিত বেদনার

স্বর্গসৃষ্টি দানবের নির্ম্মমতায় সমূলে ধ্বংস করিয়া সংহারলীলার শেষে আপনাকে মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব করিয়া সার্থক হইতে পারিল না; সে দুই হাতে আপনার বক্ষ চাপিয়া ধরিল;—সেই ক্রূর বীভৎস মারণ-যজ্ঞ তাহার দ্বারা হইবে না, এ ভ্রম ভ্রমই হোক—সে এই ভ্রমকে সম্ভ্রমের সহিত নত-শিরে চিরদিন পূজা করিবে! এ ভ্রম সে কখনো ভুলিতে পারিবে না,—এ তো ভুলিবার জন্য নহে, এই ভ্রমকে সে চিরজীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার মধ্যে সার্থকতা লাভ করিবে।—এ ভ্রম অন্যের কাছে বিসর্জ্জনের আবর্জ্জনা হইতে পারে, কিন্তু তাহার কাছে এ ভ্রম মনুষ্যত্বের, পৌরুষ-নিষ্ঠার বিস্ময়-প্রতিমা! এই ভ্রম সে জীবনের সম্বল, মরণের মঙ্গল বলিয়া মাথায় তুলিয়া লইয়াছে,—রাখিবেও। জগতের উপহাসে এই ভ্রম তীব্র অবজ্ঞায় পায়ে দলিয়া সে জগতের কাছে গৌরব অর্জ্জন করিতে চাহে না, সে আপনার অন্তরের কাছে বিশ্বস্ত থাকিবে,—জগতের কাছে শ্রদ্ধা অর্জ্জনের জন্য সে পিশাচের নিষ্ঠুরতায় আপনার আত্মেতরকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া আকাশে উড়াইতে পারিবে না!

দাদাজী আসিয়া আব্দুকে আহারাদি করিতে পাঠাইয়া দিলেন। আব্দু যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতায় স্নানাহার শেষ করিয়া দ্রুতপদে ফিরিয়া আসিল। বাহিরের বারান্দায় কাহাকেও না দেখিয়া সে জুতা খুলিয়া নিঃশব্দে একেবারে রোগীর ঘরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিতে উদ্যত হইয়া সহসা সে নিরস্ত হইল, শুনিল জ্যোৎস্নাদেবী বলিতেছেন, "আমিও তাই মনে করেছি, দাদাজী। দু তিন বছরের কথা, স্পষ্ট মনে নাই, কিন্তু লোকটির চেহারা যে ঠিক তারই মত, তা আমার দেখেই মনে হয়েছিল। এই আব্দুই সেই ভাগলপুরের ড্রাইভার! ওঃ—"

সত্রাসে আব্দুর সমস্ত চিত্ত আড়ষ্ট হইয়া গেল। ইঁহারা তাহারই

কথা লইয়া আলোচনা করিতেছেন! যে অতিষ্ঠ কল্পনা ক্ষিপ্ত হৃদয় গুরু-দায়িত্বের কঠিন আকর্ষণে সংযত করিয়া সে ধীরে ধীরে শৃঙ্খলার মধ্যে ফিরিতেছিল, মুহূর্ত্তে তাহা যেন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—সমস্ত বৈধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণে সহসা দুরন্ত মনোবৃত্তি উগ্র হইয়া দাঁড়াইল। পুষ্পাঞ্জলির পূত-সংস্কৃত মন্ত্র যেন অকস্মাৎ উৎকট প্রলাপের মধ্যে ম্লান হইয়া গেল। আন্দু আর ঘরে ঢুকিল না, ধীরে ধীরে বারান্দায় আসিয়া একটা চেয়ার লইয়া বসিল।

আন্দু আপনার দৃঢ়তাকে শত ধিক্কার দিল। তাহার মনে পড়িল অনেক দিন আগে, শৈশবে একদিন মেঘাড়ম্বরময়ী অনাবস্থা রাত্রিতে সে একাকী দূরতর স্থান হইতে বাড়ী ফিরিতেছিল; মধ্য পথে শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইলে নিরাশ্রয় বালক সবেগে ছুটিতে আরম্ভ করে; সহসা অদূরে বজ্রপতন হইল,—বালক মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তারপর অকস্মাৎ উচ্চ হাস্যে বলিল, "আমার ভয় কি!"—যেন সেই অসমসাহসী বালকের সহিত স্বয়ং পরমেশ্বর বিদ্রূপ করিতেছেন,—তাই বালক প্রকৃতির ভীষণ ভ্রূকুটি অবজ্ঞার হাস্যে অগ্রাহ্য করিতেছে। সেই আন্দু আজ যৌবনে এ বিড়ম্বনা কি করিয়া জয় করে দেখিবার জন্য এও কি অদৃষ্টের কৌতুক?

মস্‌মস্‌ করিয়া ডাক্তার বাবু আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন। আন্দুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন কেমন আছেন?"

আন্দু থতমত খাইল। তাই ত! সে নিজে এখানে রহিয়াছে বটে, কিন্তু সে তো রোগীর সংবাদ কিছুই জানে না, সে তো আপনার সংবাদ লইতেই বিহ্বল। আন্দুর হৃৎপিণ্ডের উপর কে যেন সজোরে করাত

চালাইল। আন্দু নত মুখে বলিল, "আমি এই আস্‌ছি, এখনো ঘরে যাইনি।"

ডাক্তারের সহিত আন্দু ঘরে ঢুকিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া গম্ভীর মুখে উঠিয়া আসিলেন। বাহিরে আসিতেই দাদাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রকম?"

ডাক্তার বিষণ্ণ ভাবে বলিলেন, "আর কি বল্‌ব? আমাদের চিকিৎসার সময়, যতক্ষণ শেষ নিশ্বাস, ততক্ষণ পর্য্যন্ত। আর ঘণ্টা দুই দেরি,— তারপর ইঞ্জেক্ট করা যাবে।"

ডাক্তারকে সত্বর আসিতে বলিয়া তাঁহারা ঘরে ফিরিলেন। আন্দু রমানাথ বাবুর মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। যন্ত্রণাচ্ছন্ন রমানাথ বাবু সহসা পার্শ্বোপবিষ্ট দাদাজীর পানে চাহিয়া সবেগে বলিলেন, "পণ্ডিতজী, বড় যন্ত্রণা!"

দাদাজী সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "কি কর্‌বেন বলুন, এ রোগের যাতনা তো ঐ রকমই। কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?"

মাথা নাড়িয়া রমানাথ বাবু বলিলেন, "রোগের নয়, রোগের নয়,— বুকে, এই বুকে!"—তিনি পার্শ্বোপবিষ্টা জ্যোৎস্নার হাতখানা টানিয়া বুকের উপর চাপিয়া ধরিলেন। গৃহপ্রান্তে কম্বলে উপবিষ্টা মাসীমা মালা হাতে করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন; জ্যোৎস্না ও রতু রুদ্ধস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আন্দুর বুক যেন কে ভাঙ্গিয়া দিল! অনেক কষ্টে সকলে একটু শান্ত হইলে রমানাথ বাবু মাথা ঘুরাইয়া, আন্দুকে দেখিয়া বলিলেন, "তুমি এখনো রয়েছ, বাবা?"

জ্বলন্ত-কশাহত-অন্তর আন্দু কথা কহিতে চেষ্টা করিল, পারিল না। দাদাজী বলিলেন, "আজ রাত্রে সেঁক দেবার জন্যে আন্দু এখানে রয়েছে,"—

রমানাথ বাবু আশ্বস্ত ভাবে বলিলেন, "বেশ।"—তারপর সহসা গভীর স্বরে বলিলেন, "আপনারা সবাই রইলেন, এদের দেখবেন!—" তিনি আকুল ভাবে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আন্দু ঘর হইতে বাহিরে চলিয়া গেল।

৩১

সমস্তই ব্যর্থ হইল।—জ্যোৎস্নার সেবা, দাদাজীর যত্ন, রতুর উদ্বেগ, মাসীমার কাতরতা, আন্দুর মর্ম্মপীড়া, সমস্ত অতিক্রম করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে রমানাথ বাবু ইহধাম ত্যাগ করিলেন।

যথাসময়ে যথাবিধানে শবদাহান্তে শববাহিগণ স্নান করিয়া রতুকে লইয়া যখন বাড়ী ফিরিল, তখন অস্নাত বিশুষ্ক আন্দু শ্মশানের কাছে বটবৃক্ষতলে ধূলার উপর বসিয়া পূর্ব্বাকাশের বিকাশোন্মুখ তরুণ তপনের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আশান্বিত প্রাণে ভাবিতেছিল—কি চমৎকার, কি সুন্দর!

অনেকক্ষণের পর, অনেক ভাবনার পর, অন্তরের মীমাংসা এবং বাহিরের রৌদ্র যখন খুব চম্‌চমে পরিষ্কার হইয়া উঠিল, তখন আন্দু ধীরে ধীরে উঠিয়া নিজের বাসার দিকে চলিল।

খানিক দূরে আসিতেই কৃষ্ণ আসিয়া পথরোধ করিল, বলিল, "দাদাজী তোমায় খুঁজছেন, বাড়ী চল।"

আন্দু সজোরে নিজের ঘাড়টা টিপিয়া ধরিয়া বলিল, "বাড়ী আর নয়, এখন বরাবর মক্কার দিকে চলেছি।"

দুই তিনবার পীড়াপীড়ি করিয়া, কৃষ্ণ অবশেষে বলিল, "বাসায় যাচ্ছ, চান্ করে যাও।"

ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিয়া আন্দু বলিল, "আমি যে নিজেই অশুচি!"—পর মুহূর্ত্তেই আত্মসম্বরণ করিয়া, বিস্মিত কৃষ্ণের মুখপানে চাহিয়া কোমল স্বরে বলিল,—"আমি যে মুসলমান, শ্মশান থেকে এলে আমাদের চান কর্ত্তে নেই। তুমি দাদাজীকে বোলো, আমি এর পর তাঁর সঙ্গে দেখা করব!"

আন্দু চলিয়া গেল।

যথাসময়ে চতুর্থীর শ্রাদ্ধ হইয়া গেল। এই শোকবিহ্বল পরিবার লইয়া দাদাজী বিব্রত হইয়া রহিলেন, একাকীই তাহাদের সকল কার্য্য দেখিতে লাগিলেন; রমানাথবাবুর যে-সমস্ত কাজ ঠিকা লওয়া ছিল, সত্বর তৎসমুদায়ের বিলি বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন; বেশী দেরী হইলে লোকসান দিতে হইবে, সুতরাং হিসাবপত্র দেখিতে ও সান্ত্বনা দিতেই তাঁহার কয়েক দিন কাটিয়া গেল।

আন্দুর কিন্তু কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না! সে যে সেই শ্মশান হইতে কোথায় গেল, কেহই বলিতে পারিল না, দাদাজী উদ্বিগ্ন হইয়া চারিদিকে তাহার খোঁজ লইলেন; বাসায় চাবি রহিয়াছে, মহম্মদ কিছুই জানে না। দাদাজীর বড় গোলমাল বোধ হইল।

মর্ম্মভেদী আলোড়নের নিষ্করুণ সংঘাতে, জ্যোৎস্নার অনুভব শক্তি প্রথমটা যেন লোপ হইয়া গিয়াছিল, কি হইল না হইল তাহা যেন তাহার বুঝিবার ক্ষমতা ছিল না; কলের পুতুলের মত প্রাণহীন ভাবে ঘটনার ইঙ্গিতে পরিচালিত হইতেছিল। ক্রমশঃ শোকের তীব্র আঘাত যখন হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, তাহার অসহ্য তীক্ষ্ণতা সহ্য করাইয়া হৃদয়ের মাঝে বসিয়া

গেল, তখন সেই গভীর ক্ষতের জ্বালার মুখে, দাদাজীর অমায়িক সান্ত্বনার স্নিগ্ধ স্পর্শের প্রলেপে মূর্চ্ছিত অনুভূতি চৈতন্যে উদ্বোধিত হইলে এক-জনের কথা তাহার মনে সমবেদনার সুরে গভীরভাবে বাজিতে লাগিল।—তাহার ভক্তিভাজন, বড় ভালবাসার দাদাবাবুর অন্তিম অবস্থায়, যে অন্তিমের বান্ধব প্রাণপণ খাটুনি খাটিয়া তাহাকে চির-কৃতজ্ঞ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, সে যে শ্রদ্ধান্বিত হৃদয়ে অত সহৃদয়তায় শ্মশান পর্য্যন্ত দাদাবাবুর সহিত গিয়া আর বাড়ীতে ফিরিল না,—এই কথাটা বড় মর্ম্মান্তিক রূপে তাহার মর্ম্মে জাগিতে লাগিল। সে সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া কেন সহসা ওরূপে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল? শোকের বেদনার সহিত আর-একটা অজ্ঞাত কাতরতা তাহার চিত্ত ক্রমে ক্রমে আলোড়িত করিয়া তুলিল,—সে কেন চলিয়া গেল?

৩২

তারপর আড়াই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। সেকেন্দ্রাবাদ হইতে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া আন্দু পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণের কাহাকেও কিছু না বলিয়া, সমুদ্র জাহাজে খালাসির কাজ লইয়া সকলের অজ্ঞাতে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল। আন্তরিক উদ্দেশ্যের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থিরতা ছিল না বলিয়া সে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ, অনভিজ্ঞ কাহারও পরামর্শের মুখাপেক্ষী হয় নাই, এমন কি পরম শ্রদ্ধাভাজন, গভীর স্নেহবৎসল দাদাজীকেও একটা কথা বলে নাই। সুলভ শান্তিতে স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের প্রশস্ত পথ ছাড়িয়া কেন সে দাসত্বের ফাঁশে মাথা গলাইয়া বিপদসঙ্কুল পথে সুদীর্ঘ ভ্রমণে বাহির হইবে, কিসের জন্য নির্ম্মম কৃতঘ্নের মত পরিচিতজনের স্নেহ-মমতা এড়াইয়া,—অপরিচিত দেশে অনির্দ্দিষ্টের উদ্দেশে উধাও হইবে, এ সকল জবাবদিহির আশঙ্কা তাহার মনকে বড়ই বিপন্ন-কাতর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধির ব্যাঘাত ভয়ে সে চিরদিন যেমন কঠোর তেজস্বিতায়, নিজের বিয়োগ বেদনা পরিতপ্ত হৃদয়ের কণ্ঠ নিষ্পেষণ করিয়া কাজের পথে আপনাকে তাড়াইয়া বাহির করিয়াছে,—এবারেও ঠিক তেমনই ভাবে, ততোধিক নিষ্ঠুর ঔদ্ধত্যে শাসন করিয়া, অপরিসীম মনস্তাপভারে জর্জ্জরিত—অবসন্ন হৃদয়মনকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া দুর্ব্বহ দায়িত্ব শৃঙ্খলে বাঁধিয়া, আপনাকে অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছিল। পিছনের কাহারও মুখ স্মরণ করিয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলিবার সাবকাশ পর্য্যন্ত নিজেকে দেয় নাই, নিজের স্বাধীনতা সংহারের জন্য এমনই নির্ম্মম উৎকণ্ঠায় সে তখন ব্যগ্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

সেখ আন্দু

জাহাজে খালাসির কাজ লইয়া আড়াই বৎসর ধরিয়া সমুদ্রে জাহাজে জাহাজে ঘুরিয়া আন্দু কর্ম্মদক্ষতা গুণে এখন সারঙ্গের সহকারী পদে উন্নীত হইয়াছে। আড়াই বৎসর ধরিয়া নানাস্থান বেড়াইয়া এবার সে যাত্রী জাহাজের কর্ম্মচারী হইয়া ভারতবর্ষের দিকে আবার চলিয়াছে। কয়দিন হইল, এডেন হইতে তাহাদের জাহাজ ছাড়িয়াছে।

ফেব্রুয়ারী মাসের কুয়াসাচ্ছন্ন মলিন প্রাতঃকাল। গতকল্য রাত্রের বাসন্তী জ্যোৎস্নার শোভা বিকাশের ধাক্কায় আজিকার প্রভাত যেন অত্যন্ত জখম হইয়া বিমর্ষ রহিয়াছে। বৃষ্টির মত ফিন্‌কি দিয়া কুয়াসা ঝরিতেছে। জাহাজের চারিদিকের কাছি লোহা দড়ি দাণ্ডা পাল বহিয়া টপ্‌টপ্‌ করিয়া জল জমিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। উৎফুল্ল হাস্যশোভান্বিত তরুণ বসন্তের মনোরম বুকের উপর যেন আকস্মিক আবেগ ব্যাকুলা বর্ষাসুন্দরী হঠাৎ ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে গভীর স্নেহের শীতল আলিঙ্গনে অভিষিক্ত করিতেছে।

জাহাজ সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ ঢেউরাশি ছিঁড়িয়া অপ্রতিহত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। জাহাজের লোকজন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। চারিদিকেই কাজের ভিড় ও আনন্দের আয়োজন! যাত্রিগণ নিশ্চিন্ত আরামে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। উপরে ধূসর আকাশ; নিম্নে ফেনপুঞ্জ উদ্গারী, শব্দমুখর, উত্তালসমুদ্র; চারিদিক কুয়াসায় আবৃত, জাহাজ কলরব-মুখর।

শীতের মোটা পোষাকে আবৃত হইয়া, টুপীটা কপালের নীচে পর্য্যন্ত নামাইয়া, আন্দু ডেকের উপর দাঁড়াইয়া রেলিংএ কুনুইয়ের ভর রাখিয়া, স্থিরনয়নে নিঃশব্দে সমুদ্রপানে তাকাইয়াছিল। তাহার আকৃতির মধ্যে এখন অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই সুন্দর সুপুষ্ট বলিষ্ঠদেহ, এখন শীর্ণ

বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, মুখমণ্ডলের সেই কনকোজ্জ্বল কান্তি, সেই স্বাস্থ্য-প্রফুল্ল উজ্জ্বলতা, এখন ম্লান-পাণ্ডুর। দৃষ্টিতে, পূর্ব্বের সেই অকুণ্ঠিত আনন্দভরা উৎসাহ সজীবতা আর নাই, কিন্তু সেই কারুণ্যস্নাত পুণ্য দীপ্তি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে উজ্জ্বল রহিয়াছে। প্রশস্ত ললাটের সেই তীব্র-চিন্তা-আকুঞ্চন রেখায় আজ আর সে রুক্ষ কঠিনতার চিহ্ন নাই, আছে শুধু একটা অলস অবসাদখিন্ন সহিষ্ণুতার ম্লান মাধুরী। সুকোমল অধরে এখনও সেই স্বভাবসিদ্ধ, বিনয়নম্র হাস্যরেখা বিকশিত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা বড় নিস্তেজ,—বড় নিরুৎসাহ ক্লান্তি-পীড়িত। চৌধুরী সাহেবের বাটীতে প্রথম দেখা, সেই আন্দুকে,—আজ আন্দু বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই, আছে শুধু তাহার সেই বিশাল আয়ত চক্ষের শান্ত-স্নিগ্ধ-মমতাপূর্ণ ধৈর্য্য-গম্ভীর দৃষ্টিটুকু।

আন্দু যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেদিকে লোকজন বড় একটা কেহ ছিল না। আন্দু নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছিল, সে এতদিনের পর, আবার চলিয়াছে,—ভারতবর্ষের দিকে।

কুয়াসার ধূম্র সজল অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন আবরণ ভেদ করিয়া দীর্ঘ-দ্রুত-পাদক্ষেপে ব্যস্তভাবে অদূরে জাহাজের একজন কর্ম্মচারী চলিয়া যাইতেছিল, আন্দুকে দেখিয়া ত্রস্তে তাহার নিকটস্থ হইয়া উৎসাহ-সূচক কণ্ঠে সুপ্রভাত অভিনন্দন করিয়া বলিল, "তুমি এখানে! খুসি হলুম, আমি ভেবেছিলুম কুয়াসার জন্যে তুমি ক্যাবিনে পড়ে আছ, যাক, তোমার খবর বল, স্বাস্থ্য-পরীক্ষক আজ তোমায় পরীক্ষা করেছেন?"

প্রশ্নকর্ত্তা ইউরেশিয়ান যুবক। সম্মানেও আন্দু অপেক্ষা সে উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি। আন্দু যেখানে গিয়া দাঁড়াইত, সেখানে তাহার হৃদয়ের

সঙ্গী বড় কেহ না জুটিলেও, আন্তরিক স্নেহ ঔদার্য্য গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহার আদরের বন্ধু অনেক জুটিত। এই বিদেশী যুবাও তাহার সেই শ্রেণীর বন্ধু।

কিছুদিন হইতে আব্দুর হৃদ্‌দৌর্ব্বল্য রোগের সূত্রপাত হইয়াছিল, অসতর্কতা ফলে ক্রমশঃ তাহা দুশ্চিকিৎস্য হৃদ্‌রোগে পরিণত হইয়াছে। এডেন হইতে জাহাজ ছাড়িবার দিন অত্যধিক শ্রম ক্লান্তির জন্যই হউক, অথবা মানসিক কোন বিপ্লব উত্তেজনা প্রভাবেই হউক, 'হুইল' ঘরে কাজ করিতে করিতে আব্দু হঠাৎ শ্বাস যন্ত্রণায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। চিকিৎসকের পরীক্ষায় তাহার শ্বাসযন্ত্রের শোচনীয় অবস্থা জানিতে পারা যায়, সেই অবধি একয়দিন সে কাজে সম্পূর্ণ বিশ্রামের অনুমতি পাইয়াছে। আজ দুইদিন সে অপেক্ষাকৃত ভাল আছে, কিন্তু আভ্যন্তরিক অবস্থার বিশেষ কিছু উপকার হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয় না। আজ স্বাস্থ্য-পরীক্ষার পর, পরীক্ষকের মতানুসারে কর্ত্তৃপক্ষ হয় তাঁহাকে পূর্ব্বকর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন, নয় জাহাজের কর্ম্ম হইতে বিদায় দিবেন, এইরূপ প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইয়া আছে।

যুবকের প্রশ্নের উত্তরে আব্দু সসৌজন্যে বলিল, "স্বাস্থ্য-পরীক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসেছি, তাঁর মতামত শীঘ্রই উপর ওয়ালার মারফৎ জান্‌তে পার্‌ব, কিন্তু খুব সম্ভব সে সংবাদ সুবিধাজনক নয়, এবার জাহাজের কাজে ইস্তফা দিতে হবে।"

আব্দুর প্রশান্ত উদাস হাস্যসুন্দর মুখপানে চাহিয়া স্নেহশীল বন্ধু ব্যথিত হইল। সহানুভূতি-করুণ-কণ্ঠে বলিল, "আহা এমন কাঁচা বয়স, এমন তাজা শরীর, এমন উন্নত সুন্দর প্রাণ,—দুনিয়ার কত উপকারে লাগ্‌ত।"...

আন্দু নিঃশব্দে হাসিল। যুবক ক্ষুব্ধভাবে বলিল, "হৃদ্‌রোগ, শ্বাসযন্ত্র বিকৃতি, মানেই জীবনটা বরবাদ্‌ হওয়া!…হায়, তোমার কেন এমন হ'ল!"

যুবকের কথা অসমাপ্ত রহিল, দূর হইতে তাহার ডাক আসিল। সংক্ষেপে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া আন্দুর মঙ্গল কামনা করিয়া, বিষণ্ণ মুখে সে নিজকার্য্যে চলিয়া গেল।

আন্দু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যুবকের প্রশ্ন ক্রমাগত তাহার কর্ণরন্ধ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ধ্বনিত হইতে লাগিল, "কেন এমন হইল!"

কেন হইল, সে কৈফিয়ৎ দুনিয়ার মালিক জানেন। দুনিয়ার মানুষ সসীম জ্ঞান বুদ্ধির সাহায্যে দুনিয়াদারি দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করিতে গিয়া ভ্রমবশতঃ কত বিকৃতার্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া বসে, কে তাহার হিসাব রাখে?

নিষ্ফল আক্ষেপ, উৎসন্ন যাউক, ঘটনাস্রোতে পরাহত, ভাগ্যগতিকে ধিক্কার অভিশাপ দিয়া আজ আর পণ্ডশ্রম করিবার সময় নাই!…মূঢ় বেদনাক্রান্ত এই যে কুয়াসার ঘন আবরণ, জগতের সমস্ত দৃশ্য ঢাকিয়া, সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রফুল্লতার চিহ্ন মুছিয়া,—নিদারুণ অবসাদগ্রস্ত নির্লিপ্ততার সৃষ্টি করিয়াছে, ইহার গুরুভারে প্রাণ যে আড়ষ্ট হইয়া আসিয়াছে। আর সহ্য হয় না!—একটানে আকাশের বুক হইতে সমূলে ছিঁড়িয়া, প্রকৃতির এই রাক্ষসী মায়া যবনিকা খানা পৃথিবীর উপর হইতে নিঃশেষে গুটাইয়া লইয়া—যদি একেবারে রসাতলে প্রেরণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে —আঃ!

সমুদ্রবক্ষে নির্ম্মম বিদারণ রেখা টানিয়া দুই পাশে জল ছিটাইয়া, সগর্ব্বে জাহাজ স্থিরলক্ষ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, জাহাজের গমন-বেগ-বিদলিত, চূর্ণ

ঢেউরাশির পানে আন্দু একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সমস্ত বুক কাঁপাইয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল।

দেখিতে দেখিতে কুয়াসা কাটিয়া, উজ্জ্বল রৌদ্র কিরণে চারিদিক হাসিয়া উঠিল। আন্দু মাথা হইতে টুপীটা খুলিয়া জলকণাগুলা ঝাড়িয়া লইয়া সেটা আবার মাথায় ভাল করিয়া বসাইতেছে,—এমন সময়ে দূরে ভারতের তটরেখা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া যাত্রীরা আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। আন্দু সেই দূরবর্ত্তী ক্ষীণ দৃশ্য নীল তটরেখার দিকে নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রহিল, অনেক কথা মনে পড়িল, আন্দু তন্ময় হইয়া ভাবিতে লাগিল।

জীবন-সমুদ্রে মোহের উত্তাল তরঙ্গ ক্রমাগতই উচ্ছ্বসিত হইতেছে, তাহার বিরাম নাই, নিবৃত্তি নাই, কিন্তু বিবেকের দৃঢ়তটে প্রতিহত হইয়া তাহা বারংবার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে,—কেবল তাহার ভাগ্য বিপর্য্যয়ে শুধু একটু দুর্ব্বলতার জন্য, মুহূর্ত্তের ভ্রমে মুগ্ধ—অসতর্ক হওয়ায়, একটা উদ্দাম তরঙ্গ চকিতে আসিয়া কূল প্লাবিত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তুফান আসিয়াছিল, তুফান চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু যে পঙ্কের বোঝা বুকের উপর চাপাইয়া দিয়া গিয়াছে, তাহা কতদিনে সংস্কৃত হইবে?—হয়, আকাশের প্রখর সূর্য্যের তাপে ইহাকে দিনে দিনে তিলে তিলে শুকাইয়া ধূলার মত উড়াইতে হইবে,—নয় আকাশের প্রবল বৃষ্টিধারায় ইহাকে নিঃশেষে ধৌত করিয়া পরিচ্ছন্ন হইতে হইবে,—এখন যাহাই করা যাক,—আকাশ ভিন্ন গতি নাই।

আন্দু দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। পরমেশ্বর, এ ভ্রমের প্রায়শ্চিত্ত কতদিনে হইবে? সে কি সারাজীবন-ব্যাপী!

একটা উদ্দাম হিল্লোলে স্নায়ুতন্ত্রীগুলা ঝন্ ঝন্ করিতে লাগিল, মস্তিষ্কে

তুমুল বিপ্লব বাধিয়া উঠিল। আন্দু মাথায় হাত দিয়া রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল।

ওঃ! সে আর পারে না। ভগবান্, সে আর পারে না,—এত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সহিত যুঝিবার সামর্থ্য তাহার আর নাই,—সে লক্ষ্মীছাড়া নিজের দায়ে সর্ব্বস্ব বিকাইয়াছে সংসারে অনেককে সুখী করিতে গিয়া অনেকের মর্ম্মান্তিক অসুখের কারণ হইয়াছে, সে যে জগতের কোনখানে কতখানি অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিয়াছে, আপনার অগোচরে সে যে কি উদ্ভ্রান্তমত্ততা জীবনসূত্রে গাঁথিয়া, সারা জীবনটা বিষাক্ত বাষ্পাচ্ছন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহার খবর ত কেহ জানে না। না জানুক, সে তাহার ভ্রমের কাহিনী লইয়া জগতের কৌতুকের মজলিশে বিদ্রূপের উপকরণ যোগাইতে চাহে না। কিন্তু আর যে সে পারে না! এ মৌন উদ্দাম-দীপক ঝঙ্কৃত ক্ষুদ্র জীবনের সহিত, জগতের এই বিচিত্র আনন্দ-কলরব-মুখর শত আশা উদ্বেলিত অনন্ত জীবনের আর কিছুতেই খাপ খাইতেছে না, সে আর ইহাদের সহিত পোযাইয়া চলিতে পারিবে না, জীবন্তের সহিত জগতের সম্পর্ক, সে যে প্রাণহীন! অন্তরাত্মা নিষ্পীড়িত করিয়া—আত্মবিস্মৃতির হাসি টানিয়া আনিয়া, জগতের সহিত বাহ্য-লৌকিকতা আজও প্রাণপণে বাঁচাইয়া চলিতেছে, কিন্তু মনে আছে, মনে আছে,—সব মনে আছে! প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ-আতিশয্যে আত্মহারা হইয়া একদিন স্বহস্ত রচিত মারণ-যজ্ঞের অগ্নিশিখায় স্বেচ্ছায় আপনাকে আহুতি দিয়াছে। সে রুদ্ধদ্বার যজ্ঞাগারের নিভৃত নির্জ্জন অঙ্কে, বহির্জগতের কোলাহল ত দূরের কথা, বহিঃপ্রকৃতির তীব্র শৈত্য জড়তাময়ী বায়ু প্রবেশেরও পথ ছিল না। ছিল শুধু স্তব্ধ তন্ময় গভীরতা, ছিল কেবল হোমাগ্নির দৃপ্ত উজ্জ্বল

শিখা, আর তাহারই অভিমুখে, অপ্রতিহত স্রোতে প্রবাহিত হতভাগ্য প্রাণের—প্রাণঘাতী উচ্ছ্বাস উন্মাদনা !···যাক, সে দুঃস্বপ্ন স্মৃতি,—জীবন বর্‌বাদ্ হইয়াছে হউক, কিন্তু এই বর্‌বাদের চরম কৃতার্থতাটুকু যেন ব্যর্থ না হয়—ইহাই প্রার্থনা ! সে পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র হইয়া, নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিতেছে, নির্ম্মম শাস্তিপীড়নে আপনাকে প্রতি নিঃশ্বাসে পিষিয়া ফেলিয়াছে, আর শক্তি নাই ! এখন ওগো পৃথিবীর ভূত ভবিষ্যতের চির বর্ত্তমান, হে অনন্তদেব, হে দীন দুর্ব্বলের অবশিষ্ট আশ্রয়,—আর সে পারে না, তাহার শক্তি সামর্থ্য ফুরাইয়াছে এবার এই ক্ষীণ মুমূর্ষু অন্তরে তুমি অন্তিমের মত অধিষ্ঠান হও, সে অনেক ভাবিয়াছে, আর ভাবিবার কিছু নাই, এখন ভরসা শুধু তুমি, আর কেহ নাই ! সে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হইয়া বিশাল বিশ্বের বুকে একাকী দাঁড়াইয়াছে, তাহার অগ্র পশ্চাৎ বেড়িয়া অনেক বিভীষিকা অনেক ক্রুটি, তাহাকে কঠোরভাবে এখনও নিষ্পেষিত করিবার জন্য রুষিয়া রহিয়াছে, কিন্তু তাহার জর্জ্জর জীবনে আর যে কিছুই সহিবার ক্ষমতা নাই। তাহার জীবনের সমস্ত সঙ্গীত, সমস্ত ছন্দ, সমস্ত মন্ত্র, সমস্ত সম্বল—অজ্ঞাত অন্ধকারে বিসর্জ্জন দিয়া, সে পরিপূর্ণ দৈন্যে আজ নিরাশ্রয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ;—আজিকার ভরসা, ওগো জীবন মরণের দেবতা, তুমি —শুধু তুমি !

নিঃশব্দ বিগলিত অশ্রুস্রোতে জামার আস্তিন ভিজিয়া গেল। আন্দু একটু শান্তি অনুভব করিল। অনেকক্ষণ সেই অবস্থায় স্থির হইয়া রহিল।

কে **একজন** আসিয়া ধীরে ধীরে তাহার কাঁধে হাত চাপড়াইলেন। আত্মসংবরণ করিয়া আন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল, দেখিল সারং সাহেব। যথারীতি শিষ্টাচার বিনিময়ের পর তিনি বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, "স্বাস্থ্য-

পরীক্ষকের শেষ সিদ্ধান্ত জেনে এলুম, তোমায় অবকাশ দেওয়া হ'ল। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ।"

অবিচলিত মুখে আন্দু বলিল, "উত্তম, আমি এই বন্দরেই আপনাদের নিকট হতে বিদায় নেব।"

তিনি সে কথায় মনোযোগ দিলেন না। বলিলেন, "স্বাস্থ্য-পরীক্ষক আশঙ্কা করেন, তোমার এই হৃদ্‌রোগ থেকে অন্য সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি আক্রমণের সম্ভাবনা আছে!"

সাঙ্ঘাতিক ব্যাধি?—আন্দু নীরবে মনে মনে হাসিল! গোপন-হৃদয়ের সাঙ্ঘাতিক ব্যাধিকে সাঙ্ঘাতিক নির্দ্দয় ভাবে হত্যা করিতে গিয়া, আর্ত্ত হৃদ্‌পিণ্ডকে এমন জোরে মুচ্‌ড়াইয়া দুষ্ট শোণিত নিষ্কর্ষণ করিয়াছে যে,—দেহের সুস্থ সুদৃঢ় শ্বাস যন্ত্রটা শুদ্ধ চির-অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল! জগতের অপকারের ভয় বাঁচাইতে গিয়া উপকারের শক্তিটাও সত্য সত্য হারাইয়া বসিল!......যাক্‌ পরিতাপের মধ্যেও পরিতোষ আছে,—ভগবান, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক!

জামার পকেটে হাত পূরিয়া শান্ত প্রসন্ন বদনে আন্দু চতুর্দ্দিকের রৌদ্রোদ্ভাসিত দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল; সারং সাহেবের কথার কোন উত্তর দিল না। সারং সাহেব নৈরাশ্য-করুণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাহার মুখ-পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর চিকিৎসা শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী উপদেশ মতে,—এ অবস্থায় কিরূপ শান্তভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা তাহার পক্ষে শ্রেয়স্কর, সে সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। মানসিক অবসাদ ও উত্তেজনার কারণ হইতে দূরে থাকিয়া, স্বচ্ছন্দ প্রফুল্ল চিত্তে, জনবিরল পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করা, বা সমুদ্র ভ্রমণে বাহির হওয়া যে তাহার পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য, সে কথা বার বার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, এ বিষয়ে

তাহার দ্বারা যদি কোন সাহায্য সম্ভাবনা থাকে, তবে তিনি তাহা সানন্দে করিতে প্রস্তুত আছেন। আন্দু কৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাইয়া উত্তর দিল, পরে ভাবিয়া ইহার উত্তর দিবে। সারং সাহেব প্রস্থান করিলেন।

আন্দু নীরবে স্থির নয়নে ক্রমশঃ স্পষ্ট দৃশ্যমান তটভূমির দিকে চাহিয়া রহিল। এত দিনের পর আজ সুদীর্ঘ প্রবাসবাসের অবসান!—এত দিনের পর আজ সে আবার স্বদেশের কোলে, স্বাধীন হইয়া ফিরিয়া আসিল, কি আনন্দ!

—যাক্, যাহা মরিবার, তাহা মরিয়া গিয়াছে, সে মৃত্যুশোকের সুদীর্ঘ অশৌচ ব্রত বহনের পর এতদিনে আদ্য শ্রাদ্ধের উৎসব-কোলাহলে জগৎ মুখর হইয়া উঠিয়াছে, এবার এই শ্রাদ্ধ বাসরে, অন্তর্নিহিত শোকের শেষ শ্রদ্ধা তর্পণ সমাপ্ত করিয়া, আত্ম শুদ্ধির মন্ত্রোচ্চারণে শান্তি-লাভের শুভ লগ্ন আজ সত্যই ফিরিল কি? হে মহিমাময়, তোমার বিধানের জয় হউক,—ইহাই শ্রেয়ঃ! এই চরম আশীর্ব্বাদই আজ একান্ত কল্যাণে সুন্দর ও সার্থক হউক!

গভীর আবেগে আন্দুর সমস্ত বক্ষঃ উদ্বেলিত করিয়া একটা অপরিসীম সান্ত্বনার সূক্ষ্ম স্পর্শ পবন বহিয়া গেল! সৃষ্টি সূচনার জন্য প্রলয়ের প্রয়োজন, জীবনের জন্য মরণের উদ্বোধন,—ওগো মৃত্যু, ওগো সুহৃদ্, —আজ গভীরতম হর্ষ কিরণ স্পর্শে, পরম আশ্বাসে, চরম বিশ্বাসে স্বচ্ছন্দ সজীবতার মধ্যে হৃদয় মন জাগিয়া উঠিয়াছে। পার্থিব অমঙ্গল বিভীষিকার অন্তরালে তোমার যে অপার্থিব মঙ্গলরূপ প্রচ্ছন্ন ছিল, আজ তাহা সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইল! কৃতজ্ঞ-আনন্দে আজ তোমার চরণে লক্ষ প্রণাম। আন্দুর বেদনাহত চিত্ত পূর্ণ করিয়া গভীর তৃপ্তিময় শান্তিবারি বর্ষিত হইল।

নিজের ক্যাবিনে আসিয়া আব্দু অনেক দিনের পর অত্যন্ত শান্তির সহিত পরিপূর্ণ স্থিরতায় নমাজ করিল। তারপর কোরাণ খানি খুলিয়া বসিল। একপৃষ্ঠা পড়া হইতে না হইতে তাহার চিত্তে তীব্র ভাবান্তর উপস্থিত হইল। এই পুস্তকের বোঝা সে এতদিন বুকে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু ইহার মধ্যে যে অমৃত-সিন্ধু বিদ্যমান রহিয়াছে,—তাহার স্পর্শ সুখ লাভে অমরত্ব প্রাপ্তির পথ হইতে সে কতদূরে চলিয়া গিয়াছে! এই পুরাতন পরিচিত—আবাল্যের অভ্যস্ত কোরাণ সরিফ, আজ তাহাকে নূতন করিয়া সেই চিরপুরাতন পূজনীয় সত্যবাণী সজীব ভাষায় বলিতেছে। আব্দু অবাক্ হইয়া গেল, এতদিন সে কি করিয়া এ সব ভুলিয়া মস্তিষ্কের মধ্যে অলীক চিন্তার সহস্র জঞ্জাল পূরিয়া, কোন্ মোহে বসিয়াছিল? আশ্চর্য্য বটে!

জাহাজ বন্দরে লাগিতেই চারিদিকে খুব হৈ চৈ গোলমাল পড়িয়া গেল। ডেকের উপর হইতে সমুদ্র উপকূলের পানে চাহিয়া বিপুল উল্লাসে আব্দুর বুক ভরিয়া গেল।—কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে টাকার ব্যাগটি ও কোরাণখানি হাতে লইয়া জাহাজের সিঁড়ি বহিয়া বোটে আসিয়া আশ্রয় লইল!

জেটী হইতে বাহিরে আসিয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে আব্দু সমুদ্রের ধারে এক বাগানের নিকট সন্ধ্যার প্রাক্কালে আসিয়া উপস্থিত হইল; অদূরে এক বৃক্ষতলে তিনজন বৃদ্ধ ফকির মক্কার দিকে মুখ ফিরাইয়া নমাজ করিতেছিলেন। নাবিকের পরিচ্ছদ পরিহিত আব্দু তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া উপাসনায় যোগ দিল।

নমাজ শেষ হইলে বয়োজ্যেষ্ঠ ক্ষীণ দৃষ্টি শীর্ণাকৃতি ফকির স্নেহময় স্বরে তাহাকে ডাকিয়া তাহার পরিচয় লইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আব্দু

ফকিরদের পরিচয় লইয়া জানিল, তাঁহারা মক্কা যাইবার উদ্দেশ্যে আজ তিন মাস বম্বে বন্দরে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন, ভিক্ষা দ্বারা হজ-যাত্রার খরচা সংগ্রহের বিস্তর চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কোন হৃদয়বান্ ধনীর অনুগ্রহলাভ করিতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা সমর্থ হন নাই। কেবলমাত্র মুষ্টিভিক্ষায় উদরান্নের সংস্থান করিতেছেন মাত্র। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহাদের সহিত অনেক কথা কহিয়া আন্দু উঠিয়া অদূরে নির্জ্জন সরোবরের সোপানে গিয়া বসিল!

নিজে কি করিবে, কোথায় যাইবে,—কিছু ভাবিবার অবকাশ হইল না। সে ভাবিতে লাগিল ঐ দরিদ্র অনাথ নিরন্নদের তীর্থ যাত্রার কথা। সে কি ইহাদের জন্য কিছু করিতে পারে না?

বিপ্লবের ধাক্কা খাইয়া সমস্ত জীবনটাই সে কেবল পিছু হটিয়া চলিয়াছে, সন্ধির দ্বারা শান্তিলাভ করিয়া কোন মতেই সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। আজ—এখনও কি পারিবে না? আর ত সব শেষ হইয়া আসিয়াছে, শ্রবণের পথে মরণের ভেরী গভীর নিঃস্বনে বাজিয়াছে, এখন এই ধ্বংসোন্মুখ শরীরের শেষ রক্তকণিকাগুলি বিক্রয় করিয়া কি ইহাদের তীর্থের পাথেয়—জীবনের সম্বল সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে না?

আন্দু সঞ্চিত মুদ্রাগুলি মিলাইয়া হিসাব করিয়া দেখিল, তাহাতে উহাদের পাথেয় হইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধ ফকিরটির একটি বলিষ্ঠ অবলম্বনের যে নিতান্ত প্রয়োজন।

আন্দু ভাবিতেছে, এমন সময় এক বৃদ্ধ গাড়ু ও গামছা লইয়া ঘাটে আসিয়া হাত মুখ প্রক্ষালন করিয়া, গাড়ু জলপূর্ণ করিয়া সোপানে উঠিতে উঠিতে মৃদুস্বরে নিরঞ্জনাষ্টক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কণ্ঠস্বরে চমকিয়া

চিন্তামগ্ন আন্দু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে বৃদ্ধের পানে চাহিল, তাহার পরই অকস্মাৎ তীরবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, আনন্দ উচ্ছল কণ্ঠে ডাকিল, "দাদাজী—"

বৃদ্ধ নির্ণিমেষ নয়নে সেই বিদেশী-বেশ-পরিহিত লোকটির পানে চাহিয়া রহিলেন। আন্দু টুপী ফেলিয়া তাঁহার পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি আন্দু!"

দাদাজীর হস্তস্খলিত গাড়ুর জল সব সোপানের উপর পড়িয়া গেল, অশ্রুসিক্ত নয়নে আন্দুকে বুকে তুলিয়া গভীর আলিঙ্গন করিয়া রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "এত দিনের পর?"

অনেক পরে উভয়ে শান্ত হইয়া ব্যগ্রপ্রশ্নে সংক্ষেপে পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা শেষ করিলেন। আন্দু বলিল, "রতু বাবুদের খবর কি?"

দাদাজী বলিলেন, "রতু যে এইখানেই রয়েছে। তার এণ্ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, আমাদের নিয়ে তাই কাল এখানে এসেছে, আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে এলাম, এবার দ্বারকায় যাব। রতুর মাসী, দিদি, সবাই সঙ্গে এসেছে, কাছেই একটা বাসায় ওঠা গেছে, তুমি দেখা করবে চল।"

আন্দু অম্লান বদনে বলিল, "চলুন।"

পথে চলিতে চলিতে আন্দু বালকের মত অসঙ্কোচ উৎসাহে এমন মুক্ত সরলতায় নানা অবান্তর কথার উচ্ছ্বাস বহাইল, যে মমতা-বিগলিত-হৃদয় বৃদ্ধ দাদাজীরও উল্লাসের সীমা রহিল না। সেকেন্দ্রাবাদের প্রত্যেক পরিচিত বন্ধু বান্ধবের সম্বন্ধে উপর্য্যুপরি আগ্রহান্বিত প্রশ্ন বর্ষণ করিয়া সে দাদাজীকে আচ্ছন্ন-প্রায় করিয়া ফেলিল। একটু হাঁপ ছাড়িবার

সময় পাইয়া দাদাজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দিন কোথা ছিলে, আন্দু ?"

আন্দু সংক্ষেপে জাহাজে চাকরীর কথা বলিল। কথাটা লইয়া দাদাজীকে কোনও মন্তব্য প্রকাশের অবসর মাত্র না দিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "আপনারা দ্বারকা যাবেন ? আমারও যে বেড়াতে যেতে ইচ্ছা হচ্ছে, দাদাজী !"

দাদাজী উৎসাহের স্বরে বলিলেন, "চলনা, দাদা।"

উভয়ে আসিয়া অদূরে বাটীর মধ্যে ঢুকিলেন। উঠানে আসিয়া দাদাজী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আলো-টা একবার দেখাও মা, আমরা রকের সিঁড়ি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে !"

লণ্ঠন হস্তে শুভ্র-বসনা নিরাভরণা জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিল—আলো তুলিয়া চাহিতেই সহসা সে স্তম্ভিত হইয়া গেল ! আন্দু কাছে আসিয়া অভিবাদন করিয়া অত্যন্ত সহজ-নিঃশঙ্ক ভাবে বলিল, "ভাল আছেন ?—চিন্‌তে পারেন ?"

জ্যোৎস্নার হাত হইতে আলোটা হঠাৎ পড়িয়া গেল। পতন-সংঘাতে লণ্ঠনের বাতিটা দপ্ দপ্ করিয়া উচ্চ শিখায় জ্বলিয়া উঠিল ! আন্দু ত্রস্তে আলো তুলিয়া, ক্ষিপ্র কৌশলে কল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, বাতিটা পুনশ্চ স্থির-উজ্জ্বল করিবার চেষ্টায় নতশিরে মনোযোগী হইল। বাতি শীঘ্রই ঠিক হইয়া গেল।

রতু ঘর হইতে ছুটিয়া আসিয়া আন্দুকে সজোরে জড়াইয়া ধরিল। আন্দুর সাড়া পাইয়া, মাসীমাও বাহিরে আসিলেন, আন্দু দূর হইতে হাসি-মুখে প্রণাম করিয়া স্বভাবসিদ্ধ নম্র সৌজন্যে স্বাগত প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিল। তাহার পর সেইখানে বসিয়া পড়িয়া, রতুর প্রশ্নের উত্তরে

পরম উৎসাহে আপনার নাবিক জীবনের কাহিনী অনর্গল বকিতে সুরু করিল। রতু পাশে বসিয়া বিস্ময়-আনন্দ-অভিভূত চিত্তে শুনিতে লাগিল।

নতবদনা জ্যোৎস্না পাংশু মূর্ত্তি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।……এ কি ভয়াবহ অপ্রত্যাশিত বিড়ম্বনা! নিগূঢ়-আতঙ্ক-সংঘাতে তাহার নিশ্চিন্ত শীতল মস্তিষ্কের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অকস্মাৎ যেন লেলিহান জিহ্বা বাহির করিয়া প্রলয়াগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল! সর্ব্ব-শরীরের শিরা উপশিরাবাহী শোণিত স্রোতে যেন উগ্র-বৈদ্যুতিক উন্মাদনা নাচিয়া ছুটিতে লাগিল। আপনার নিভৃত অন্তর মধ্যে একটা অবর্ণনীয় বিপ্লবের, রৌদ্র তাণ্ডবময় তপ্তসংঘর্ষণ অনুভব করিয়া সে কেমন ভীত-বিহ্বল হইয়া পড়িল!

অনেকক্ষণ পরে অতর্কিতে জ্যোৎস্নার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই, চমকিয়া, উৎকণ্ঠা-ব্যাকুল চিত্তে,—উৎসাহিত কণ্ঠস্বর সংযত করিয়া, আন্দু হঠাৎ বিদায় চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—তাহাকে এখনই যাইতে হইবে!

দাদাজী ব্যস্ত হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "কোথা যাবে? পাগল! আজ রাত্রে এইখানেই থাক!"

প্রবল আপত্তি জানাইয়া রতুও ব্যগ্র অনুনয়ে তাহাকে চাপিয়া ধরিল, —এও কি সম্ভব? কতদিনের পর এই সুদুর্লভ সুহৃদ্-সম্মিলন! আজ এখনই বিদায়ের কথা কি? বিশেষতঃ আন্দুর যখন তেমন কোন প্রয়োজনীয় কাজ,—আজ নাই, অতএব……।

দ্বিধা-পীড়িত আন্দু উদ্বেগ-কাতর দৃষ্টিতে দাদাজীর মুখ পানে তাকাইল। পুনশ্চ মিনতি-কোমল অনুরোধের সহিত দাদাজী স্নেহার্দ্র

কণ্ঠে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "দাদা, হ'লে কি? তুমি না আমাদের সেই আন্দু!"

সংশয় ঠেলিয়া—মুক্ত উচ্ছ্বাসে তরল-কৌতুকের হাসি হাসিয়া আন্দু বলিল, "হাঁ, দাদাজী ভুলে যাচ্ছিলাম, আমি সেই আন্দুই বটে,—আপত্তি কর্‌বার কিছু নাই, তবে আপাততঃ বাইরে একটু বেড়িয়ে আসি, শীগ্রী ফির্‌ব—"

আন্দু বাহির হইয়া গেল।

৩৩

আন্দু হাসিমুখে সকলের নিকট হইতে উঠিয়া আসিলেও, নির্জ্জন পথে দাঁড়াইয়া, এতক্ষণকার সযত্ন-রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাসকে আর ঠেকাইতে পারিল না, সে তীব্রবেগে মর্ম্মভেদ করিয়া ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইল!—নিজের জন্য ভয় নাই, সে সব ভাবনা চুকিয়াছে, তবু বিশ্বস্ত-সুপ্ত হৃদয়ের মাঝে যে বেদনা-শঙ্কিত ক্ষীণ ছায়াটা ঘোমটা মুড়ি দিয়া অলক্ষিত ভাবে দূরে দূরে নিঃশব্দ পদ সঞ্চারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা যে অকস্মাৎ আবরণ-মুক্ত হইয়া সম্মুখে নিষ্ঠুর কঠিন মূর্ত্তিতে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া আবার অন্য দিক দিয়া মুখর বিদ্রোহের ঝঙ্কার জাগাইয়া তুলিতে চায়! নিজের হৃদয়ের দুঃখ দ্বন্দ্ব জয় করিয়া লইয়াছে, কিন্তু অন্য হৃদয়ের যে অজ্ঞাত-প্রদেশে নিগূঢ় বেদনাবহ মনস্তাপের স্রোত নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে, তাহার সংশয়াভাসটুকু স্বার্থপর হাসিতে অবজ্ঞা করিয়া চলা,—নাঃ, সে অসহ্য দুঃখ!

মাথার টুপী খুলিয়া ঘর্ম্মাক্ত কেশ-রাশির উপর হাত বুলাইতে বুলাইতে নতশিরে তন্ময়-চিন্তা-বিভোর আব্দু যথেচ্ছ ভাবে পথে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে সহসা এক সময় চমকিয়া মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, সম্মুখের স্বল্পান্ধকার-সমাচ্ছন্ন পথ স্বচ্ছ জ্যোৎস্নালোকে ভরাইয়া, আকাশে স্নিগ্ধ সুন্দর মূর্ত্তিতে কৃষ্ণা-চতুর্থীর চন্দ্রদেব হাসিমুখে উদয় হইয়াছেন! সমস্ত জগতের বুকে শান্ত আনন্দের ঢেউ বহিয়া যাইতেছে!

মুগ্ধ-বিস্ময়ে আব্দুর সারা বুক খানা এক নিমেষে হাল্কা হইয়া মুক্ত উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। আব্দু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া, নিষ্পলক নয়নে উর্দ্ধে, উদীয়মান চন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল!—জীবনে বহু—বহুবার, চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত শোভা মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়াছে, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য ভাবে সর্ব্ব-সংশয়ভেদী মহাসত্যের মূর্ত্তিতে ইহা আর কখনও দেখে নাই! বিহ্বল প্রাণে আব্দু যুক্ত-করে শিরস্পর্শ করিল!

দ্বন্দ্ব-উৎক্ষিপ্ত অসন্তোষের ঘূর্ণী আবর্ত্তন-সংরুদ্ধ প্রাণগতি অকস্মাৎ প্রচণ্ড-বেগে মুক্ত হইয়া, শান্তিময়-সন্তোষ প্রবাহ-পরিবর্ত্তনে, স্বচ্ছল আনন্দে কলতানে জগৎ প্লাবিত করিয়া জগদতীতের চরণোদ্দেশে ছুটিল! স্তব্ধ নির্জ্জন পথের উপর জানু পাতিয়া, আব্দু ভূমে মাথা লুকাইল।—বিশ্বব্যাপী ব্যর্থ-দৈন্য, কৃতার্থ সম্পদে প্রসন্ন মহিমান্বিত হইয়া উঠিল! ওগো, দুর্ভাগা-জীবনের কলঙ্কিত ভ্রান্তি,—তুমি ধন্য, তুমিই অকলঙ্ক শান্তির আশীর্ব্বাদ-বাহী অগ্রদূত! তোমায় প্রণাম!……আজ মুক্ত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া জগৎকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছে,—ওগো তুচ্ছ বলিয়া, ক্ষুদ্র বলিয়া, ব্যর্থ বলিয়া জগতে কিছু নাই, জগতে যাহা আছে, তাহা সব সত্য, সব সার্থক! সব মিথ্যার মাঝেই সব সত্য আছে, আছে, আছে! দৃষ্টি খুলিয়া

দাও,—দেখিবে প্রত্যেক ক্ষুদ্রত্বের মধ্যে কি বিরাট মহত্ত্ব অবস্থান করিতেছে!······মানব হৃদয়ের গোপন রহস্য তলচারী—ঘৃণালাঞ্ছিত অগৌরবের বেদনা—সে যত বড়ই ধিক্কারের বস্তু হউক,—কিন্তু সেও গৌরবের রত্নপীঠের উপর মানবাত্মার সাকার-সান্ত্বনা প্রতিষ্ঠিত করিবার শক্তি রাখে! এই দুঃখ-দ্বন্দ্ব সংশয় ভ্রান্তির বিচিত্র সংঘাত ঝঞ্ঝনা পূর্ণ মানব জীবন,—ইহা মায়ার ইন্দ্রজাল নহে, মোহের লীলা নিকেতন নহে,—ইহা সহস্র শিক্ষা, লক্ষ সাধনার ধারা বহিয়া সত্য চেতনার মধ্যে আত্ম-উদ্বোধনের মহান্ সাধন ক্ষেত্র!

আব্দু উঠিয়া দাঁড়াইল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টি রাখিয়া—যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথেই ফিরিয়া চলিল,—দাদাজীর বাসার দিকে।

সমস্ত প্রাণ মাতাইয়া, বিপুল আবেগে উচ্ছল সঙ্গীত স্রোত বুকের ভিতর ঠেলিয়া উঠিতেছিল। আব্দু আপনার খবর পৃথিবীর খবর—ভুলিয়া গেল। দাদাজীর বাসার পাশে বাগানের নির্জ্জন পুকুর ঘাটে আসিয়া, বসিয়া পড়িল। জ্যোৎস্নার অমল ধবল স্রোতোচ্ছ্বাসে চিত্ত গলাইয়া, করুণা বিগলিত কণ্ঠে, কোরাণের স্থান বিশেষের বচন আবৃত্তি করিতে করিতে তদ্গত আত্মহারা হইয়া উঠিল।—সমস্ত দিন যে তাহার আহার হয় নাই, সে যে আজ কত দিকে কত ঘুরিয়া কতখানি ক্লান্ত হইয়াছে সব ভুলিয়া গেল। বাহিরের কোন অবসাদ জড়তা তাহার দেহ মনকে তখন স্পর্শ করিতে পারিতেছিল না।

সহসা পিছন হইতে একটা ছায়া, সোপান তলে পতিত হইল। আব্দু ফিরিয়া দেখিল—জ্যোৎস্না! ঘাটের রাণায় ভর রাখিয়া বোধ হইল, সে কাঁপিতেছে!

অভ্যাস বশে টুপী তুলিয়া আব্দু সন্ত্রস্ত ভাবে অন্য দিকে সরিয়া

দাঁড়াইল ! তাহার মনে পড়িল, এমনই নিশীথ সময়ে আর একদিন ভাগলপুরে চৌধুরী সাহেবের বাড়ীতে,—সেই রুক্ষ-কঠোর দীপালোক জ্বালা-তপ্ত জমাট উষ্ণতা ভরা নিস্তব্ধ কক্ষের মাঝে লতিকাকে দেখিয়াছিল,—কত দিন কত নির্জ্জনে গভীর ক্ষত যন্ত্রণার মত সে স্মৃতি তাহার মনকে ঝল্‌সাইয়া ক্লিষ্ট বেদনাতুর করিয়াছে !—বিস্মৃতির স্বপ্ন কুহেলিকা আচ্ছন্ন সে সব কথা, হঠাৎ সুতীব্র স্পষ্টতায় নূতন করিয়া মনে পড়িয়া গেল।

মুহূর্ত্তের জন্য আন্দুর মুখ অবনত হইল ! পরক্ষণে সজোর চেষ্টায় আপনাকে পুনশ্চ শান্ত সংযত করিয়া লইল। যাক্, যাহা হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে ! পরিতপ্ত বেদনার নখরাঘাত দীর্ণ অতীত জীবনের সমস্ত ভাল মন্দের হিসাব নিকাশ জীবন-দেবতার চরণে উৎসর্গ করিয়া দিয়া এখন মানুষের হৃদয় লইয়া যদি কোনরূপে কাহারও এতটুকু ভুল সংশোধন সহায়তা করিতে পারা যায়, তবে হে ভগবান্, তাহাতে শক্তি দাও,—ধৈর্য্য দাও !

আন্দু মুখ তুলিয়া জ্যোৎস্নার পানে চাহিল, স্পষ্ট অসঙ্কোচে, সম্পূর্ণ কুণ্ঠাহীন, প্রশান্ত নির্ম্মল দৃষ্টিতে জ্যোৎস্নার আকৃতি প্রস্তর কঠিন নির্জ্জীব দৃষ্টি অন্যাবলম্বী। কম্পিত স্বরে জ্যোৎস্না বলিল, "তুমি কি দ্বারকা যাবে ?"

আন্দু দ্বারকা যাওয়ার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল ! জ্যোৎস্নার কথায় সংজ্ঞা পাইয়া বলিল,—"যাব একবার মনে করেছিলাম।"

জ্যোৎস্না সবলে রাণা ধরিয়া আর্ত্তস্বরে কহিল, "না না, তুমি দ্বারকা যেও না।"

আন্দুর কঠোর দৃঢ়তা যেন মুহূর্ত্তের জন্য শিথিল হইল। মূঢ়ের মত

প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল,—"কেন ?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিল "আমায় ভয় কি ?"

কি ভয় তাহা ভাষায় বুঝাইবার নহে! পরিপূর্ণ আবেগে জ্যোৎস্নার সমস্ত ইন্দ্রিয়,—নিশ্চল—চৈতন্যশূন্য হইতে বসিয়াছে! হৃদ্‌পিণ্ড যেন পঞ্জরাস্থি ভেদ করিয়া ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে চাহিতেছে—মরণাহতের অন্তিম নিঃশ্বাসের মত তাহার কণ্ঠ চিরিয়া মৃত্যুমন্ত্র উচ্চারিত হইল—"তোমাকে ভয় নয়, তুমি মহৎ, তুমি পবিত্র! তোমার নিঃশব্দ ধৈর্য্য আর নীরব আত্মত্যাগ বড় কঠিন, বড় ভয়ানক! তাতেই মনকে মুগ্ধ করে, ভীত করে। তোমার পায়ে পড়ি,—তুমি ফিরে যাও—আমার তীর্থ ধর্ম্ম সফল হতে দাও!"—জ্যোৎস্নার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল।

আব্দু নির্ব্বাক! মানুষের কাণ লইয়া—এমন মর্ম্মঘাতী কথা যে এত স্পষ্ট করিয়া শুনিতে হইবে, তাহা কোন দিন সে কল্পনাও করে নাই।...সে প্রশান্ত গম্ভীর দৃষ্টি তুলিয়া আকাশের হাস্যোজ্জ্বল চন্দ্রের পানে চাহিয়া রহিল!—অস্পষ্ট কুয়াসা ভেদ করিয়া, কঠিন উন্নত-শীর্ষে, স্তব্ধ অটলতায় দণ্ডায়মান পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছ্বসিত গৈরিক অগ্নিস্রাবে যে নির্ম্মম সত্য আবিষ্কার হইয়া গেল, তাহাতে অভিমান কি? অনুতাপ কি?—জীবনের ভুল, ভ্রান্তি, অপরাধের নিকট নিজের যাহা কিছু দেনাপাওনা ছিল,—তাহার ত কড়াক্রান্তি হিসাব মিলাইয়া হাতে হাতে চুকাইয়া লইয়াছে!—এখন অপ্রত্যাশিত আগত—এই উপরি পাওনাটুকু—ইহা যখন আসিয়াছে, তখন অবশ্য প্রাপ্য বলিয়া ইহাকেও নতশিরে গ্রহণ করিতে হইবে,—তাহাতে ক্ষোভ কি?

আব্দু অতি শান্ত অতি মধুর মর্ম্মস্পর্শী স্বরে বলিল, "তবে এই শেষ। আমি কাল, জন্মের মত এদেশ থেকে যাব, এ জীবনে আর ভারত-

বর্ষের মাটীতে ফিরে আসব না! আপনার সমস্ত অমঙ্গলের আশঙ্কা,—ভগবানের উপর সত্যকার মঙ্গল নির্ভরে প্রতিষ্ঠিত হোক, ঈশ্বর আপনাকে শান্তি দিন্। আসি তবে। সেলাম।"

আব্দু অকম্পিত পদে অগ্রসর হইল। জ্যোৎস্না বিদীর্ণ বক্ষে ঘাটের রাণার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, যন্ত্রণারুদ্ধ স্বরে বলিল, "আমার দুর্ব্বলতা ক্ষমা কর, তোমার অতুলনীয় নিষ্ঠার গভীর মহত্ত্ব অনুভবের শক্তি আমার নাই, আমায় ক্ষমা কর!"

ক্ষমা!—স্বভাবসুন্দর হাসিমুখে আব্দু ফিরিয়া দাঁড়াইল,—স্থির কোমল কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা? না, দেবি, এর মাঝে ক্ষমা নাই! এ ত হৃদয়হীন ছেলে খেলায় পরিতাপের কুটুম্বিতা নয়! এ যে প্রাণের গোপনে—প্রাণের আদর্শ পূজার উন্মাদ সাধনা। এতে যদি অপরাধ থাকে, তবে শাস্তিও আছে। কিন্তু ক্ষমা? না, ক্ষমা নাই!"

আব্দু ধীরপদে চলিয়া গেল। অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা জ্যোৎস্নার প্রাণে কেবল বাজিতে লাগিল এতে যদি অপরাধ থাকে তবে শাস্তিও আছে, কিন্তু ক্ষমা নাই! পূজার মাঝে কামনাই পাপ, আসক্তিই অপরাধ! কিন্তু ত্যাগের ব্রতে উৎকর্ষের অর্চ্চনা, সে যে আমরণের সাধনার সামগ্রী! তাহাতে ক্ষমা নাই! ক্ষান্তি নাই! শেষ নাই!

* * * *

প্রাতঃসূর্য্যের হৈমকিরণে সমস্ত পৃথিবী সমুদ্ভাসিত। আব্দু বক্ষসম্বদ্ধ করে জাহাজের সিঁড়ির নীচে জেটিতে দাঁড়াইয়া প্রসন্ন-স্মিত দৃষ্টিতে সাম্নের দিকে চাহিয়াছিল। জাহাজ ছাড়িতে আর বেশী দেরি নাই, খালাসীরা সিঁড়ি তুলিয়া লইবার অনুমতির অপেক্ষা করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ফকির

তিনজন জাহাজের ডেকের উপর মক্কার দিকে মুখ করিয়া উচ্চৈঃস্ব' 'রেকা' পাঠ করিতেছিলেন—আন্দু এই জাহাজে তাহাদের লইয়া মক্কা যাত্রা করিবে।

সহসা কোথা হইতে রতু দ্রুতপদে আসিয়া আন্দুর বুকের ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, দুইহাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। তাহার প' দাদাজী, মাসীমা ও জ্যোৎস্না!—ইহারা দ্বারকাযাত্রী জাহাজে চ' আসিয়া আন্দুকে দেখিতে পাইয়াছেন। কাল রাত্রে ফকিরগণকে জাহাজ ঘাটে আসিয়া, আন্দু মক্কাযাত্রার সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করি' অনেক রাত্রে দাদাজীর বাসায় গিয়া সংক্ষেপে তাঁহাকে সে সংবাদ জা' অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত তখনই বিদায় লইয়া চলিয়া আসিয়াছিল। দু' দাদাজী তাহার ব্যবহারে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিলেন!

"রতু বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে বলিল, "আন্দু দাদা, আবার চল্লে সমুদ্রে?"

আন্দু সস্নেহে তাহার শির চুম্বন করিয়া বলিল, "না দাদা, এ' একেবারে কূলে গিয়ে উঠব্। মক্কায়!"

দাদাজী অশ্রুরুদ্ধ স্বরে বলিলেন এবার সত্যই তীর্থে!

আন্দু প্রণাম করিয়া বলিল, "হাঁ দাদাজী, এইবার তীর্থে!"

সংসারবিরাগী নির্লিপ্ত চিত্ত দাদাজীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু ঝরিল! আন্দুর প্রাণ এত কঠিন! সে এক কথায় আপনাকে বিলাইয়া, মানুষের অন্তঃ গলাইয়া, গভীর সৌহৃদ্য সৃষ্ট করে, আবার এক নিমেষে সুদীর্ঘ ' সঞ্চিত সমস্ত মমতা নিবিড় বন্ধন নিষ্ঠুর ভাবে ছিঁড়িয়া, খামখেয়ালি আন' হাসি মুখে উধাও হইয়া যায়! আশ্চর্য্য তাহার চরিত্র!

জ্যোৎস্নার বক্ষের মধ্যে রুদ্ধ আবেগে সপ্ত সমুদ্র উছলিতেছিল মৃত্যু-পাংশু মুখে, করুণ দৃষ্টি তুলিয়া অতিকষ্টে সে আন্দুর পানে মু'

।হিল, অকস্মাৎ গভীর বেদনায় রুদ্ধ নিঃশ্বাস, অতর্কিত
র্গত হইল! আন্দু চমকিয়া চাহিল, বুঝি সে নিঃশ্বাস,
,কের মত ক্ষিপ্রবেগে বক্ষের চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া মর্ম্মে
ন্দে তীব্র বিদ্ধ হইল! দৃষ্টি ফিরাইয়া আন্দু মাথা হেঁট ব
জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। দাদাজী আন্দুকে আলি
আন্দু শান্ত সরল হাসিতে, সুকোমল কণ্ঠে বলিল, "জীবনে
সবই ব্যর্থ হয়ে গেছে দাদাজী, এবার মরণের অবলম্বনে নিজেকে
শান্তিতে সার্থক করে তুলব, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন।"